শিক্ষা
সমাজ
দেশ

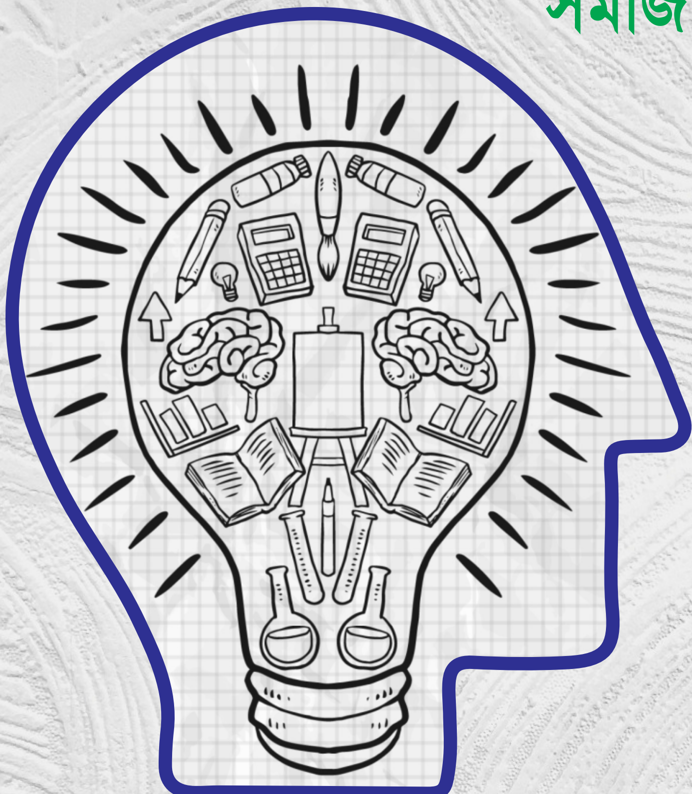

শিক্ষার ভিত্তিমূল ও মানবসম্পদ গঠন

হাসনাইন আহমেদ

লেখকের অন্যান্য বই:

- জীবনক্ষুধা (কবিতা)
- প্রতিদান চাইনি (উপন্যাস)
- কিছু কথা কিছু গান (ছোটগল্প)
- অপেক্ষা (উপন্যাস)
- শেষবিকেলের পথরেখা (উপন্যাস)
- সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম (প্রবন্ধ)
- সত্যের গল্প গল্পের সত্য (ছোটগল্প)
- নৈঃশব্দের কথকতা (উপন্যাস)
- পোদ্দার স্রোতোধারা (উপন্যাস)
- অলখ মহাশক্তির খেলাঘর (প্রবন্ধ, ধর্ম ও কর্মদর্শন)
- এইসব দিনকাল (ছোটগল্প)
- আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা (প্রবন্ধ)
- এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে (প্রবন্ধ, শিক্ষা ও সেবার একটি জাতীয় রূপরেখা)
- শিক্ষা সমাজ দেশ– সামাজিক শিক্ষা ও সমাজসংস্কার (কলামভিত্তিক সংকলন)
- শিক্ষা সমাজ দেশ– জনপ্রতারণামূলক রাজনীতি: দুর্দশাগ্রস্ত দেশ– নতুন বাংলাদেশ গঠন (কলামভিত্তিক সংকলন)

শিক্ষা

সমাজ

দেশ

শিক্ষার ভিত্তিমূল ও মানবসম্পদ গঠন

হাসনান আহমেদ

প্রকৃতি

শিক্ষা সমাজ দেশ

শিক্ষার ভিত্তিমূল ও মানবসম্পদ গঠন

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ২০২৫

প্রকাশক

প্রকৃতি

১১৪-১৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম

২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: Prokriti.book@gmail.com

প্রচ্ছদ

হাসনান আহমেদ

অলংকরণ

মোঃ নাজমুল আলম (বুলবুল)

মুদ্রণ

লিংক ভিশন

মিরপুর, ঢাকা

linkvision.bd@gmail.com

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৪৪৪-০৩০-৩

মূল্য: ৩০০.০০ টাকা

Shikshar Vittimul O Manabsampad Gathan by Hasnan Ahmed
Published by Prokriti, Dhaka, July 2025
Price: Tk. 300.00

উৎসর্গ

’২৪-এর ছাত্র-জনতার বিপ্লবে শহিদদের স্মরণে

আমার কথা

পত্রিকায় নিবন্ধ লেখার কথা বলছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে আমার লেখালেখির হাতেখড়ি। কয়েকটা কবিতার বই, কাব্যগ্রন্থ, ছোটগল্প ও তিন-চারটে নিবন্ধ তখন আমার ভাণ্ডারে মজুদ; প্রকাশের অপেক্ষায়। যুদ্ধ অসংখ্য মানুষের জীবনের সাবলীল স্বপ্নকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল; যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কখনো জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চললো। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা সব সময় জীবনের অনুকূলে থাকে না। প্রতিকূল পরিবেশের কারণে আমার লেখালেখির পরিসমাপ্তি ঘটলো। জীবন চলার খরস্রোতে ভেসে লেখাগুলো দিনে দিনে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবার লেখালেখি শুরু করলাম। এখনও যখনই সময় পাই লিখি।

২০২২ সাল থেকে নিবন্ধ লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করার উদ্যোগ নিলাম। আমার কলামের শিরোনাম 'শিক্ষা সমাজ দেশ'। এ বইটি পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা নিবন্ধবিশেষের সম্মিলন। এই 'শিক্ষা সমাজ দেশ' শিরোনামে আরো কয়েকটা বই প্রকাশের আশা আছে। সবগুলোই নিবন্ধবিশেষ। এলোমেলোভাবে না সাজিয়ে মোটামুটি শিরোনামের প্রসঙ্গ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। প্রতিটা প্রসঙ্গ একটা অন্যটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। প্রতিটা সংকলন গ্রন্থের আলাদা নামও দেওয়া হয়েছে।

পাঠকসমাজ সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকা পড়েন। ফলে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিদিন প্রকাশিত অগণিত নিবন্ধ অলক্ষ্যে রয়ে যায়। আমি পাঠকসমাজের সুবিধার্থে এবং দিনে দিনে প্রকাশিত আমার লেখা নিবন্ধগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে একদিন কালের আবর্তে হারিয়ে যাবে ভেবে যথাসম্ভব বিষয়ভিত্তিতে বই আকারে একত্র করেছি মাত্র। এতে অনেক কথা ও ভাবের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আমার বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার ভাবনাচিন্তা ও পথনির্দেশিকা উন্নত দেশ গঠনের পথিকার ও যুগোপযোগী হবে; পাঠকসমাজের অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা যথাসম্ভব তৃপ্ত করবে; চিন্তাশ্রয়ী গবেষক ও অনাগতদের পথ দেখাবে।

অধিকাংশ লেখা দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত। এজন্য দৈনিক যুগান্তর কর্তৃপক্ষের কাছে এবং বিশেষভাবে সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য, পত্রিকা অফিসের বিবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে লেখার সব অংশ তাদের পক্ষে সব সময় প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। একটা কারণ আমি নিজে

অবহিত। আমার লেখার ভাষা কাকের কণ্ঠস্বরকেও হার মানায়। অঙ্কের শিক্ষক হওয়ায় শ্যাম ও কুল বজায় রেখে, ভারসাম্য রক্ষা করে লিখতে পারিনে, যা বুঝি সোজাসুজি প্রকাশ করে ফেলি। এটা আমার লেখার অকপটতা ও সীমাবদ্ধতা। এতে অনেকের বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ ঘটায়। লেখনীর মতো ধারালো অস্ত্র আর কীই-বা আছে! সেজন্য এবং অন্য আরো কারণে পত্রিকা অফিস কখনো কখনো কিছু কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে প্রকাশ করেছে। এখানে প্রকাশিত নিবন্ধগুলো পত্রিকা অফিসে আমি যেভাবে পাঠিয়েছিলাম, পুরোটাই তেমন অশোধিত-অসম্পাদিত অবস্থায় প্রকাশিত হলো। বানানেও অনেক ভুলচুক রয়ে গেল। অনুসন্ধিৎসু পাঠকসমাজ বিষয়টা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। নিবন্ধগুলো এদেশের শিক্ষা, সমাজ ও দেশ নিয়ে লেখা; প্রতিটাই চিন্তা-উদ্রেককারী। এগুলো পড়লে কেউ আমার 'পথরেখা'র সন্ধান পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। তবে আমার 'পথরেখা'র পুরো সন্ধান পেতে আমার লেখা কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ পড়তে হবে এবং অভিমুখিতা বুঝতে হবে।

পাঠকসমাজে আমার লেখার কিছু ভক্তও আছেন, যাদের অনেকে আমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করেন। প্রতিনিয়ত তাদের দেওয়া গঠনমূলক পরামর্শের কারণে আমি তাদের কাছে ঋণী। ভক্ত পাঠকসমাজের আশা পূরণ হলে এবং লেখার উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হলেই আমি খুশি। আমার লেখায় সমাজ, দেশ ও জাতি বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

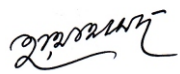

ঢাকা, জুলাই ২০২৫

হাসনান আহমেদ

শিক্ষা সমাজ দেশ

শিক্ষার ভিত্তিমূল
ও
মানবসম্পদ গঠন

সূচিপত্র

- প্রকৃত শিক্ষা বলতে কী বোঝায় ১১
- শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হোক সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন ১৮
- দেশের শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ ও করণীয় ২৬
- শিক্ষা: সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ৩১
- গ্রামীণ সমাজে শিক্ষা ও মানবসম্পদ গঠনের হালহকিকত ৩৬
- মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা ৪১
- উন্নত মানবসম্পদ গড়ে তুলবে যে শিক্ষাব্যবস্থা ৪৬
- ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী করতে হবে ৫১
- জীবনবিধান ও শিক্ষা- সবই মানুষের জন্য ৫৭
- মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে করণীয় ৬২
- শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তেলেসমাতি না করাই ভালো ৬৭
- 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' কি ও কেন? ৭২
- স্কুল শিক্ষার হাল হকিকত ও কর্তব্যকর্ম ৭৯
- 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?' ৮৪
- তমসা আসিছে ঘিরে সময় যে বয়ে যায় ৮৯
- আগামীদিনের শিক্ষা ও সেবায় যা করতে হবে ৯৪
- মনুষ্যত্বের আবশ্যিকতা ও আমাদের অবস্থান ৯৯
- শিক্ষার পরিবেশই নেই, শিক্ষিত জন্মাবে কীভাবে? ১০৪
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার সংকট ১০৯
- আমাদের রাজনীতি ও জনশিক্ষা ১১৪
- আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১১৯
- শিক্ষার মান বৃদ্ধির সবক কেমন হওয়া উচিত ১২৪
- এভাবে তো শিক্ষার মান উন্নয়ন করা যাবে না ১২৯
- পিএইচডি কি বিক্রয়যোগ্য কোনো পণ্য? ১৩৪
- শিক্ষাব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের বিকাশ কোথায়? ১৩৯
- রাজনীতির চোরাবালি ও আমাদের শিক্ষা ১৪৪
- চাই জীবনমুখী, মানবিক ও কর্মমুখী শিক্ষা ১৪৯
- শিক্ষায় দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ১৫৪
- আসুন আমরা শিক্ষা ও সেবার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি ১৫৯
- 'চলার শেষ কোন সাগরে তার ঠিকানা তো জানা নাই' ১৬৪
- শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন হোক দূরদৃষ্টির আলোকে ১৬৯
- অন্তর্বর্তী সরকার: দেশোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা অন্তত গড়ুন ১৭৪
- 'কেমন যুগান্তর চাই' ১৭৯
- অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ– পরিচিতি ১৮২

প্রকৃত শিক্ষা বলতে কী বোঝায়

ছোটবেলায় গানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। একটা গানের কলি এরকম শুনেছিলাম: 'খোকনসোনা বলি শোনো, থাকবে না আর দুঃখ কোনো, মানুষ যদি হতেই পারো।' মা-বাবা এমন করেই তাদের সন্তানদের নিয়ে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখে থাকেন। কখনো-সখনো সে-স্বপ্ন বাস্তবেও রূপ নেয়। আবার অনেক সময় সন্তান বড় হয় বটে, মানুষের মতো মানুষ হয় না। লালন গেয়েছিলেন, 'এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন।' মানুষের মধ্যে এই 'মানুষ-রত্ন' জেগে না উঠলে পরিবেশভেদে সে অমানুষ হয়, কখনো মানুষ নামের কলঙ্ক হয়, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। আসলেই কি দিন দিন মানুষের চিন্তা-চেতনা, ভাবনার গণ্ডি সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে? স্বার্থপরতা বেড়ে যাচ্ছে? হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, জুলুম, খুনোখুনি, দুর্বলের প্রতি সবলের আধিপত্য, প্রাবল্য ও কর্তৃত্ব, 'নরম কাঠে ছুতোরের বল' সীমা-লঙ্ঘন করছে? আত্মজিজ্ঞাসা, বিবেকবোধ, মনুষ্যত্ব, উদারতা, লোকলজ্জা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি ক্রমশই যারপরনাই বিলীন হয়ে যাচ্ছে? 'সেই মানুষ' কোথায় গেল? কেন গেল? এর দায় কার?

আমরা বলি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মানুষ-রত্ন লুকিয়ে আছে। তাকে বের করে আনতে হয়, উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষা দিয়ে লালন করতে হয়, কাজে লাগাতে হয়। তারপর একটা মানুষ 'মানুষ' হয়। তাতে তার নিজের, সমাজের, দেশ ও দশের কল্যাণ হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রময় বসবাসে শান্তির সুশীতল ছোঁয়া অনুভূত হয়। উন্নতির চরম শিখরে উঠে বিশ্বসভায় জাতি-গোষ্ঠী মাথা উঁচু করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়। উপযুক্ত সুশিক্ষার মাধ্যমেই কেবল মানুষকে প্রকৃত মানুষ, সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং জনসম্পদে পরিণত করা যায়, সুস্থ-সঠিক পথে চালানো যায়। শিক্ষা দরকার প্রথমত, নিজের সুষ্ঠু চিন্তা-চেতনাবোধ, পরিশীলিত বিবেক ও সচেতনতা, মঙ্গল-অমঙ্গল বোঝা, পেশা নির্বাচন, আদর্শ পরিবার গঠন, ভালো মন্দ পৃথক করতে পারার সক্ষমতা অর্জনের জন্য; সুখ-শান্তিতে বসবাসের উপযুক্ত প্রগতিশীল সামাজ গঠনের জন্য; উন্নত চিন্তা ও সেবার মাধ্যমে আদর্শ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে অবদান রাখার জন্য। দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির কল্যাণ ও স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা, এবাদত, উপাসনা, প্রার্থনা করার জন্য। তৃতীয়ত, নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুকুমার সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য।

প্রশ্ন, আমাদের দেশে কি সে-ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ আছে? বর্তমানে সরকার প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে। এটা ভালো। এতে শিক্ষার মান ও গুণগত পরিবর্তন কতটুকু হবে, প্রশ্ন থেকে যায়।

শিক্ষার মান অনেকটাই পরিবেশের উপর নির্ভর করে। সরকারকে এদিকটা বেশি করে ভাবতে হবে। জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবতাবোধ-জাগানিয়া শিক্ষার দিকে যেতে হবে।

শিক্ষা এবং লেখা ও পড়া জানা বা অক্ষরজ্ঞান থাকা এক কথা নয়। মানুষ শেখে সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা– দুটোর মানই ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরা। শিক্ষার বর্তমান অবস্থা নিয়ে এ দেশের সচেতনমহল সম্যক অবহিত। এ অস্বস্তিকর অবস্থায় নির্বাক হয়ে কিংবা হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় একদম নেই। করণীয় করতে হবে, পরিবর্তন আনতে হবে; নইলে পরিণতি আরো ভয়াবহ হতে বাধ্য। সাধারণ স্কুল-কলেজের কথাই বলি। লেখাপড়ায় লেখাও নেই, পড়াও নেই। নেই চিন্তা করতে শেখা, বিশ্লেষণের ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা, মানবিকতা, দেশপ্রেম, সামাজিক মূল্যবোধ, সত্যের সাধনা, চিন্তাধারার উৎকৃষ্টতা, জানার পিপাসা, শিক্ষা নিয়ে ভাবুক মন, গভীর আত্মজিজ্ঞাসা বা অধ্যবসায়। আছে শুধু নোটবই-গাইডবই বিক্রি, মোসাহেবি আর টিউশনি। সাথে মুখস্ত কিছু উত্তর শিখে টিক-চিহ্ন দিয়ে উপর-ক্লাসে ওঠার ব্যবস্থা। আছে অলীক কল্পনা, সার্টিফিকেট প্রাপ্তির তৃপ্ত ঢেঁকুর, বেকারত্ব, দলবাজির উদগ্র শ্লোগান, মনোবৈকল্য, মিথ্যার বেসাতি, ভোগবাদী মানসিকতা। শিক্ষা থেকে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা বিদায় নিয়েছে কেন?

এসব দোষ তো আর ছেলে-মেয়েদের দিয়ে পার পাওয়া যাবে না! বাপ-মায়ের দিকে, শিক্ষকদের দিকে, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার দিকে চোখ তুলে তাকাতে হবে। হাতে-গোনা অল্প কিছু ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শেখে, কিংবা জ্ঞানার্জন করে– তা শেখে তার নিজের আগ্রহের কারণে, সচেতন বাপ-মায়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, উপদেশ ও প্রেরণার কারণে। এগুলোতে আত্মপ্রসাদে তৃপ্তির ঢেঁকুর না তোলাই ভালো। ছেলে-মেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়তে হয়, আবার শহর-গ্রাম নির্বিশেষে বাসায় টিউটর রেখে আলাদা তালিম নিতে হয়। লেখাপড়াটা আনন্দময় না হয়ে দুর্বিসহ ও ভীতিকর হয়ে ওঠে।

বর্তমান শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষকসুলভ অবস্থাও বেশ নাজুক। এটা তাঁদের অপকর্ম ও অপচিন্তার ফসল। শিক্ষকদের ইস্পাতকঠিন নৈতিকতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। অনেক শিক্ষক নিজেদের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে দুর্নীতি, ফাঁকিবাজি, অব্যবস্থা, বাতিল মতামতের প্রতি আনুগত্য, মোসাহেবি করে শিক্ষকতা পেশাকে সামাজিক অবস্থানের নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে জাত্যভিমানী শিক্ষাগুরুর মর্যাদা হারিয়েছে।

এর প্রভাব সমগ্র জাতি ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর পড়েছে। শিক্ষকদের আবার বেতনও কম, তাতে পেট চলে না। মেধাবীরা তাই শিক্ষকতা পেশায় আসতেও চান না। এ দেশে আদর্শ বৈশিষ্ট্যের শিক্ষকই-বা বর্তমানে ক-জন! এ প্রজাতির শিক্ষক ক্রমশই বিলুপ্তির পথে।

শিক্ষার মান নিম্নমুখী, নৈতিকতার মান আরো নিম্নমুখী। মানবিকতা ও সততার স্তর সর্বনিম্ন পর্যায়ে; বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। তাহলে শিক্ষার চিকিৎসকরা কি ভুল ব্যবস্থাপত্র বাতলাচ্ছেন? চিকিৎসা কি ব্যর্থ হতে চলেছে? আমরা কি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছি? এক্ষেত্রে জাতির ভবিষ্যৎ কী? এ জাতি কি তাহলে অন্য কোনো সম্প্রসারণবাদী ভিনদেশী গোষ্ঠীর গোলামি করে খাবে? শিক্ষার আলো না থাকলে বুনো গাঢ় আঁধারে চারদিক ছেয়ে যাবে, এটাই প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়ম।

মাদ্রাসা শিক্ষায়ও কয়েকটা ভাগ। কওমি মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা এবং মক্তব/নূরানি ও ফুরকানিয়া/হাফেজিয়া মাদ্রাসা। এখানে সমগ্র জীবনে সৃষ্টি-স্রষ্টার চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য ও জীবন-কর্ম শুধু পরকালের বেহেশত নসিবের সরু গলিতে আটকে গেছে। ধর্মটাকেই পুরো পেশা বানিয়ে ছেড়েছে। উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনের শিক্ষা নেই বললেই চলে। ভিন্ন কোনো উচ্চমানের পেশায় যাবারও প্রচেষ্টা নেই। মাদ্রাসা শিক্ষা মুসলমানদের সভ্যতা, ঈমান, বৈশিষ্ট্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যকে প্রাগ্রসর প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রগতিশীল না করে অজ্ঞতা ও চিন্তার বিকলতা দিয়ে পিছনের দিকে ফিরিয়ে আদিম যুগে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ সেখানেও অবিকশিত প্রতিভাবান ছেলে-মেয়ে রয়ে গেছে। কোনো ছাত্রছাত্রীই এ দেশের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, জীববিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, হিসাববিদ, অর্থনীতিবিদ, ব্যবস্থাপক, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিমানচালক ইত্যাদি শতেক পেশায় জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখে না। অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে বেকার বা ছদ্ম-বেকার। ইহকালের স্রষ্টা-সৃষ্টিসেবার কর্মই যে ইবাদত; কর্ম ছাড়া পরকাল যে অচল, তা বোঝে না বা বুঝতেও চায় না, কেউ বোঝায়ও না। দুনিয়া সৃষ্টি না হলে আখেরাত থাকে কী করে? কর্ম আছে বলেই কর্মফল আছে। কর্মের অস্তিত্ব না থাকলে ফল লাভ দুঃসাধ্য– এসব চিন্তা তাদের কাছে কল্পনাতীত। লেখাপড়ায় গণিত, বাংলা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পুরোপুরি অনুপস্থিত। অথচ মোনাজাত করে 'হে আমার প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো, আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও' (সূরা বাকারা: ২০১)। মোনাজাতের গভীরতাকেও ভেবে দেখে না। যদি বলা হয়, দুনিয়ার কল্যাণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? তার পদ্ধতিই-বা কী? আখেরাতের

কল্যাণের আগেই-বা দুনিয়ার কল্যাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কেন? দুনিয়া আছে বলেই না আখেরাত আছে। ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে কি আমরা সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত সামুদয়িক শিক্ষাকে আনতে পারিনে?

ইসলাম যদিও একটা 'বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ', প্রগতিশীল ধর্ম ও আধুনিক জীবনব্যবস্থা; অধিকাংশ মৌলভিরা এ বিষয়ে অনভ্যস্ত, অক্ষম– বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। দুনিয়ার কল্যাণ সৃষ্টি-সেবা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে এবং আখেরাতের কল্যাণ স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত আছে কি-না আমরা অনুসন্ধান করে দেখছিনে কেন? ভুলেও এর গভীরতা নিয়ে গবেষণা করছিনে; বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে তলিয়ে দেখছিনে; সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ম ও সিস্টেম নিয়ে বেওয়াকেবহাল। মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস বলে– মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-দর্শন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই স্থান দখল করে রেখেছিল। মুসলমানরা রসায়নবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, অস্ত্রচিকিৎসা, ভূ-তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রপথিক হিসেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে অলংকৃত করে রেখেছিল। হয়তো আমাদের এসব পড়ে দেখা ও জানার সময় নেই; পির-পূজা, কবর-পূজা, পেট-পূজা ও ফন্দি-পূজা, নেতৃত্ব-পূজা নিয়ে মহাব্যস্ত।

বিগত চল্লিশ বছরে মক্তব-মাদ্রাসা অনেক গুণ বেড়েছে। কোরআন-হাদিস পড়া, মিলাদ-মহফিল করা লোক অসংখ্য বেড়েছে, বেড়েছে শ্রোতার সংখ্যাও। সে-সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বেকারত্ব, ধান্দাবাজি, দলবাজি, ধর্মীয় সভায় বক্তার ফি। বাড়েনি সমাজে, অফিস-আদালতে কর্মরত সুস্থ চিন্তা-করা, জ্ঞানী-দূরদর্শী, কর্মঠ সৎমানুষের সংখ্যা– তাই পরিবেশ গেছে নষ্ট হয়ে। গলদটা কোথায়? মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের বিষয়টা আশু ভাবনার খোরাক। হালকা আবেগ ও গোঁড়ামি দিয়ে সুশিক্ষিত ও প্রাগ্রসর জাতি গড়া যায় না।

এ দেশের ধর্মকর্ম ও মাওলানাদের নিয়েও বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ কমে যাচ্ছে, ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপ ও শান্তি থেকে আমরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি, দেশে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের মধ্যে মুসলমানের বৈশিষ্ট্যের বড্ড অভাব দেখা দিচ্ছে। সমাজে হিংসা, হানাহানি, অনৈতিকতা নিত্য। ধর্মীয় উগ্রতা ও বিভাজন বেড়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে ভাবতে হবে। এ অবস্থা এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত থেকে সৃষ্ট। শিক্ষার ভিত্তিমূলে যার যে ধর্ম, তাকে সে ধর্ম সাধারণ শিক্ষার

সাথে শিখতে হবে। ধর্ম থেকে আহরিত মানবতার ধর্ম জীবন চলার পাথেয় হিসেবে নিতে হবে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার কল্যাণে তা কাজে লাগাতে হবে। যার যেমন খুশি, উচ্চশিক্ষা কিংবা টেকনিক্যাল শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ পেশায় জীবন পরিচালনা করবে।

স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ছাড়াও আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, দুদক, নির্বাচন কমিশনের মতো অনেক সামাজিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এদেশে আছে। এদের থেকেও মানুষ শিক্ষা নেয়, নেওয়াটাই উচিত। বর্তমান পরিবেশে এদের কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা না নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দূরে থাকাই শ্রেয় বলে মনে হয়। রাজনৈতিক সংগঠনও এক ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তাও এ দেশে জুতসই নয়। অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, ভাঁওতাবাজি, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, রাহাজানি, শোষণ, হত্যা, গুম, অন্তর্দলীয় কোন্দল ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের কিংবা যুবসমাজের চরিত্র-গঠনমূলক ভালো কিছু শিক্ষা সেখান থেকে পাওয়ার আশা কালবোশেখি ঘনঘোর ঘনঘটার কাছে স্নিগ্ধ-শীতল বাতাসে-ভরা শান্তিময় পরিবেশ চাওয়ার শামিল। কোথায় শিক্ষা? যে যা-ই বলুক, সুশিক্ষিত-চেতনাবোধসমৃদ্ধ জনসম্পদ গড়া ছাড়া এ জাতির মুক্তির আমি তো আর কোনো বিকল্প পথ দেখিনে।

অনেক অসহনীয় ও আপত্তিকর কথা বলছি সত্য– সমাজের নির্মম বাস্তবতা বলেই বলছি। কিন্তু দোষটা আসলে স্কুল-কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমি মাদ্রাসার না। দোষ আমাদের পথহারা চিন্তা-চেতনার, পদ্ধতি নির্বাচনের, প্রতিকূল পরিবেশের, অদূরদর্শিতার, সদিচ্ছার অভাবের। দরকার উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষার। সেজন্য স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাদ্রাসার অন্য নাম) মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পথ ও পদ্ধতি পরিশুদ্ধ এবং পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের মধ্যেই সুশিক্ষিত সদাজাগ্রত জনগোষ্ঠী তথা মানবসম্পদ তৈরির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ– তা আমাদেরকে মানতে হবে। এখান থেকে মানবসম্পদ তৈরি হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেলে অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও ক্রমশ প্রকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। সুশিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল-সচেতন জাতি, সমৃদ্ধ দেশ গড়ে উঠবে। অন্যথায় এ জনগোষ্ঠীর পরনির্ভরশীল, সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী শোষকগোষ্ঠীর শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দাসত্ব বরণ করে দেশ ও জাতি হিসেবে ক্রমশ নিস্তেজ, নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়ও দেখি অধিকাংশ ছেলে-মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তিমান নেই– গোড়ায় গলদ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়া সত্যি সত্যি শেখালে ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, বুঝতে পারে না। চাকরি

বাঁচানোর প্রয়োজনে শিক্ষকদের বক্তৃতার মান নীচে নামাতে হয়। নম্বর অর্জন করতে পারে না, তবু নম্বর দিতে হয়। নইলে লোম বাছতে কম্বল উজাড় হয়। ছাত্রছাত্রীরাও না শিখে, বেশি বেশি নম্বর পেয়ে সার্টিফিকেট পাওয়ার আনন্দে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে শিক্ষাঙ্গন ছাড়ে। আমিও সান্ত্বনার ঢেকুর তুলি বটে– সে ঢেকুর টক, অম্ল স্বাদযুক্ত, তেতো। আমিও আত্মপ্রবোধিত সন্তুষ্টি মনে মনে প্রকাশ করি, ছাত্রছাত্রীও কৃতার্থ হয়। অথচ সার্টিফিকেটের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নিজেকে পেশাদার ফাঁকিবাজ বলে মনে হয়। মাঝখানে বিবেকের দংশন, আত্মাবমাননা, আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগী। 'ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না। যাহা চাই ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

এ বিশ্বে বিভিন্ন বিষয়ে মতবাদের অভাব নেই। মানবজাতির একটা অংশ কুরুচিশীল এবং বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন; এটা তো সৃষ্টির প্রথম থেকেই আছে। এরা মনুষ্য প্রজাতিকে কিছু কিছু উদ্ভট-উদ্‌ভ্রান্ত মতবাদ দিয়ে অন্যান্য ইতর প্রাণির পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করাতে চায়। এদের কাছে পুরো মানবসমাজ ও মানবসভ্যতা আত্মসমর্পণ করতে পারে না। এদের অনুপাত যত বাড়বে, বিশ্বশান্তি-স্থিতি ততো বিঘ্নিত হবে। তাই কোনো দ্ব্যর্থ-মতবাদ প্রয়োগ করতে গিয়ে অদূরদর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতা করা একেবারেই চলে না। এতে এ বিশ্বচরাচরে মানবজাতির সাবলীল ও সৃষ্টি-সেরা জীবনযাপন দুরূহ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ আস্তিক-নাস্তিক কিংবা সন্দিগ্ধমনা হলে কারো কিছু যায়-আসে না। এটাকে মেনে নেওয়াই ভালো। কিন্তু হালকা জ্ঞান দিয়ে যে কোনো ধর্মেরই খারাপ দিক নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি কখনোই ভালো না, বা কুৎসিত মন্তব্যও করা উচিত না। তা কেউ ধর্ম পালন করুক চাই না-করুক।

আরেকটা কথা প্রায়ই বলি। উন্নয়ন কথাটা ভাবার আগে জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়নের কথাটা আগে চলে আসা দরকার। শিক্ষার উন্নয়ন মানে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন, যদি জনগোষ্ঠী প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। নইলে নির্মাণকাজে রডের ব্যবহারের পরিবর্তে বাঁশের ব্যবহার, একটা বালিশ উপরতলায় উঠাতে হাজার টাকার কাছে ব্যয় এবং এমনই শত-সহস্র বাস্তব ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে অবতারণা করা যাবে। আমি উন্নয়ন বলতে অবকাঠামোগত উন্নয়নকে বুঝিনে; কোনো দেশে বসবাসরত আপামর জনগোষ্ঠীর মানসিক উন্নয়নের প্রশস্ততাকে বুঝি। এরপর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করলে তা হয় টেকসই উন্নয়ন। ইস্পাত ছাড়া যেমন খালি লোহার ছুরি অচল, তেমনি উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া মানসিক উন্নয়নের প্রশস্ত পথের ভাবনাও অবান্তর। আগে জনগোষ্ঠীকে

উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, সে-সাথে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়নসহ শতেক বহুমুখী উন্নয়ন চলুক। তখন জাতীয় সম্পদের অপব্যয়, অপচয় এত বেশি হবে না, সিস্টেম লসও সীমা ছাড়াবে না। কারণ সুশিক্ষাপ্রাপ্ত সুনীতির একজোড়া উন্নত হাত আর কুটিল বুদ্ধিতে ভরা চোরা হাত কোনোক্রমেই এক হতে পারে না। আমরা দেশের টাকা খরচ করে কৌশলী চোর-ডাকাত কিংবা কুখ্যাত পকেটমার কোনোভাবেই তৈরি করার পক্ষে সাফাই সাক্ষী দিতে পারিনে।

পেশাগত কারণে অনেক সময়ই বিভিন্ন সেমিনার, কনফারেন্সে যেতে হয়, নানা জনের নানান কথা শুনতে হয়, বলতে হয়। দেখেছি, যিনি যে দেশে লেখাপড়া করে এসেছেন, তাঁদের অনেকেই সে-দেশের সংস্কৃতি, সামাজিক বুনন, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, লেখাপড়ার সিলেবাস হুবহু নকল করে, কপি অ্যান্ড পেস্ট করে এ দেশে চালু করে দেশকে সে-দেশ বানাতে চান, উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাবার নুশকা বাতলান। আমি বরাবরই এতে দ্বিমত পোষণ করি। পশ্চিমা সভ্যতার হুবহু অনুকরণ করতে গিয়ে এ দেশের ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজ খুব ভোগবাদ-ক্লান্ত, দিগ্‌ভ্রান্ত, জীবনের উদ্দেশ্য-বিভ্রান্ত এবং নীতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্তঃসারশূন্য গন্তব্যের পিছনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে তারা দিশেহারা। তাদের মধ্যে দেশীয় মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। বাংলাদেশি বাঙালি আজীবন এদেশীয় বাঙালি। প্রতিটা জাতির নির্দিষ্ট কিছু স্বকীয়তা রয়েছে; রয়েছে আলাদা সংস্কৃতি, সামাজিক বুনন, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা। অন্য কোনো দেশের ভালো কিছু থাকলে সেটা আমরা আত্মস্থ করতে পারি, দেশের উপযোগী করে গ্রহণ করতে পারি। নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন হতে দিতে পারিনে। জাতি গঠনে এটাও একটা শিক্ষা। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী তার অস্তিত্ব রক্ষায় এবং ক্রমবিকাশ সাধনে নিজস্ব সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, দেশীয় মূল্যবোধ, আত্মোন্নয়ন ও দেশ-গড়ার উপযোগী শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাক– এটাই সর্বোত্তম পন্থা।

(প্রকাশ: ৬ আগষ্ট ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www. pathorekhahasnan.com

শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হোক সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন

প্রাণিজগতে শুধু মানুষের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনিয়তা দেখা দেয়। একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে অন্য প্রাণিজগৎ থেকে পৃথক করেছে। জীবনকে অর্থবহ করতে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে 'মানুষের মতো মানুষ' করে গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়ে। এই শিক্ষা যে-কোনো জাতি গঠনের মূল ভিত্তি, জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি। সুশিক্ষা যেমন সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি, কুশিক্ষা ও অব্যবস্থাপনা তেমনি জাতীয় দুর্দশা, ক্রমাবনতি ও ক্রম-ধ্বংসের চলিকাশক্তি– পারস্পরিক দুষ্টচক্র (ভিশাস সার্কেল)। প্রকৃত শিক্ষা সামাজিক ও জাতীয় উৎকর্ষ ও উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে এবং কালক্রমে পারস্পরিক ক্রমোন্নতির মাধ্যমে জাতিকে শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এভাবে শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ গড়তে পারলে দেশকে ক্রমাগত সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করা সম্ভব। শিক্ষা ও উন্নয়ন একে অন্যের পরিপূরক ও পরিপালক।

তিনটি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলনে শিক্ষা হতে হবে– জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা; কর্ম বা পেশাকেন্দ্রিক শিক্ষা; এবং মানবিক গুণাবলী-জাগানিয়া শিক্ষা। মানুষ কীভাবে জীবন অতিবাহিত করবে, পরিবেশকে বুঝতে শিখবে, জীবনের ভালো-মন্দ চিনতে শিখবে, সমাজে চলতে শিখবে ইত্যাদি জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা। আবার মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে রুজি-রোজগার করে খেতে হয়; কাজ করা লাগে; একটা পেশায় নাম লেখাতে হয়, আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটাতে হয়– এজন্য পেশাকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা দিয়ে মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলিকে জাগিয়ে তুলতে হয়; নইলে মানুষ আর মানুষ থাকে না– অন্য প্রাণির পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়, সমাজ ও রাষ্ট্র জঙ্গলে পরিণত হয়, তাই মানবিক গুণের উদ্রেককারী শিক্ষা মানুষের জন্য প্রয়োজন। আর যা-ই হোক, মানুষের মধ্যে এই তিন বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা না থাকলে মানুষ 'মানুষের মতো মানুষ' হয় না। সমাজ অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় ভরে যায়।

অশিক্ষা এবং নিরক্ষরতা এক কথা নয়। শিক্ষিত লোকের মধ্যে যে যে উপাদান থাকা প্রয়োজন– সেগুলোকে শিক্ষার ভিত্তিমূল বলে গণ্য করা যায়, সেগুলোকে 'শিক্ষায় সাত আর' (Seven Rs in Education) বলতে পারি। এ সকল উপাদানের ধারক ও বাহক হলে তাদেরকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় বা দেশে মানবসম্পদ তৈরি হলো বলে বিবেচনা করা যায়। এগুলোকে এভাবে লিখছি:

১. পড়া (Reading): শিক্ষাসাধক রোমান চার্চের সেন্ট অগাস্টিনের কনফেশনস থেকেই শিক্ষার জন্য যে তিনটি 'আর'-এর ধারণা (`learning to read, and write, and do arithmetic') পাওয়া যায় তাদের একটা হচ্ছে পড়া। পড়তে পারাকে শিক্ষার প্রথম সোপান হিসেবে ধরা হয়।

২. লেখা ((W)Riting): লেখা ভাব প্রকাশের অন্যতম একটা বলিষ্ঠ মাধ্যম। শিক্ষায় লেখা আছে বলে সভ্যতা টিকে আছে।

৩. গণিত ((A)Rithmatic): অঙ্কের ধারণা ছাড়া সংখ্যাত্মক হিসাব গণনা অসম্ভব। গণিত ও বিশ্লেষণের বিভিন্ন শাখা ছাড়া বিশ্ব কর্মকাণ্ড অচল। আমাদের মস্তিষ্কের বিকাশ ও বিশ্লেষণমূলক কাজে গণিত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই শিক্ষায় গণিত অচ্ছেদ্য।

এই তিনটি যোগ্যতার অস্তিত্ব শিক্ষিত লোকের মধ্যে থাকতেই হয়। কিন্তু আদিকালের এই তিনটি উপাদান দিয়ে বর্তমান যুগের শিক্ষার মাপকাঠি বানালে চলে না। শিক্ষা আরো ব্যাপক একটা বিষয়। এ তিনটা উপাদানের বাইরেও কিছু যোগ্যতা বা গুণাবলি একজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

৪. ধর্ম (Riligion): সেই আদিকাল থেকেই মানবজাতিকে এ ভূ-পৃষ্ঠে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম মানুষের কাজেকর্মে, চিন্তা-চেতনায় সুস্থ মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করার সুবিধা দিয়ে আসছে। ধর্ম (ধৃ+ মন) মানে মানুষের মন 'মূল অনুমান' (আন্ডারলাইং এজামশন)-এর উপর ভিত্তি করে যে ধারণা (বিশ্বাস) ধারণ করে রাখে। পৃথিবীর এমন কোনো ধর্ম নেই, যার মূলমন্ত্র ও অবস্থান মানবতার বিরুদ্ধে। প্রতিটা ধর্মেরই একটা 'জীবনবিধান' আছে। ধর্ম ইহকালের কর্ম ও পরকালের বিশ্বাসকে সম্পৃক্ত করে। ধর্ম খারাপ কাজের একটা অন্তর্নিহিত বাধা। ধর্মবিশ্বাস এমনই একটা মনের বিশ্বাস ও স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ যে, তা পালনে কোনো আইনের প্রয়োগ লাগে না। ধর্ম স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য পালন ছাড়া আর কিছুই না। শিক্ষায় ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষাকে ধর্মবিচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। ধর্মহীন শিক্ষা এবং স্টিয়ারিং ছাড়া যানবাহন একই কথা। ধর্ম মানুষকে অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখায়। একমাত্র ধর্মই পারে শিক্ষায় সততা ও আদর্শ দিতে। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের মানবতাবোধকে সুশোভিত করে।

বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে সিএসআর, কোড অব কর্পোরেট গভর্নেন্স, প্রফেশনালস কোড অব এথিক্স, বিজনেস এথিক্স ইত্যাদি অনেক কোর্স চালু করা হয়েছে। এগুলো ধর্মেরই আংশিক প্রতিস্থাপন। মৌলবাদী হবার ভয়ে মূলকে বাদ দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও আইন ও নিয়ম আকারে ভিন্ন নামে এগুলো চালু করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু মনের ভিতরে নৈতিকতার প্রশিক্ষণের বীজ প্রথিত না-হয়ে থাকার কারণে সব মুখস্থবিদ্যা কাগুজে-বাঘ হয়ে দেখা দিচ্ছে।

৫. গবেষণা/অনুসন্ধান (Research): বুদ্ধিমান প্রাণি বলে জন্মাবধি মানুষ অনুসন্ধানী। অনুসন্ধান মানুষের জিজ্ঞাসু মনের পিপাসা মেটায়। আরো কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে। বার বার মানুষ একই ঘটনা শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে মনের অজান্তেই কোনো একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই গবেষণা। কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান অধিক শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে। যে শিক্ষায় গবেষণা নেই, মনে মনে ভাবনা নেই– সে শিক্ষা অচল ও ভঙ্গুর। গবেষণাহীন বা অনুসন্ধানবিহীন শিক্ষা স্রোতহীন মজা-দুর্গন্ধময় জলাশয়ের শামিল। অনুসন্ধান সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৬. জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধ (Roused-conscience and Values): বিবেক মানুষকে পশুধর্মী কার্যকলাপ থেকে পৃথক করেছে। শিক্ষায় মানুষের বিবেকবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। অন্য কথায়, বিবেকবোধ-রহিত কোনো মানুষকে শিক্ষিত বলা যায় না। শিক্ষিত মানুষ জাগ্রত-শাণিত বিবেকের অধিকারী হতে হবে। বিবেকহীনতা ও মনুষ্যত্বহীনতা থেকে সকল অন্যায় ও অবিচারের জন্ম। মানুষের মনের অন্ধকার ও অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে তার মধ্যে সুবিচারের ক্ষমতা ও বোধশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, যাতে মানুষ নিজের কর্মকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। চলার পথে মূল্যবোধ ও বিবেক অনেকটাই একে অন্যের পরিপূরক। মূল্যবোধ আমাদের ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে শেখায়। মূল্যবোধ মানসিক বিকাশের সহায়ক এবং সামাজিক অবক্ষয়-রোধক। এ দেশের শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রকার দেশীয় শাশ্বত মূল্যবোধ সুষ্ঠু ও বিকশিত স্বাতন্ত্র্য জাতি গঠনের পরিচায়ক। দেশীয় মূল্যবোধ দেশাত্মবোধের জন্ম দেয়। তাই শিক্ষিত মানুষ দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত। মূল্যবোধ জাগ্রত বিবেককে নাড়া দেয়; মিথ্যার সাথে চলতে নিষেধ করে; অন্যায়ের কাছে মাথা নত না-করতে শেখায়।

৭. ন্যায়নিষ্ঠা (Righteousness): ন্যায়নিষ্ঠা শব্দটা অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ন্যায় অর্থ– নীতি, যুক্তি, যথার্থ, সত্য, সুবিচার– যা সত্যে নিয়ে যায় প্রভৃতি। নিষ্ঠা অর্থ– দৃঢ় অনুরাগ, আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মনোযোগ, দৃঢ়স্থিতি প্রভৃতি। ন্যায়নিষ্ঠা হলো ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা, পবিত্রতা, ধার্মিকতা, সততা ইত্যাদি। সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে হলে যে কয়টা গুণ অবশ্যম্ভাবী তার একটা ন্যায়নিষ্ঠা।

উল্লিখিত এ উপাদান বা গুণগুলো যত বেশি মানুষের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা যায়, ততই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ। এ ভিত্তিমূলগুলো শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হলেই তাকে শিক্ষিত বলবো। এভাবে শিক্ষিত মানুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদর্শ-জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। বিষয়গুলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও উত্তরোত্তর বর্ধিষ্ণু। প্রথমেই একটা মডেলের দিকে আমরা দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে পারি।

শিক্ষা এবং সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন

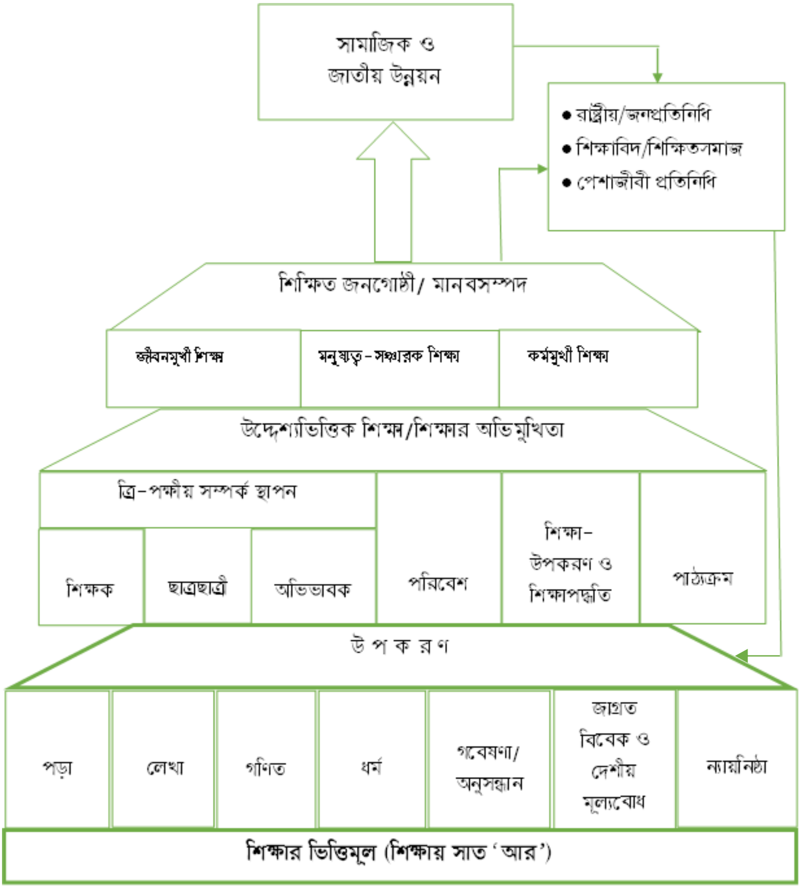

এখন এ ভিত্তিমানগুলো এবং আনুষঙ্গিক অন্য বিষয়গুলো নিয়ে কীভাবে সুশিক্ষিত সমাজ, জাতি ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব তা নিয়ে কথা বলবো।

কেউ কেউ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মানসিক উন্নয়নের কথাকে নিছক কাগুজে তত্ত্ব বলে উপেক্ষা করতে চান। অথচ একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করা যায় এবং সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হয়।

শিক্ষার ভিত্তিমূলকে ছয়টা উপকরণ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বা মানবসম্পদে পরিণত করা যায়। শিক্ষার্থী নিজেও শিক্ষার অন্যতম উপকরণ।

প্রথমেই আসে শিক্ষকের কথা। শিক্ষক ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অচল। তাই শিক্ষার জন্য আদর্শ শিক্ষকের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। ভিশাস্ সার্কেলে পড়ে এ-সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। যোগ্য-নীতিবান ব্যক্তিদের এ পেশায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের পারিশ্রমিকের দিকটাও বিবেচনায় আনতে হবে। লেখাপড়া জানা সুশিক্ষিত লোক যাতে এ পেশায় আকৃষ্ট হন, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। নির্ধারিত মান, ভালো পরিবেশ, নীতিবান শিক্ষক– আশানুরূপ ফলাফল, একথা মানতে হবে।

আজকের শিক্ষার্থী শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনের প্রকৃত মানুষ। তাদেরকে সুশিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়া আমাদের দায়িত্ব, রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অন্যথায়, রাষ্ট্রে অমানুষের সংখ্যা সীমার বাইরে ছাড়িয়ে গেলে রাষ্ট্রীয় দুর্বৃত্তায়নের ফলে নিজেরাই নিজেদের রাষ্ট্রকে গিলে খায় কিংবা রাষ্ট্রের নামটা নামমাত্র থাকলেও রাষ্ট্রময় বুনো আবহে অসুরকুলে সুর তোলে। এখানেই শিক্ষা ও দেশপ্রেমের গুরুত্ব। ছাত্রছাত্রী মূল উপকরণ, বাকিগুলো কনভার্শন প্রক্রিয়া। তবে এ দেশে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া নিয়ে ধারণা মানসম্মত নয়। দীর্ঘদিন অব্যবস্থাপনার মধ্যে থেকে এবং সস্তা জনপ্রিয়তার পিছনে ছুটতে গিয়ে শিক্ষা-মানের এই অবনতি। শিক্ষার মান নামানো যত সহজ, বাড়ানো বেশ কঠিন। শিক্ষকরা প্রতিটি শ্রেণির জন্য ত্রিপক্ষীয় ‘শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক’ সম্বন্ধ (ট্রাই-পর্টাইট রিলেশনশিপ) তৈরি করবেন। তাঁদের সাথে নিয়মিত বসবেন। অভিভাবককে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর পারফরমেন্স জানাবেন। প্রয়োজনে অভিভাবককে মোটিভেট করবেন, ছাত্র/ছাত্রীর উন্নয়নে এগিয়ে আসতে বলবেন। শিক্ষা প্রশাসন অভিভাবক ট্রেইনিংয়ের অবশ্যই ব্যবস্থা করবে। প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিভাবকমহলের প্রত্যক্ষ, আন্তরিক এবং সক্রিয় যোগাযোগ-ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অভিভাবকদের সহযোগিতা ছাড়া শুধু শিক্ষকের একার পক্ষে ছাত্র/ছাত্রীর শিক্ষাদান সম্ভব নয়। অভিভাবকদের বোঝাতে হবে– পারিবারিক শিক্ষা ছাত্রছাত্রীর জীবনে অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে, যা এ দেশের যান্ত্রিক জীবনে প্রায় বিলীন হতে চলেছে। মূল কথা, এ দেশে শিক্ষার পরিবেশের বড় অভাব। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ শিক্ষার উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্য ‘মহান রাজনীতিবিদ’দের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুখের দিকে চেয়ে হলেও অন্তত শিক্ষাঙ্গন নিয়ে রাজনীতির ব্যবসাটা বন্ধ করতে হবে।

এ দেশে এমন কোনো জেলা, উপজেলা, গঞ্জ নেই যেখানে কিশোর গ্যাংয়ের অস্তিত্ব নেই। পত্রিকার পাতা খুললেই প্রতিনিয়ত চোখে পড়ে কিশোর গ্যাং ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। কিশোর গ্যাংয়ের দলীয় গডফাদাররা পর্দার অন্তরালে থেকে পুতুল নাচাচ্ছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নেশা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি এর প্রধান কারণ। এজন্য আইনের শাসন দরকার। আজকের দুর্বৃত্ত-কিশোরই বড়

হচ্ছে, সমাজের কাজে অংশ নিচ্ছে। রাজনীতির সামাজিক দুর্বৃত্তায়ন ও আইনহীনতা, কিংবা আইন প্রয়োগে ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড দেশের সুন্দর-শান্ত সামাজিক পরিবেশকে ক্রমশই ধ্বংস করে দিচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ছোটবেলায় দেখেছি, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান করে নিতে। চাকরিতেও তারাই বড় বড় পদে গেছেন। স্কুলে নীতিবান শিক্ষকেরা ছিলেন, শক্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন হেডমাস্টার ছিলেন। এখন সেখানে দলবাজদের অবাধ বিচরণ আর শিক্ষকদের টিউশনির রমরমা ব্যবসা। ভাবী আত্ম-ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে অলীক জয়কীর্তন গেয়ে সুরধ্বনিতে চারপাশ ভাসিয়ে দিই।

রাজনীতিবিদদের পোষা পোকা-ধরা, বখাটে-মাস্তান পাড়া-মহল্লা-গঞ্জে যত প্রকার অসামাজিক অকাম-কুকাম আছে তা করছে আর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও দেখার কেউ নেই! বাধা দিলেই আপনার জীবন ও জীবনী দুটোই শেষ। শিক্ষার পরিবেশ, মানুষের মতো মানুষ হবার স্বপ্ন, নীতিকথা, সামাজিক ন্যায়বিচার অশুভ শক্তির প্রচণ্ড দাপটে, ভয়ে উধাও হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে। অনেক অভিভাবককে বলতে শুনেছি, তাঁরা খারাপ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার কাজে ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন। শিক্ষার সামাজিক উপকরণ কোথায়! সামাজিক পরিবেশকে খারাপ করে দিয়ে এককভাবে শিক্ষার উন্নয়ন হয় না।

ম্যানেজিং কমিটি বর্তমান শিক্ষাঙ্গনে গাঁড়ের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্ষক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভক্ষক। স্থানীয় রাজনীতির নেতারা কমিটিতে ঢুকছে, আর বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যাকাণ্ডের মতো আরো শতেক ঘটনা যখন প্রকৃতির অনিবার্য কারণে সামনে বেরিয়ে আসে, তখনই আরো আরো শত-সহস্র শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতির প্রখর-তেজদীপ্ত আলোয় চোখে ঝাপসা দেখি।

প্রযুক্তিগত পরিবেশ ছাড়া বর্তমান ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতা অচল। বর্তমান কর্মের হাতিয়ার প্রযুক্তি। যে সমাজে প্রযুক্তির ব্যবহার যত বেশি, সে সমাজ তত সমৃদ্ধ। শিক্ষাঙ্গনে যেখানে যতটুকু দরকার প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে ও শেখাতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ একটা বিষয়। এ দেশের অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসাতে গণহারে শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে অগণিত ছাত্রছাত্রীকে একসাথে দায়সারা পাঠদান করা হয়। এভাবে চলতে চলতে হাউস-টিউটরের কাছে পড়া বাধ্যতামূলক ও অবশ্যম্ভাবী একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে বা বলা যায় হাউস-টিউটরের ভূমিকা স্কুলে পড়ার তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। এ সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে স্কুলের পড়া স্কুলেই শিখিয়ে দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীকে স্কুলে বেশি সময় ধরে রাখতে হবে। পড়া

আদায় করে নিতে হবে। এতে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসশিক্ষায় মনোযোগী হবে এবং হাউস-টিউটরের প্রতি নির্ভরতা ক্রমশই কমবে। শিক্ষকরা চলমান ইন-ক্লাস ইভ্যালুয়েশনের উপর বেশি জোর দেবেন; ক্লাসে পড়াবেন, শেষে ছোট্ট করে একটা পরীক্ষা নেবেন। মোট নম্বরের মধ্যে চলমান ইন-ক্লাস ইভ্যালুয়েশনের ভার বেশি রাখবেন। অর্ধবার্ষিকী কিংবা বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের সাথে চলমান ক্লাসরুম ইভ্যালুয়েশন বছরান্তে তুলনা করবেন। এতে শিক্ষকের কৃতকর্ম ও দুর্বলতাও বের হয়ে আসবে।

সরকার থেকে আরবি, কোরআন-হাদিসসহ কওমি মাদ্রাসাতেও যদি সাধারণ স্কুল-কলেজের মতো বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি কোর্সের পাঠদান বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে। সরকার ইচ্ছে করলেই এগুলো পারে। একটা বিষয় সত্য যে, আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসার মৌলভি-মাওলানাদের যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয়, জীবনের বাস্তবতা যদি বুঝতে পারেন, প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী-সমাজের বড় একটা অংশের মেধাকে যদি অঙ্কুরে বিনাশ না করে দিয়ে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ করে দেন এবং সাধারণ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাথে সুস্থ প্রতিযেগিতায় নামেন, আমি নিশ্চিত তাঁরা এতে সার্থক হবেন। অভিন্ন সিলেবাস এবং বোর্ড-প্রশ্নে সকল স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার পরীক্ষা হবে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার মান নিয়ে জনমনে যে অবমূল্যায়নের মানসিকতার জন্ম নিয়েছে, তা দূরীভূত হবে। মানসিকতার সুষ্ঠু উন্নয়ন মানেই প্রতিটা ক্ষেত্রের উন্নয়ন। তাঁদের সুমতির উদয় হোক এটা আমার প্রত্যাশা।

শুভবুদ্ধির উদয় সরকারেরও হতে হবে! কারণ দেশে মাদ্রাসা যে হারে বাড়ছে, বৃহৎ একটা জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল ও বেকার কিংবা ছদ্ম-বেকার রাখাটা আদৌ উচিত হবে না। তাদেরও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, সমাজসেবক, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বায়োলজিস্ট প্রভৃতি শত-শত উচ্চতর পেশায় যাওয়ার পথ করে দিতে হবে। হেফজখানাগুলোতেও কোরআন হেফজের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে এবং হেফজ পড়া অবস্থায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে মূল স্রোতধারায় এসে মিশে যেতে হবে। আমাদের দেশের মতো এতো বহুমুখী হ-য-ব-র-ল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা অন্য কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের পুরোহিতরা (মৌলভি ও মাওলানারা) বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞানকে পরিহার করে শুধু আরবিভিত্তিক যে শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ এ উপমহাদেশে চালু করেছিলেন, বর্তমান বাঙালি মুসলমানরা জাতি হিসেবে সে অদূরদর্শিতার কুফল এখনো বয়ে বেড়াচ্ছেন।

দেশেও মাদ্রাসা শিক্ষার নামে একটা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী আধুনিক সমাজব্যবস্থায় তৈরি হচ্ছে। ইসলামি জ্ঞানসমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষা পেলে এরাও জাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে পরিগণিত

হতো। উন্নত জাতি গঠনে ধর্মীয় আবেগপ্রবণতার কোনো স্থান নেই। সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের যদি নানামুখী উচ্চশিক্ষা দেওয়া যায়, সাথে সাথে মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় অংশ যদি সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে এখনই ছড়িয়ে দিয়ে পুরো বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মুসলমানি-বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক বানানো যায়, তাহলে তা হবে এ উপমহাদেশে বাঙালি মুসলমানদের পুনর্জাগরণ, জাতির টিকে থাকার অবলম্বন, এ-দেশ উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছানোর সোপান।

অধিকন্তু মুসলমানি মাজারতত্ত্ব, পিরতত্ত্ব ও পুরোহিতবাদের অবসান; মুসলমান ধর্মের উদারনৈতিক বৈশিষ্ট্য, সাম্যের বাণী, শিক্ষা ও গুণাবলিকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা ইসলামিক স্কলার তৈরি করতে চাই– আপাদমস্তক কুসংস্কারে ভরা কবরপূজক-পির, নাচুনে-পির ও তাদের দিগ্‌ভ্রান্ত শাগরেদবর্গ দেখতে চাই না। মাওলানা-মৌলভিরা দেশের শত্রু নয়, তাঁরাও এদেশের সম্মানিত নাগরিক–এটা বুঝতে হবে। তাঁদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে, ধ্বংস করে ফেলতে হবে, ঘৃণা করতে হবে, দূরে ঠেলে দিতে হবে, শুধু রাজনীতির কাজে ব্যবহার করতে হবে– এটাও কাম্য নয়।

তাঁদের বিশ্ব-ইতিহাস শিখতে হবে; বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, প্রযুক্তিবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান পড়তে হবে; নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বন্ধ করতে হবে; কথা ও কর্মে উদারতা বাড়াতে হবে; ধর্মব্যবসা ছাড়তে হবে; ধর্ম ছাড়াও একটা জীবনমুখী কাজকে পেশা হিসেবে নিতে হবে; জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতধারায় মিশে যেতে হবে; সৃষ্টির সেবা করতে হবে– এটা কাম্য।

দেশ হতে হবে ধর্ম-বিভেদহীন, প্রতিহিংসামুক্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরাও নিজ নিজ ধর্ম, মানবতা, সহনশীলতা, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা একই সাথে স্কুলে শিখবে, চর্চা করবে, সমান তালে এগিয়ে যাবে। প্রতিটা ধর্মেরই মূল কথা যেহেতু ধর্মীয় অহিংসতা, যার যার ধর্ম তার তার, ধর্মে কোনো বাড়াবাড়ি নেই; তাই দেশ হবে অহিংস ধর্মের দেশ। এ দেশ সকল ধর্মের, সম্প্রদায়ের, গোষ্ঠীর জন্য সমান। রাষ্ট্রের কাছে সকল ধর্ম সমান। এ-মন্ত্র ও শিক্ষা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের উন্নয়ন ও উৎকর্ষের মূলমন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। জনগোষ্ঠীর আত্মিক ও মানসিক কাঠামোর উন্নতি হলে তার সুপ্রভাব রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলেও পড়বে। এভাবে মডেলে উল্লিখিত শিক্ষার উপকরণের ক্রমোন্নতি হবে। ক্রমোন্নতি হবে শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমেরও। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হবে সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি।

(প্রকাশ: ২২ আগস্ট ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

প্রফেসর ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ ও করণীয়

হাতির পিঠে চিমটি মারার বদভ্যাসই বলুন আর দুঃসাহসই বলুন, তা আমার কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে ছোটখাটো একটা চিমটি না মেরে গত্যন্তর থাকে না। পত্রিকা পড়লেই দেখি, এমন চিমটি আমার মতো অসংখ্য অভাজন প্রতিনিয়তই মারছেন। লাভের লাভ কতটুকু হচ্ছে! এদেশে শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশ হাতির চাইতেও বিশালাকার বলে আমার ধারণা। সামান্য চিমটি দিয়ে হাতিকে বশে আনা যেমন দুরাশা, তেমনি একটা লেখা দিয়ে নানামুখী পরিবেশকে অনুকূলে আনাটাও দিবাস্বপ্নের মতো। আবার এই অল্প পরিসরে সব কথা খোলা মন নিয়ে প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। শিক্ষার পরিবেশ অনেকগুলো ফ্যাক্টরকে সম্পৃক্ত করে। এর মধ্যে রাজনৈতিক পরিবেশ-প্রতিকূলতা সকল প্রতিকূলতার সূতিকাগার বলা যায়। যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবেশকে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অনুকূলে আনা যায়, তাদের চৈতন্যোদয় হওয়ারও প্রশ্ন। অন্ধ হলে প্রলয় তো আর বন্ধ থাকে না! তাই যা হবার তাই হচ্ছে। দেশ থেকে শিক্ষা নিরুদ্দেশ হতে চলেছে। এদেশের যত দুর্নীতি, দুরাচারবৃত্তি, দুরবগ্রহ দুঃস্বপ্ন, দুঃশাসন সবকিছুই শিক্ষাহীনতার সামাজিক অভিঘাত। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সততা, মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলি হারিয়ে যেতে বসেছে। শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার অভাবে সমাজ আজ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশিষ্ট পরিবেশে রূপ নিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষাহীনতার প্রভাব পুরো শিক্ষাব্যবস্থার উপর পড়ছে। বিপরীতক্রমে, শিক্ষার অভাবে আমরা এই দুর্বিনীত অভিঘাত-জর্জরিত সমাজের উত্তরাধিকার হয়েছি। এ সমাজ সমাজ-উন্নয়ন ও জাতিগত উৎকর্ষকে ক্রমশই পিছে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এ পরিবেশকে পারম্পরিক দুষ্টক্ষত বলা যায়। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসাটা অতীব জরুরি; যদিও তা অতটা সহজ নয়।

শিক্ষার উন্নতির জন্য সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবেশ দুটোই সমানভাবে প্রয়োজন। সমাজে তো শুধু ছাত্রছাত্রীরাই বাস করে না, আপামর-সাধারণ সবাই বাস করে। তারাও সমাজ থেকে শিক্ষা নেয়। ছাত্রছাত্রীরাও পাঠ্যবই ছাড়াও সমাজ থেকে শিক্ষা নেয়। রাজনৈতিক চাল-চলন, নীতি-দুর্নীতি, সুকর্ম-দুষ্কর্ম প্রতিটার প্রভাব সমাজের উপর গিয়ে পড়ে। শিক্ষা তাই দিন দিন রুগ্নদশায় পরিণত হচ্ছে। এ রুগ্নদশার প্রভাব উদ্ঘাটনের জন্য গবেষণা করলেও শিক্ষাহীনতার কারণে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশার চিত্রই ফুটে উঠবে।

এদেশে রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাপনা মোটেই শিক্ষাবান্ধব নয়। এদেশের মূল সমস্যা হচ্ছে– রাজনীতি। রাজনীতি এদেশে জনসম্পদ গড়ার অন্তরায়। রাজনীতি এদেশের শিক্ষা, সমাজ, মানুষের মনুষ্যত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, মানুষের সুকুমার মনোবৃত্তি ক্রমশই নষ্ট করে দিচ্ছে। প্রতিদিনের পত্রিকাগুলোতে একটু চোখ বুলালে এসবই চোখে পরিষ্কার ধরা পড়ে। যে সরকারই যখন আসে শিক্ষা নিয়ে মহারাজনীতি শুরু করে দেয়। শিক্ষাঙ্গন নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষার্থী নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষকদের নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষার উপকরণ নিয়ে রাজনীতি মহাসমারোহে চলতে থাকে। তাদের একটাই বুঝ, 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।' রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয় উলু-খড়ের প্রাণ যায়। শিক্ষা বলে, আমি কোথায় পালাই! শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হলে জাতীয় অগ্রগতি ব্যহত হয়, দুর্নিবার দুর্গতি শুরু হয়। এক সরকার যায়, আরেক সরকার আসে। দেশ ও জনগোষ্ঠী ক্রমশ পিছতে থাকে। পরিণামে জাতি ধ্বংস হয়, একসময় অশিক্ষিত জাতি দেশকে গিলে খায়। জাতি ধ্বংস হলে, সুযোগ্য রাজনীতিবিদরা কেউই দায়ভার নিতে চায় না, ফল ভোগ করে জনগোষ্ঠী– যুগ যুগ ধরে, কখনো শত শত বছর ধরে। যা বলছি, ইতিহাসের বাস্তবতা থেকেই বলছি। এতে কারো মুখ ভার করার প্রয়োজন নেই। আত্মপক্ষ সমর্থন করারও প্রয়োজন নেই। প্রতিপক্ষ না ভেবে, আক্রমণাত্মক কথা না বাড়িয়ে সমাধানের দিকে যাওয়াই সময়ের দাবি।

রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব সামাজিক পরিবেশকে অস্থির করে তুলছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো সমাজেরই একটা অংশ। সামাজিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বহিঃপ্রকাশ শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের উপর গিয়ে বর্তাচ্ছে। যদি বলা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি কি তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করছে? শিক্ষার্থীদের শিক্ষার কথা বিবেচনা করে ভালো মানের শিক্ষক কি নিয়োগ দিচ্ছে? স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজে শিক্ষার মান বাড়ে এমন কোনো কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে? না-কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উপলক্ষ করে দলবাজি, মারামারি, কুটিল বুদ্ধির চর্চা করছে, অর্থের গন্ধ শুকছে? তারা তো শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতির মাঠ বলে ভাবছে। দৈনিক পত্রিকার পাতাগুলোতে প্রতিদিন আমরা কী পড়ি? দৈনিক পত্রিকার খবরগুলোই আমাদের রিসার্স ফাইন্ডিংস হতে পারে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য কি আমরা মেধাবীদেরকে খুঁজে নিচ্ছি? তাদের নিয়োগ নিয়েও কি আমরা রাজনীতি, নিয়োগ বাণিজ্য, উদগ্র পক্ষপাতিত্ব করছিনে?

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশেরও দৈন্যদশা। অনেক স্কুল-কলেজের প্রতিটা শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্য। স্কুল-কলেজের শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে লেখাপড়াটা হয় না

বললেই চলে। পড়ার জন্য বা পরীক্ষায় পাশের জন্য কোচিং-সেন্টার ও প্রাইভেট টিউশনিকে খুঁজে নিতে হয়। অনেক শিক্ষক আছেন স্কুল-কলেজের তুলনায় বাসায় বা কোচিং-সেন্টারে বসিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার তালিম দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। দিনে দিনে এটাও একটা সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। কেউ বলেন, শিক্ষকেরা শিক্ষা-ব্যবসা খুলেছেন। সাধারণ মানুষ ও স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি নির্বিকার; 'চেয়ে চেয়ে দেখলাম, বলার কিছু ছিল না'। অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। এটাও সামাজিক শিক্ষার অংশ। তারা শিক্ষাঙ্গনের স্টেকহোল্ডার। সচেতন অভিভাবকদেরকে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা সম্মানের সাথে আদায় করে নিতে হবে। ক্লাস-শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের অকালেই ঝরে যাওয়া রোধকল্পে এর কোনো বিকল্প আপাতত নেই। ফুল-টাইম স্কুলিং হবে। প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুইবার টিফিনের ব্যবস্থা থাকবে, খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে। ক্লাসে শিক্ষক শেখাবেন, ছাত্রছাত্রী ক্লাসে বসেই পড়বে, চলমান পরীক্ষা ও ক্লাস-মূল্যায়ন হবে। বাড়িতে শুধু কিছু বাড়ির কাজ থাকবে। হাউজ টিউটর বলুন, টিউশনির ব্যবসা বলুন– সব আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। বার বার সিলেবাস বদল করা সমীচীন নয়। কিছুটা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যেতে পারে। এদেশের শিক্ষায় সিলেবাস যথেষ্ট উন্নত। সিলেবাসের ব্যাপক পরিবর্তনের খেসারত ছাত্রছাত্রীদেরকে দিতে হয়। মূল সমস্যাটা হচ্ছে– পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে। পরিকল্পনা ও নির্দেশনার বাস্তবায়নে বিশাল আকারে সিস্টেম লস দেখা দেয়। সবক্ষেত্রে এটাই বাস্তবতা। 'ফাল্গুন রাতে দখিনা বায়ে কোথা দিশা খঁজে পাই না, যাহা চাই, ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

বর্তমানে অনেক এলাকার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার অঙ্গনে সরকারি টাকায় বড় বড় বিল্ডিং হতে দেখছি। দৃশ্যটা দেখতে ভালই লাগে। বিল্ডিংয়ে বসে সুশিক্ষা কুশিক্ষা দুই-ই নেওয়া যায়। এদেশে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা তো নেহায়েত কম না, অগণন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিল্ডিংয়ের নামে নিরেট একগাদা ইটের স্তূপ তো আর দেশ ও জাতির উপযোগী শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বা জনসম্পদ তৈরি করতে পারে না। প্রয়োজন হয় শিক্ষা-উপযোগী পরিবেশের; সে-সাথে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা। এদেশে এগুলোর বড্ড অভাব। সংশ্লিষ্ট পক্ষের সদিচ্ছা শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। বাস্তবতা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মুখে বলে এক, কাজ করে ভিন্ন। 'মাকালের ফল দেখতে ভালো, উপরে লাল ভিতরে কালো' অবস্থা।

মাত্র কয়েক বছর আগে থেকে পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখন সেটা আবার উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কী

পেয়েছি, কী হারিয়েছি– যোগ-বিয়োগ এখন অনর্থক। সে-সাথে এসএসসি পরীক্ষার সিলেবাসে মানবিক-ব্যবসায়-বিজ্ঞান গ্রুপকে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে শুনেছি। এসব পরিবর্তনে শিক্ষাব্যবস্থার শনৈঃ-শনৈঃ উন্নতি হয়ে যাবে, গুণগত শিক্ষা বৃদ্ধি পাবে, লেখা ও পড়া জানা লোক সব শিক্ষিত হয়ে যাবে– এমনটি ভেবে আত্মপ্রসাদ গনার কোনো অবকাশ নেই। এতে শিক্ষার অবস্থা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে; সরকার ও অভিভাবকমহলের পকেট থেকে কিছু কম টাকা ব্যয় হবে, এটুকুই আশা। বরং অবকাশ আছে, যে যে কারণে পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় ধস নেমেছে, তা খতিয়ে বের করা, প্রতিবিধানের উপায় বের করা। উপায়গুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা। এসএসসি পর্যায়ের সকল কোর্স একবারে চাবি মেরে সুনির্দিষ্ট করে না দিয়ে কিছু কোর্স ঐচ্ছিক রাখা যেতে পারতো। এতে এ পর্যায়ের শিক্ষায় নমনীয়তা বাড়তো। এভাবে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির সিলেবাসেও নমনীয়তা আনার ব্যবস্থা রাখা ভালো। এসএসসি পর্যায়ের ১২০০ নম্বরের পরীক্ষা একবারে দশম শ্রেণি শেষে না নিয়ে, দুই ভাগ করে নবম শ্রেণি শেষে একবার ৬০০ নম্বর এবং বাকিটা দশম শ্রেণি শেষে নিলে অধিক ভালো হতো। এতে ছাত্রছাত্রীরাই বেশি লাভবান হতো। ছাত্রছাত্রীদেরকে দু'বছর শেষে একবার পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত না রেখে অনেকগুলো কোর্সের পড়াশোনার বাধ্যবাধকতাকে দু'বছরব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া যেত। তাতে পরীক্ষার ফলাফলও ভালো হতো। পাবলিক পরীক্ষার নম্বর বেশি বেশি স্কুল-মাদ্রাসার হাতে না ছেড়ে দেওয়াই ভালো। এতে পরীক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। পরিবর্তনের পুরো বিষয়গুলো নিয়েই 'সেকেন্ড থট' দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে।

এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার মান উন্নত করতে গেলে অনেক বিষয়েই পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগবে। একজন শিক্ষিত লোক কি কি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হবে– তা আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার, যাকে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলি। প্রতিটা মানুষের একটা জীবন আছে ও সে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে, জীবন পরিচালনা করতে হয়, জীবন ও সমাজের ভালো-মন্দ বোধ তার মধ্যে জন্মাতে হয়, ভালোর জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয়– তাই শিক্ষা হতে হবে জীবনমুখী। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্ম করে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, কর্মের মাধ্যমে স্বপ্ন পূরণ করতে হয়– তাই শিক্ষা হতে হবে কর্মমুখী। এদেশে কর্মমুখী শিক্ষার ভিত গড়তে গেলে টেকনিক্যাল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা– দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। টেকনিক্যাল শিক্ষার পুরোটাই ব্যবহারিক শিক্ষামুখী হওয়া দরকার। উচ্চশিক্ষায়ও প্রায়োগিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ইন্ডাস্ট্রি-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোল্যাবরেশন বাড়াতে হবে। প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করতে হবে। অক্ষয় কুমার বড়াল বলেছিলেন, 'কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়, ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয়, হৃদয়'।

মানুষ হয়ে মানুষের মতো বাঁচতে মানুষের আগে প্রয়োজন ‘হৃদয়’, অর্থাৎ মন-মানসিকতা। প্রয়োজন মানুষের হৃদয়ে দেশ-মাটি-মাতৃকার জন্য ভালোবাসা, সমাজের মানুষের জন্য দায়বদ্ধতা, মানবতার গুণাবলি যেমন– ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, অহিংস মনোভাব, বিবেকবোধ, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণ। এগুলো সুশিক্ষার মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে হয়, নইলে মানুষ আর মানুষ থাকে না– তাই শিক্ষা হতে হবে মানবিক গুণাবলি-উদ্রেককারী। শিক্ষার্থীর হৃদয়ের গহীন কন্দরে মানবিক এ গুণগুলোকে ঢুকিয়ে দিতে হবে, শিক্ষা মুখস্থ করালে চলবে না। শিক্ষার মাধ্যমে এসব মানবিক গুণের বিকাশ যার হৃদয়ে যতটা প্রস্ফুটিত হবে, তাকে তত শিক্ষিত বলতে হবে। একমাত্র সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ ও যোগ্য শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা পারে এই ভিত্তিমূলগুলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রথিত করতে।

উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উপকরণের যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন সুষ্ঠু ও বিশদ পরিকল্পনা। আমরা সব সময় খাজনার তুলনায় বাজনা বেশি করে ফেলি– সেদিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নযোগ্য হওয়া দরকার। উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন অনেকটা সহজ বলতে হবে। যত অসুবিধা বাস্তবায়ন নিয়ে। এদেশের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা যে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বড় বাধা। তখনই রাজনৈতিক দলগুলোর অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। মুখে সবাই বলে মেনে চলবো, কিন্তু বাস্তবে মানে না। তবু দেশ ও জাতির স্বার্থে শিক্ষার এ উদ্দেশ্য ও তার বাস্তবায়ন করতেই হবে। এ বিষয়টিকে সরকারের আন্তরিকতার সাথে নিতেই হবে। এদেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ দলমত নির্বিশেষে পাশে থাকবেন। বাস্তবায়নে অসুবিধা হলে প্রতিটি ব্যবস্থারই বিকল্প ব্যবস্থা থাকে– বাস্তবায়নের জন্য ভিন্ন পথের কথাও ভাবা যেতে পারে; বারান্তরে বলা যাবে। উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন কতখানি হচ্ছে তা দেখার জন্য তিন বছর পরেই একটা মূল্যায়ন গবেষণা করতে হবে। অর্জনের পথে বাধা-বিঘ্ন, জঞ্জাল অবশ্যই অপসারণ করে ফেলতে হবে। এ যে দেশ ও জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকার প্রশ্ন।

(প্রকাশ: ৩০ আগষ্ট ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

শিক্ষা: সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা

নিজ এলাকাসহ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অবস্থা পারতপক্ষে মুখে আনতে চাইনে। আবার এদেশের সার্বিক পরিবেশ ও মানুষের মনজাগতিক পরিবেশ নিয়ে কিছু করতে গেলে অবস্থাকে এড়িয়েও চলা যায় না– একটু বললেও বলতে হয়, প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে। কারণ সমাজ ও রাজনৈতিক পরিবেশ বাদ দিয়ে তো শিক্ষার পরিবেশ ভাবাও যায় না। সুশিক্ষিত সমাজও গড়া যায় না। তখন সুশিক্ষিত জাতি গড়ার স্বপ্ন 'দিল্লি হনুজ দূর অস্ত' হয়ে যায়। দেশের স্বাধীনতারও তো সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয়ে গেল। প্রতিদিনের পত্রিকাটা যথাসম্ভব মনোযোগ দিয়ে পড়লে এবং পোড়া চোখ দুটো সমাজের দিকে মেলে ধরলেই ভূত-ভবিষ্যৎ মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যায়। আমরা কোথায় যাচ্ছি বোঝা যায়। এজন্য কখনো খেদোক্তি করে বলি, 'পোড়া চো-ও-খ, পোড়া চোখ, কেন তুই বন্ধ থাকিস না, কেন তুই অন্ধ থাকিস না... ।' কথা ছিল রাজনৈতিক নেতারা তাদের কর্মীদের সাথে নিয়ে জনসেবা, সমাজসেবা, দেশসেবা করবে। সুশিক্ষিত জাতি গড়বে। জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করবে। দেশ ও জাতির কল্যাণে, দেশের উন্নয়নে এদেশের আপামর মানুষের ঈর্ষণীয় মেধাকে কাজে লাগাবে। কুসুম কুঁড়িগুলো অকালেই ঝরে যাবে না, বিশ্বসভায় স্বমহিমায় সুবাস বিলাবে। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে সবকিছু দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বলা যায়, কোনো রাজনৈতিক দলেরই গঠনতন্ত্রের মূল নীতির সাথে তাদের কথা ও কাজের কোনো মিলই নেই। সকল নোংরামি, কুশিক্ষা, কুটিলতন্ত্র ও জিঘাংসার আঁতুড়ঘর এখন এই দিগভ্রষ্ট, নীতিবিবর্জিত রাজনীতি। রাজনীতি এখন ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দেশ ও সাধারণ মানুষের সম্পদ লুটপাটের একচেটিয়া ব্যবসা। তাই এখান থেকে জনকল্যাণ ও জনসেবা চাওয়া শ্রাবণের নিকষ-কালো ঘনঘোর অবিশ্রান্ত বর্ষায় শরতের দিগন্ত-বিসারী স্নিগ্ধ-রৌদ্রকরোজ্জ্বল উন্মুক্ত নীলাকাশ চাওয়ার শামিল। এরা দেশকে যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এ জনগোষ্ঠীর গন্তব্য যে কোথায় তা মনের চোখে ভেসে ওঠে। চোখে ভেসে ওঠাটা হয়তো এ দেশে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। ইচ্ছে করে দেখতে চাইনে, তবু চোখে চোখে ভাসে। চোখ বন্ধ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে কেন জানি লাগামহীন দুর্নীতি, লুটপাট, বলদৃপ্ত মিথ্যাচার, দমনপীড়ন, জিঘাংসা, অব্যবস্থাপনা, কুশিক্ষা, মারামারি, খুনখারাপি, গায়েব, প্রতিহিংসা, স্বার্থপরতা, ক্ষমতার দাপট ইত্যাদির ছবি মানসপটে ভেসে ওঠে। সমস্ত ব্যক্তি-স্বার্থের প্রতিভূ চটকদার ভেক ধরে ভিন্ন পথে দেশের সম্পদ লুটপাট করার জন্য জোটবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, একই উদ্দেশ্য সফল করে চলেছে। সব বিকৃত ফন্দি-ফিকির বিষবাষ্পের

মতো সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে ঢুকে পড়েছে। সমাজকে গ্রাস করেছে এবং করে চলেছে। সমাজের দু-কূল প্লাবিত করে ছেড়েছে।

ওদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো, এত সুন্দর একটা দেশ– সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ; অথচ ওরা জনগোষ্ঠীকে জন-আপদে পরিণত করেছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে। এ জনগোষ্ঠী এমন ছিল না। প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে– উচ্চশিক্ষা থেকে তৃণমূল শিক্ষা পর্যন্ত। যেখান থেকে সহজে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা অনেক কঠিন। সত্য বলতে কি, এদেশের জটিল-কুটিল স্বার্থান্ধ বিকৃত রাজনীতি সুস্থ সামাজিক ও শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছে। শিক্ষার মান নামতে নামতে তলানীতে ঠেকেছে। সামাজিক পরিবেশে চলে-ফিরে-খেয়ে-বলে সুখ-শান্তি উঠে গেছে। এই নীতিহীন, চরিত্র-বিধংসী, মনুষ্যত্বহীন, সর্বভুক রাজনৈতিক স্রোতধারা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ও সুস্থ সমাজব্যবস্থা উন্নয়নে বিলীন হওয়া জরুরি। শুধু এদেশ কেন, বিশ্বের অনেক অনেক দেশেরই একই অবস্থা। বিশ্ব-রাজনীতির দিকে তাকালে দেখা যায়, রাজনীতিবিদরা দেশ পরিচালনার নামে গদি রক্ষার স্বার্থে পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাপন ও বসবাসের উদ্দেশ্যকেই পথ ভুলিয়ে ভিন্ন পথে নিয়ে যাচ্ছে। সেক্যিউলারিস্টরা তথাকথিত আধুনিকতার ধুয়ো তুলে তাদের বিকৃত বাতিল ভিত্তিহীন মতবাদ (নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়– এই মতবাদ) নিয়ে অনেক অনেক রাষ্ট্রের ঘাড়ে চেপে বসেছে। মানুষের ধর্ম না থাকলে যে, অধর্মের কালো ছায়া বিশ্ব সভ্যতাকে অন্ধকারে ঢেকে দেবে, এ নিয়ে তারা নির্বাক। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নামে খ্যাত জনগোষ্ঠীর একটা জ্ঞানবিধ্বস্ত অংশ তাদের টোপ গিলে বসে আছে। তারা বিজ্ঞান শিক্ষার মোড়কে ধর্মহীনতার ছবক দিয়ে কৌশলে ছাত্রছাত্রীদেরকে সেক্যিউলারপন্থী বানাতে চায়। তারা মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার টুঁটি টিপে ধরে শ্বাসরোধ করে ফেলেছে। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মানবিক এ গুণগুলো বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এই সতীর্থ-জিঘাংসু, দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতা নিয়ে সুস্থ সমাজ বিনির্মাণ ও সুশিক্ষা আশা করা বাতুলতা মাত্র। সেজন্য অন্য কোনো পথে শিক্ষা, জনসেবা, সমাজসেবা, জাতীয় মুক্তি খুঁজতে হবে। কারণ মানুষের জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের ধারণা থেকে মানুষ ও সমাজকে তো আর বাদ দেয়া যায় না! আর তাই সুশিক্ষিত মানুষ ও আদর্শ সমাজ গড়তে গেলে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব বোধসম্পন্ন মানুষ ও সমাজ গড়তে হবে। মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর পরিবেশের দারুণ প্রভাব আছে। দেশের সাধারণ মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে শিক্ষা নেয়। কখনো ইচ্ছে করে শিক্ষা না নিতে চাইলেও মনের অজান্তে শিক্ষা মনে গেঁথে যায়। তাই এই দুর্গ্রহ দুর্গতি।

গলদটা আসলে কোথায়? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে গিয়ে নীতি-নৈতিকতা, দেশপ্রেম, মানবিকতা বলে কিছু শিখেছে কি না? জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা শিখছে কি না? সমাজ থেকেই-বা সামাজিক মূল্যবোধ ও নীতিকথাগুলো শিখেছে কি না?

মনের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার বালাই না থাকলে মানুষ যেখানে অল্প পরিশ্রমে লাভ বেশি পাবে, সেদিকে চলে যাবে। সুবিধাজনক জায়গায় জিভ উল্টে স্বার্থ হাসিলের খেলায় মাতবে। উলু দিয়ে কাছিম জড়ো করার মতো বর্তমান রাজনীতি ক্ষমতা ও টাকা ছিটিয়ে বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন, স্বার্থান্ধ-দুর্নীতিবাজ ও মতলববাজ লোকগুলোকে একজায়গায় জড়ো করছে। তারপর টাকার খেলা শুরু করছে। শিক্ষা থেকে নীতিকথা, সততা, চরিত্রগঠন, মানবতা, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা দিনে দিনে আগেই সরে গেছে, রাজনীতিতেও তাই। এদেশে কলুষিত রাজনীতির পক্ষে স্বার্থের বিনিময়ে স্লোগান হাকতে পারলেই দেশপ্রেমের একছত্র অধিপতি হওয়া যায়। এদেশে বিবেকের দংশন বলতে কিছু নেই। দেশের মানুষ নষ্ট হয়ে গেলে জাতীয় সম্পদ কে রক্ষা করবে? এর বিপরীতে বলতে হয়– দেশের অর্থ ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা মজবুত করা দরকার। এজন্য সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দরকার। তথাকথিত রাজনীতি ও জনপ্রতিনিধিদের হাত থেকে টাকা লেনদেনের ব্যবস্থা ও উন্নয়নের নামে টাকা বরাদ্দ-ব্যবস্থা সরিয়ে নিতে হবে, যাতে রাজনীতি একটা লাভজনক ব্যবসা না হতে পারে। তখনই রাজনীতি থেকে 'চাটার দল' ও খাদকগোষ্ঠী বিদায় নেবে। দেশসেবক, সমাজসেবক রাজনীতিতে ঢুকবে। এই মানুষ দিয়েই সবকিছু সম্ভব। সব রোগেরই ট্রিটমেন্ট আছে। বিষয়টা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর।

বর্তমান সমাজে রাজনীতিবিদরা জোটবদ্ধ ও সক্রিয়। স্থানীয় সরকারে রাজনৈতিক দলীয় নির্বাচন রীতি চালু হওয়ায় এদের তৎপরতা ও অপতৎপরতা এদেশের তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। এর ফলে আমরা সবাই কেমন আছি, সচেতনমহল পুরোটাই অবহিত। 'পিরিতে মজেছে মন, কী-বা মুচি, কী-বা ডোম।' এরা ব্যক্তি-স্বার্থের নেশায় যৌথভাবে দিগ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটছে। সব এক-রঙা পাখাওয়ালা পাখিগুলো যখন একদলে যোগ দেয়, ব্যক্তি-স্বার্থ তখন দলগত স্বার্থে রূপ নেয়। এদের সুপথে নিয়ে আনা এতটা সোজা না। আমি সে কাসুন্দি ঘাটতে গিয়ে উদ্দেশ্য-বিচ্যুৎ হতে চাইনে। ধানের হাটে মুখ-চুলকানো ওলও নামাতে চাইনে। তাদেরকে কোনো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করা মানে দুধে গো-চোনা মেশানো। স্বল্প মেয়াদের মধ্যে তাদের দিয়ে সমাজ উন্নয়ন এবং সুস্থ ও শিক্ষিত সামাজিক ধারা তৈরি করা সম্ভবপর নয়। পরিবর্তিত সমাজে অর্থাৎ রাজনীতির খোল-নলচে

বদল হবার পর দীর্ঘ মেয়াদে গিয়ে হয়তো সুস্থ সামাজিক ও শিক্ষার উন্নয়নে তারা অবদান রাখতেও পারে।

আবার রাজনীতি ভালো হয়ে গেলেই পরিবেশ হঠাৎ ভালো হয়ে যাবে– এ আশাও করিনে। সমাজে সুশিক্ষা ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো মটর-গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলে নতুন ইঞ্জিন কিনে লাগিয়ে গাড়িকে আবার ভালোভাবে চালানো সম্ভব হয় বটে; কিন্তু কোনো মানুষের মগজ একবার বিকৃত চিন্তার আস্তানা হয়ে গেলে তার জীবদ্দশায় সুস্থ পথে ফেরা হয়তো আর সম্ভব হয় না। সাগর ঝড়-ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কালোরাত্রী পাড়ি দেবার পরে শান্ত হয় বটে, তবে দিগন্ত-বিস্তৃত, লণ্ডভণ্ড, বিক্ষিপ্ত, ফেনিল কর্দমাক্ত রেষ রেখে যায়। এ বিস্মৃতি-চিহ্ন মুছতে সময় লাগে। জনগোষ্ঠীর মানসিকতা একবার বিকৃত হয়ে গেলে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এমনিতে সহজে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না। তবু আবার নতুন করে গড়ার কাজ তো শুরু একবার করতেই হয়। তখন সমাজের লোকদেরকে দলে দলে সময় নিয়ে সুশিক্ষার প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার হয়। ভালো ভালো উপদেশমূলক কথা, মানবতার কথা, জীবনের উদ্দেশ্যের কথা, সুস্থ জীবনের কথা তাদেরকে বার বার বলতে হয়, জীবনের জন্য করণীয় বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হয়। এছাড়া নতুন প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে নতুন করে গড়া ছাড়া উপায় থাকে না। এটাই বাস্তবতা। তবে ঘুটঘুটে অন্ধকারেও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আলোর ইশারা পাওয়া যায়। রাজনৈতিক মদদপুষ্ট একটা বিশাল অংশ পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে জানি। কিন্তু এর মধ্যেও কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি এখনো ভালো আছেন। এছাড়া সমাজের একটা সচেতন ও সুশিক্ষিত অংশ যাদেরকে রাজনীতির কালিমা এখনো কলুষিত করতে পারেনি, তারাও এই সমাজেই নিভৃতে জীবনযাপন করছেন। সমাজ পচে গেলেও বেশ কিছু মানুষ সুশিক্ষার প্রিজারভেটিভ মেখে এখনো অক্ষত আছেন। তারা রাজনীতির কর্দমাক্ত বানভাসি স্রোতে ভেসে যাননি। এটা আশার কথা। এদেরকে নিয়ে আমরা আবার আশায় বুক বাঁধতে পারি। এদেরকে জাগিয়ে ঘরের বাইরে বের করে আনা যায় কি-না ভাবা দরকার। একত্রিত করা দরকার। মানবসম্পদ উন্নয়ন পড়তে গিয়ে, আবার বাস্তবেও দেখেছি, কেউ অন্য অনেকের খাবার জোর করে নিজের উদরজাত করে তৃপ্তি পায়, আবার কেউ নিজের খাবার অন্যদেরকে ভাগ করে খাইয়ে তৃপ্তি পায়। এটা মানুষের প্রকৃতি। উভয় ধরণের মানুষই তো সমাজে আছে। মানুষ ষড়রিপুর আধিক্যে মানুষ নামের কলঙ্ক হয়, পঙ্কিলতার সাগরে ডুবে যায়, আবার মানবিক গুণগুলো জাগিয়ে তুলতে পারলে মনুষ্যত্ব ও মানবতা বোধ ফিরে পায়, মানুষের মতো মানুষ হয়, মানুষের মতো কর্ম করে, আচরণ করে।

মানুষের অন্তর্নির্বিষ্ট স্বভাব বাদ রেখেও সুশিক্ষা ও যোগ্য প্রশিক্ষণ এবং সুস্থ সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে 'মানুষের মতো মানুষ' রূপে গড়ে তোলা যায়। এভাবেই সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র ও টেকসই জাতি গড়ে ওঠে। শ্রুতিকটু কথাটা হলো: বিশ্বের অনেক দেশের রাষ্ট্র-পরিচালকদের মানসিকতাই তো সুস্থ নয়, তা সুস্থ সমাজব্যবস্থা ও আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে উঠবে কীভাবে? বিশ্বময় অসুস্থতার প্রতিযোগিতা, ষড়রিপুর প্রাবল্য, নির্লিপ্ত-নিরুদ্দিষ্ট মানবতা। চারদিকে কালিমামাখা চিন্তার রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের নিকৃষ্ট চিন্তা ও কর্মকাণ্ড। অথচ ধরণী চায় সৃষ্টির অনুগামী টেকসই চিন্তা-চেতনা, চিন্তার উৎকৃষ্টতা। মানুষ চায় ব্যক্তি-স্বার্থ, প্রকৃতি চায় সামষ্টিক স্বার্থ। তবে ব্যক্তির সুষ্ঠু চিন্তাধারা সামষ্টিক সুস্থ চিন্তার উৎস। ব্যক্তির মানসিক উন্নতির মধ্যে সামষ্টিক উন্নতি নিহীত। তাই ব্যক্তির মানসিক উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তির উন্নতির মধ্য দিয়ে সামষ্টিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

এই গা-সওয়া অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে একটা সামাজিক ধাক্কা দরকার। একে বলে সামাজিক আন্দোলন। সুশিক্ষিত-সমাজসচেতন জনগোষ্ঠীর অহিংস, সুশিক্ষা, সত্য ও সুনীতির আন্দোলন। নইলে এই থিতানো হাজা-মজা অবস্থা যুগ যুগ ধরেই চলতে থাকবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। ধাক্কা না দিলে বাঞ্চিত ফল পাওয়া যায় না। ধাক্কা দিয়ে গাড়িটাকে স্টার্ট করে দিতে পারলেই গন্তব্যে পৌঁছানোর স্বপ্ন অন্তত দেখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন, ধাক্কাটা কাকে দিয়ে দেবেন? কে আগে শুরু করবে? এজন্য একটা সামাজিক অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দরকার, যা হবে সমাজের আলোকিত মানুষের সমাবেশ। আমি বর্তমানে সমাজের এই আলোকিত মানুষের খোঁজে আছি। এত ঝড়-ঝাপটার মধ্যে এরা এখনো সমাজে টিকে আছে। তাদেরকে ঘর থেকে বের করে আনতে হবে। একত্রিত করতে হবে। আলোর ঠিকানা দিতে হবে। একটা প্ল্যাটফর্ম দিতে হবে। পথ দেখাতে হবে। হাত-জোড়া খুলে দিতে হবে। বলতে হবে, 'যাও, এবার সামনে চলো, দেশের সেবা করো, সমাজ ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করো'। ওগো সাথি এখনো পথ বহুদূর যেতে হবে, ঐ ধু-ধু মাঠ, প্রখর সূর্য পেরিয়ে তারপর বনাঞ্চল, সবুজের ছায়া।

(প্রকাশ: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

গ্রামীণ সমাজে শিক্ষা ও মানবসম্পদ গঠনের হালহকিকত

মানুষ আছে বলেই দেশ। মানুষের জন্য দেশ। মানুষই মানুষের জন্য দেশ গড়ে। মানুষই সর্বেসর্বা। আমি বলি উন্নয়ন মানে বসবাসরত আপামর জনগোষ্ঠির মানসিক উন্নয়নের প্রশস্ততা। উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী উন্নত সমাজ গড়বে, দেশ গড়বে। মানসিকতার এই উন্নতি ঘটাতে পারে একমাত্র সুশিক্ষা, উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। সুশিক্ষা উন্নত সমাজ গড়ার জন্য মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। আবার শিক্ষা মানেও শুধু লেখা, পড়া ও অঙ্ক জানাকে বোঝাবে না। এ তিনটি ছাড়াও শিক্ষায় মনের ভিত্তিমূলে ধর্মীয় মূল্যবোধ, অনুসন্ধানী মনোভাব ও সৃষ্টিশীলতা, মানবিকতা, সততা, জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধ, দেশপ্রেম এবং ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণগুলো জেগে উঠতে হবে। এই গুণগুলোর সূচক যত উপরের দিকে যাবে, সে জনগোষ্ঠী তত শিক্ষিত হবে। আমার দৃষ্টিতে দেশের উন্নয়ন মানে দেশের মানব সম্পদের উন্নয়ন। মানব-সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। মানব-সম্পদকে অনুন্নত রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে না। যদি মানব-সম্পদকে মানব–আপদ বানিয়ে উন্নয়নের চেষ্টা করাও হয়, সে উন্নয়ন দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, দুঃশাসন ও দুশ্ছেদ্য অন্ধকারে ভরা– তা আপাতদৃষ্টিতে উন্নয়ন দেখা গেলেও সে উন্নয়ন সাময়িক, হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো, ফু দিয়ে ফোলানো বেলুনের মতো– সকাল হতে না হতেই চুপসে যায়, টেকসই উন্নয়ন হয় না। সেজন্য আমাদের সবারই দূরদর্শী লেন্সওয়ালা চশমা কেনা দরকার। যে কথার কোনো বিকল্প নেই, তা হলো– দেশকে উন্নত করতে গেলে, দেশটা ভালোভাবে চলতে গেলে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সৎ, নীতিবান, যোগ্যতাসম্পন্ন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দেশাত্ববেধে উজ্জীবিত জনসম্পদ (জন-আপদ নয়) সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ও পদে কর্মরত থাকতে হবে। কোনো একক ব্যক্তি, সে যত সৎ ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিই হোন না কেন, রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষিত, সৎ ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া, সমৃদ্ধ জাতি, উন্নত সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র গড়তে পারেন না।

উন্নত দেশ ও সমৃদ্ধ জাতি গড়তে হলে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার উন্নয়ন দরকার। আমাদের জনগোষ্ঠীর শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকল্পিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আছে কি? বাস্তবতা হচ্ছে, উপযুক্ত শিক্ষার উন্নয়নে আমরা শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশই দিতে পারছিনে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বই থেকে শেখায় এক কথা, বাইরের পরিবেশ থেকে শেখে উল্টোটা। খেলাপাগল অবুঝ বাচ্চারা জীবনের উন্নতির কিই-বা এমন বোঝে! একটুতে একটু হলেই কুঁড়িতে ঝরে যায়। উঠতি বয়সে বিপথে যায়।

ভবিষ্যতে নিজেই যখন নিজের অপারগতার কথা বোঝে, তখন আর ফেরার পথ থাকে না। এভাবে পর পর তিনটা পুরুষ আত্মসচেতনতার অভাবে লেখাপড়া হয়নি আবার মাঝখান থেকে ষাট বছর পেরিয়ে গেছে— এমন অনেক পরিবারকেই আমি দেখেছি। এ জন্যই স্বাক্ষরতার হার এদেশে তেমন একটা বাড়ছে না। জোড়া-তালি দিয়ে খাতা-কলমে যা দেখানো হচ্ছে তার মধ্যেও অতিরঞ্জিত আছে বলে জানি। আবার স্বাক্ষরতার হার একটু বাড়লেও শিক্ষার হার নিম্নমুখী। এভাবে শিক্ষার হারকে স্বাক্ষরতার হার দিয়ে আর কতদিন চলবে! মূলত কলম কাঁপাতে কাঁপাতে নামের বানানটা কোনোভাবে এলোমেলো বসাতে পারলেই তাকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাতারে নাম না লেখানোই ভালো। আমরা লেখাপড়ার উদ্দেশ্যকে জীবন পরিচালনার জন্য শিক্ষা না ভেবে চাকরি পাওয়ার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেছি। অথচ চাকরি পেতে লেখাপড়ার সাথে প্রয়োজনীয় সফ্ট স্কিলস না শিখে শুধু সাধারণ লেখাপড়া শিখে চাকরির বাজারে ভিড় জমায়। ফলে বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ে। দরকার, কারো প্রকৃতি-প্রদত্ত অবস্থান থেকে শিক্ষার ভিত্তিমূল প্রয়োগের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তার উৎকর্ষ ও উন্নতির ব্যবস্থা করা। এই মানসিকতার ও চিন্তা-চেতনার উন্নতির নামই শিক্ষা। উন্নত সমাজ গঠনে এই শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। লেখাপড়া দিয়ে শিক্ষা অর্জনের সূচনা। শিক্ষা মানে একজন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালনার জন্য জীবনের প্রথম থেকেই একটা সাধারণ প্রস্তুতি। সেজন্যই জীবন শেষে অবসর জীবনে শিক্ষা না দিয়ে জীবনের শুরুতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষা জীবনভর থাকা দরকার। দেশে যদি প্রকৃত শিক্ষার উন্নতি না করা যায়, তবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও মুখসর্বস্ব বিজ্ঞাপিত উন্নয়ন কোনো দিনই টেকসই উন্নয়ন হয় না। তা অল্প সময়ের ব্যবধানে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।

এবার বেশ কিছুদিন পর গ্রামে গেলাম। করোনার কারণে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে স্কুল খুলেছে। ইচ্ছে করেই বেশ কয়েকটা প্রাইমারি স্কুলে গেলাম। প্রায় প্রতি গ্রামেই সরকারি প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। যত গোল পাকালো এই 'সরকারি' (ব্যতিক্রম বাদে, ব্যতিক্রম তো কোনো ক্রম নয়) শব্দটা নিয়ে। সরকারি সেবা, দিতে চায়ই-বা কে-বা! শিক্ষকগুলো তো সরকারি লোক হয়ে যায়। কাজ ও বেতনের চিন্তামুক্ত নিরাপত্তা পায়। দায়িত্বও সরকারি দায়িত্ব। 'সরকারি মাল, দরিয়ামে ঢাল' দেখা দেয়। এসবও শিক্ষা ও দায়িত্ববোধের অভাব। সেজন্য সবাই সরকারি ও এমপিও-ভুক্তির খাতায় নিজের নামটা যে-ভাবেই হোক লেখাতে চায়। দায়িত্ববোধের কোনো বালাই নেই, কর্মোদ্যম নেই, শুধু বসে বসে সময় পার করার চেষ্টা। সময়ের অনিবার স্রোতে জীবন ও কর্মকে নগণ্য করে কাগজের নৌকার মতো ভাসিয়ে দেওয়া। এটা এ

দেশের প্রতিষ্ঠিত হাবভাব, নিয়ম, সংস্কৃতি। এই সরকারি মনোভাব ও অবস্থার স্রোতে বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোও গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এই নিশ্চেষ্ট মনোভাবের ধাক্কা স্কুলগুলো ও ছাত্রছাত্রীরা সামলাচ্ছে। শিক্ষকদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। জেলা-উপজেলার কর্মকর্তারা কখনো-সখনো স্কুল ও শিক্ষকদের দেখতে আসেন। শিক্ষার অবস্থা তো আর দেখতে আসেন না। শিক্ষক ও কর্মকর্তার চাকরি অব্যাহত থাকে। এভাবেই যুগ যুগ ধরে চলছে। এভাবে চলে চলে গা সওয়া হয়ে গেছে। অনিয়মই নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টা হচ্ছে, সমাজে একবার যদি কোনো একটা অনিয়ম চলে আসে, সেটাকে সাথে সাথে মূলোৎপাটন না করতে পারলে সেটা আরো ডালপালা মেলে ক্রমশই প্রসার লাভ করে। অনিয়মের মূল বৃহত্তর সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক পর্যায়ে আসা অতটা সহজ হয় না। দেখলাম, পঞ্চম শ্রেণির খুব কম ছাত্রছাত্রীই উচ্চারণ করে বাংলা বইটা পড়তে পারে। যোগ বিয়োগ জানে না। হাতে গুনে যে ক'জন জানে, তা জানে তাদের সচেতন বাপ-মায়ের কারণে। বাপ-মাদের বাড়িতে নিজে অথবা আলাদা টিউটর রেখে ছেলেমেয়েকে পড়ার তালিম দিতে হয়। স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা শুধু আসে এবং যায়। পরীক্ষা দিতে হলে স্কুলে আসতে হয়। উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য আসতে হয়। অভিভাবকমহলের অনেকেই অসচেতন, অজ্ঞ। উপবৃত্তির টাকা হাতে পেয়েই খুব খুশি। শুধু নগদটাই বোঝে, ভবিষ্যৎটাকে একেবারেই বুঝতে চায় না। ছেলেমেয়েদের জীবন থেকে যে পাঁচটা মূল্যবান বছর নষ্ট হয়ে গেল অথবা পঞ্চম শ্রেণি শেষেই ঝরে গেল– সে ভাবনা বেখবর। তাদের নিদেন বুঝ, 'স্কুলে গেলে মাসে মাসে উপবৃত্তির টাকাটা তো পাওয়া যাচ্ছে। এটাই-বা মন্দ কি!'

প্রাইমারি স্কুলের পাশাপাশি হাই স্কুলের খোঁজ-খবরও ভালোমতো নিলাম। আশপাশ যত হাই স্কুল আছে একই অবস্থা। তারপর বেশীরভাগ ছেলেমেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির আগেই ঝরে যাচ্ছে। আবার হাইস্কুলে গেলেও সেখানে কোনো শিক্ষা নেই। লেখাপড়ার জন্য বাসায় টিউটর। স্কুলে যাওয়া আসা মানে স্কুলের খাতায় নাম লিখিয়ে রাখা, লেখাপড়ায় বহাল থাকা। সময়ান্তে সার্টিফিকেট পাওয়ার বন্দোবস্ত। লেখাপড়ার মানও খুব নিম্ন। চিন্তাভাবনা ও চেতনার উন্মেষ নেই। মানবতা, সততা, দেশপ্রেম, মূল্যবোধ শিক্ষা নেই। না আছে ভাষা জ্ঞান, ভাবুক মন, জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা। যারা উচ্চশিক্ষায় যাচ্ছে, তাদেরও গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে। দিন পার হয়ে যাচ্ছে। লেখাপড়ায় বইয়ের পড়ার সাথে বাস্তব ঘটনাকে মেলাতে শেখে না। লেখাপড়া মনে চিন্তার উদ্রেক করে না, ভাবনা আসে না। মনের মধ্যে কোনো সৃষ্টিশীলতা জন্মায় না। টেক্সট বইও না, শুধু নোট মুখস্ত করার কর্ম। কোনো ভাষা জ্ঞান নেই, ভাষার উপর দখল নেই। জীবনের জন্য শিক্ষা

নেই, সমাজের জন্য উপযুক্ত মানুষ হবার শিক্ষা নেই, কর্মমুখী শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্যশিক্ষা নেই, নৈতিকতা-শিক্ষা নেই। অথচ নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। স্কুলের কেরানি মহাশয় প্রয়োজন মোতাবেক শিক্ষা-রিপোর্ট শিক্ষা বিভাগে যত্ন সহকারে পাঠাচ্ছেন। রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে জাতীয় সংষদে দাঁড়িয়ে কেউ-না-কেউ বক্তৃতার ঝড় তুলছেন। পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। দিন পার হয়ে যাচ্ছে।

আমরা যেহেতু স্বাক্ষরতার হার বাড়ানো নিয়েই বড় বড় বক্তৃতা দিতে থাকি, তা হচ্ছে। এমনিভাবে লক্ষ লক্ষ কুসুম কলি যে প্রস্ফুটিত না হয়ে প্রতিনিয়ত কুড়িতেই ঝরে যাচ্ছে, দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে, জনগোষ্ঠী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে– এ নিয়ে কারো কোনো উচ্চবাচ্য নেই। শিক্ষকেরাও চুপচাপ, বেতন নিয়েই তৃপ্ত বোধ করছেন। স্কুল কমিটিরও কোনো টু-শব্দটা নেই; সবাই রাজনীতি নিয়ে ও যার যার ধান্দায় মহাব্যস্ত। এমন করে বিশাল একটা অবুঝ জনগোষ্ঠীর জীবনকে আমরা অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দিচ্ছি। আবার জনসম্পদ ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে উন্নয়নের জিকির পাড়ছি। কখনো হা-হুতাশ করছি, কখনো বিকারগ্রস্ত লোকের মতো প্রলাপ বকছি। দেশের উন্নয়নের কথা বাদ দিলেও যে অগনিত মানবসন্তান জীবনযুদ্ধে শুরুতেই হেরে গেল, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হলো, তারা এই অন্ধকার মানবেতর জীবন কাটানোর জন্যই হয়তো পৃথিবীতে জন্মেছিল, এ কথাই মেনে নিতে হয়। নইলে তাদের এই হতচেতন বঞ্চনাভরা জন্মের স্বার্থকতা কোথায়?

আর্থ-সামাজিক গবেষণার কাজে বিভিন্ন এলাকার গ্রামীণ সমাজে গেছি, প্রতিটি পরিবারকে কাছ থেকে পরখ করে দেখেছি। হয়তো দাদা লেখাপড়া করেনি, আবার তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর সময় আসতে কমপক্ষে পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে। নাতি-নাতনী ও তাদের অভিভাবক যদি আবার লেখাপড়া উদাসী হয়, তাদেরও লেখাপড়া হয় না। তাদের পরবর্তী পুরুষ আসতে আবারো পঁচিশ বছর পেরিয়ে যায়। তাই দাদা থেকে নাতি পর্যন্ত বা তার ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত ষাট বছর পেরিয়ে যায় নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে। এভাবেই কিন্তু এদেশের শিক্ষা বংশ-পরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর পর্যন্ত অধরা রয়ে যাচ্ছে। পরিবারের কেউ কেউ কপালগুণে লেখাপড়া শিখে বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। অনেকেই প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি না পেরোতেই ঝরে যাচ্ছে। আর লেখাপড়া তো শুধু স্কুলে আসা-যাওয়া করলেই হয় না। বাপ-মার আগ্রহ ও সচেতনতা এবং উপযুক্ত পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

এমনই একটা পরিবারের অশীতিপর বৃদ্ধ রহমতুল্লাহ। লেখাপড়া জানেন না। রহমতুল্লাহর মৃত্যু-পালে বাতাস লেগেছে, এদেশের স্বাধীনতার জন্ম অর্ধশতবার্ষিকী ধুমধামের সাথে পালিতও হয়েছে; কিন্তু তার মুমুক্ষু ওয়ারিশগণের আত্মোন্নয়ন ও

শিক্ষা-দীক্ষার তেমন কোনো পরিবর্তন আমি লক্ষ করিনি। অজ্ঞতা এদের জীবনসঙ্গী। এরা জীবনের অর্থ বোঝেনি। এরা উদয়াস্ত হাড়ভাঙা কায়িক শ্রম দিয়ে শুধু দু'বেলা পেটের ভাত যোগাড় করাটাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে ঠাওর করেছে। আর হালনাগাদ জরাগ্রস্থ-নষ্ট-দিকভ্রষ্ট দেশীয় রাজনীতির বিষবাষ্পে আক্রান্ত হয়ে দুর্বিনীত-রাজনৈতিক শক্তির সামাজিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এভাবেই মগডালের সুখপাখিকে আকড়ে ধরার সুখদ স্বপ্ন দেখেছে। আবার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সীমিত চিন্তার গন্ডিতে আবদ্ধ থেকেছে কিংবা শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসার কোনো চেষ্টা করেনি বা চেষ্টার চিন্তাই মাথায় আসেনি বা পরিবেশ তাকে বঞ্চিত করেছে। ভাগ্যকে দোষারোপ করে প্রকৃতির কাছে হার মেনেছে।

বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজনদের মাধ্যমে, পেপার-পত্রিকা পড়ে সারা দেশের গ্রামবাংলার শিক্ষা, শিক্ষার দশা ও সামাজিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়েছি ও জেনেছি। সব জায়গার অবস্থা কমবেশি একই রকম।

রহমতুল্লাহর চিন্তা-ভাবনার পরিণতি ভাবলে আমার কষ্ট হয়। তিনি নিজে বোঝেন না সত্য, কিন্তু সমাজের কেউ না কেউ যদি তাকে শিক্ষার সুফল ও উন্নত জীবনব্যবস্থা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলে ছেলে-মেয়েগুলোকে অন্তত লেখাপড়া শেখানোর জন্য পথ দেখাতো, শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে নিয়মিত কাউন্সেলিং করতো, নিয়মিত জীবনমুখী প্রশিক্ষণ দিতো, স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতো, তাহলে তাকে কিংবা তার বংশধরদেরকে এভাবে বংশ পরম্পরায় নিরক্ষর, অজ্ঞ বা অশিক্ষিত থাকতে হতো না। এদেশের জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব কী? তারা তাদের মূল দায়িত্ব থেকে যোজন যোজন দূরে সরে চলে গেছে। আমরা উন্নয়নের রূপরেখা গড়তে ব্যক্তিকে (ব্যষ্টিক) টার্গেট করে কাজে নামছিনে কেন? ব্যষ্টিক উন্নয়নের যোগফলই তো সামষ্টিক উন্নয়ন। তাহলে দেশও রহমত গংকে নিয়ে অনেক আগেই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেত। এই একটা বংশ পরম্পরার মধ্যেই এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর অনেক ভাবনা-চিন্তা, মনোবিজ্ঞান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রূপরেখা, জীবন দর্শন, বঞ্চনা ও কালের কথা লুকিয়ে আছে।

(প্রকাশ: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা

প্রতিদিনের পত্রিকা পড়া মানেই চারপাশের শতেক অবনতিশীল অবস্থার খবর মাথায় আসা– মনে নাড়া দেওয়া, আবার সময় অতিক্রমনে ভুলেও যাওয়া। অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। গতকাল সকালে উঠে দৈনিক পত্রিকাটা হাতে নিতেই 'সম্পাদকীয়'তে দেখলাম, 'সরকারি ব্যয়সংক্রান্ত নির্দেশনা– অনিয়ম-দুর্নীতি রোধেও নিতে হবে পদক্ষেপ' (যুগান্তর, ১৩ সেপ্টে. ২০২২)। আজ সকালের পত্রিকায় একটা হেডলাইন পড়লাম, 'সার্ভেয়ারের ঘুস নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল' (যুগান্তর, ১৪ সেপ্টে. ২০২২)। প্রথম লাইনটা এ-রকম, ''ঘুস ছাড়া কোনো কাজ হয় না সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার সহকারী কমিশনারের (ভূমি) অফিসে'। সংবাদে দুর্নীতির সাথে এদেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কাজ-কারবার প্রতিফলিত হয়েছে। সারা বছরের প্রতিদিনই এ-জাতীয় সংবাদ পড়তে হয়। বছরের প্রথম দিকের আরেকটা প্রাসঙ্গিক তামাদি সংবাদও দুটো কারণে উল্লেখ করা দরকার: টাকার অংক সামান্য একটু (?) বেশি আর কথাগুলো ছিল 'সত্য-ভাষণ'। হেডলাইনটা এমন, 'লোপাট ১৫০০০ কোটি টাকা'। এ দেশে এমনই খবর চন্দ্র-সূর্যের প্রতিটি তিথি-লগ্নে হরহামেশাই চোখে পড়ে। 'হাজার হাজার কোটি' শব্দটাও যেন ডাল-ভাত হয়ে গেছে। আবার কোনো কোনো লোপাটের খবর অনেকদিন পর লোক পরম্পরায় শুনি, পত্রিকায় আসে না। ঐ খবরটা না-ভুলে প্রাসঙ্গিকতার কারণে সেখান থেকে উদ্বৃতি করছি।

'সরকারি ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি ও অনিয়ম চিহ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি, জ্বালানি তেল ক্রয়, খাদ্য বিতরণ, ব্যাংক, বিমা ও রাজস্ব খাত ঘিরে এ অনিয়ম হয়। পাশাপাশি কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য বিদেশি প্রকল্পে সরঞ্জাম কেনাকাটায় অনিয়ম ধরা পড়ে। করোনাকালেও থেমে ছিল না শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গরিব মানুষের খাদ্য বিতরণের টাকা ব্যয়ে অনিয়ম। যা নিরীক্ষা বিভাগের ২০২০-এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।... বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্থিক দুর্নীতি একটা সামাজিক ক্যানসারে রূপ নিয়েছে। ক্যানসার যেমন কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুর দেশে পাঠিয়ে তারপর শান্ত হয়। তেমনি দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লুটপাট– এসব সামাজিক ক্ষত দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে পঙ্গু না করে শান্ত হবে না। দুর্নীতির কারণে সমাজে হলমার্ক, বিসমিল্লা গ্রুপ তৈরি হয়েছে। এতে সমাজের টার্গেট গ্রুপ তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। জিডিপির একটি অংশ নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড ইকোনমির জন্ম হয়। সেখান থেকে দেশের বাইরে হাজার হাজার

কোটি টাকা পাচার হয়। সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলে।' (দৈনিক যুগান্তর, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)।

আমি খুঁজে ফিরছি, এদেশের কোন সেক্টরে এই 'মহামহিম ধন্বন্তরি মহৌষদের' বাস্তব এবং প্রকাশ্য প্রয়োগ নেই? জন্ম-মৃত্যুতে, জীবনের ঘাটে ঘাটে– কোথায়? তাইতো আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে স্রোতের অনুকূলে বসে আছি। আমার আজকের আলোচনার বিষয় অবশ্য দুর্নীতি নিয়ে ঘাটাঘাটি না।

ছাত্রাবস্থায় সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতির যা শিখতে পারিনি, তার কিছু কিছু এখন শিখছি। পত্রিকার মাধ্যমে লুটপাটের একটা সামান্য অংশ গোচরিভূত হয়। বাকিটা সাধারণ মানুষের অজান্তেই রয়ে যায়। এক সময় পুকুর চুরির খবর পড়তাম। এখন 'নদী চুরি', 'সাগর চুরি'র খবরও পড়তে হয়। পড়ে চোখে সরষের ফুল দেখি। এক সময় চোখের ধাঁধা কাটে, কিন্তু মনের ধাঁধা রয়ে যায়। তবে মানুষ চোখ দিয়ে তো আর শুধু পত্রিকাই পড়ে না– বাস্তব অবস্থা, পরিস্থিতিকে পড়ে, বোঝে, শেখে। এর নামও শিক্ষা। পরিবেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া। যার মনে যেটা চায়, সে সেই শিক্ষাটা নেয়। সে-মতো কাজ করে। কেউ লুটেরার দলে ভেড়ে কিংবা ভেড়ার জন্য দলীয় গুণগানের কোরাস চর্চা করে। কেউবা লুটেরা শ্রেণি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য 'ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি' পড়ে ঘরে ঢুকে বসে থাকে। তবে এদেশের প্রতিটা লুটতরাজের সাথেই রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আছে বলে পত্রিকায় পাওয়া যায়। বর্তমানে এদেশে ব্যবসায়ের রাজনীতি বা রাজনীতির ব্যবসা– দুটো কথাই সমভাবে খাটে। রাজনীতির মদদপুষ্ট মতলববাজ দুর্বৃত্ত-দুরাচাররা এগুলো করছে। রাজনৈতিক প্লাটফর্ম দলীয় নীতি-আদর্শ ভুলে দেশের মানুষের সম্পদ মেরে-কেটে খাওয়ার নিরাপ আখড়া হয়েছে। রাজনীতির বিষবাষ্প সামাজিক এথিক্সের পুরোটাই নষ্ট করে ফেলেছে। সাধারণ মানুষ যেদিকেই যায় পচা-দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ পায়। মূলত একটা জনগোষ্ঠী নষ্ট হয়ে গেলে লাইনে আনা চাট্টিখানি কথা না! আমরা এদেশের জনগোষ্ঠীকে নিজ গুণে জন-আপদ বানিয়ে ফেলেছি, তাই এত দুর্গন্ধ।

দুর্নীতি এমন একটা সামাজিক ব্যাধি যা দেশের অর্থনীতিকে, মানুষের সুস্থ মানসিকতাকে, সাধারণ মানুষের সহায়-সম্পদকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এই ব্যাধিগ্রস্থ লোকের সংখ্যা দিন দিন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অর্থনীতির নাভিশ্বাস বইয়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের যারা আমানতদার তারাই বিভিন্ন ছল-চাতুরিতে ভক্ষক। এ নিয়ে সাধারণ মানুষ নির্বাক। ভক্ষকরা পঙ্কিল রাজনীতির শিক্ষাগুরু– লুটতরাজে মত্ত, জেগে ঘুমায়। দুর্নীতি, মিথ্যাচার ও চটকদার কথা এদের ধর্ম, রক্ষামন্ত্র, পাথেয়, সামাজিক পূঁজি। রাজনীতি ও উন্নয়নের বুলি এদের সামাজিক ঢাল, রক্ষাকবচ।

দুর্নীতির এই কিঞ্চিৎ উদাহরণ থেকে একটা কথা খোলা চোখে বলা যায়, সুশিক্ষা, সুশাসনের অভাব ও প্রশাসনিক নৈরাজ্য অর্থনৈতিক নৈরাজ্যকে ত্বরান্বিত করে। সে-সাথে এ দেশের জনসম্পদের করুণ দশাও ভেসে ওঠে। দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, মিথ্যাবাদী, প্রতারক, সরকারি তহবিল তছরুপকারীকে কখনো মানবসম্পদের সারিতে দাঁড় করানো যায় না। এসব কথা ভাবতে গেলেই শিক্ষাতে মানবিক মূল্যবোধ, সততা, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলির সম্মিলন ঘটিয়ে দেশে মানবসম্পদ তৈরির গুরুত্ব এসে যায়, যা নিয়ে আমরা দায়সারা গোছের কাজ করি।

আমি কোনো সরকারকে কোনো দুর্নীতি বন্ধ করতে বলিনে। কোনো সরকার তা ইচ্ছে করলেই পারে না। সরকার তো কোনো একক ব্যক্তি নয়। তাছাড়া দুর্নীতি একটা সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ। পরিবেশ দিনে দিনে ধ্বংস হয়। পরিবেশ তৈরিও অনেক দিনের ব্যাপার। সরকার একটা সামষ্টিক বা গোষ্ঠী-বর্গীয় পরিচালনা। এজন্য গোষ্ঠীভূক্ত সকলকেই সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব নিতে হবে। দেশের মানুষকে মানব-আপদ বানিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করতে চাওয়া মাথায় আঘাত করে টাকের যত্ন নেয়ার শামিল। দুর্নীতি, দুরাচার, দুর্বৃত্ততা, দুঃশাসন একটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পর একটা ক্ষয়িত-কুশিক্ষিত-জারিত পরিবেশের অনিবার্য সামাজিক অভিঘাত। সুস্থ সামাজিক পরিবেশের ক্রমশই অবনতি ঘটছে। বলা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই এদেশের শাসনব্যবস্থা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ও উন্নয়নের পরিবেশ গঠনে ক্রমশ ব্যর্থ হয়ে চলেছে। স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা উঠে গেছে। সমাজে তাই সুশিক্ষা, সুস্থ চিন্তা, সুখ-শান্তি উঠে গেছে। একটা উন্নয়ন ও মানবসম্পদ-শত্রুভাবাপন্ন সমাজ দিনে দিনে অজান্তেই তৈরি হয়েছে। খাজাঞ্জির নিয়ন্ত্রণ জনগণের হাত থেকে লুটেরা গোষ্ঠীর হাতে চলে গেছে।

উল্লিখিত খবরের পিঠে অনেক কথা চলে আসে। দুর্নীতির মাধ্যমে এভাবে টাকা লুটপাট করে সমাজের একটা অংশ টাকার মালিক হচ্ছে। এতে ধরে নিতে হবে আরেকটা অংশ তার আর্থিক অধিকার ও প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অবৈধ টাকার মালিকের সাথে টাকার প্রতিযোগিতায় খেটে-খাওয়া মানুষ টিকতে পারছে না। এতে সমাজে সাধারণ মানুষের আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশা বাড়ছে। আয় বৈষম্য বাড়ছে। আমরা গড় হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দেখিয়ে বাহবা নিচ্ছি। এমনটি ভাবা অমূলক নয় যে, এই অবৈধভাবে অর্জিত কালো টাকাই হয়তো বিদেশ ঘুরে সাদা টাকার নামে খোলস বদলিয়ে আবার এদেশে এসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে যোগ হচ্ছে। যার টাকা তারই থাকছে। দুর্নীতিবাজরা অঢেল টাকার মালিক হচ্ছে। যে বা যারা সুযোগ-বঞ্চিত বা সুনীতির কারণে অবহেলিত বা বঞ্চিত ছিল–

সে বা তারা বঞ্চনার সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে। আমরা টেকসই কোনো ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেল হাতে নিতে পারছিনে। যে মডেলই হাতে নিচ্ছি, লুটেরার দল সকল সুবিধা সমূলে সাবাড় করে দিচ্ছে। বণ্টন ব্যবস্থার ক্রটির কারণে বণ্টিত অর্থের বৃহৎ অংশ মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে চলে যাচ্ছে। এজন্য আমরা গলদটা না বুঝে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক কাজ করি, না ভেবে ব্যবস্থাপত্র দেই, কাজের কাজ হয় না– সময় ক্ষেপণ হয়, সম্পদ নষ্ট হয়। ক্ষতকে সারাতে এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করে ক্ষতের উপর অবিরাম মলম মালিশ করি। রাষ্ট্রীয় কোষাগার উজাড় করে দলের কাজে খাদক ও দুর্বৃত্ত প্রতিপালন করি। আসলে কোথাও চতুর্মুখী দুর্নীতি ও লুটপাট হলে, জনগোষ্ঠী যদি মানবিক চরিত্র ধরে রাখতে না পারে উন্নয়নের কোনো মডেলই তখন আর কাজ করে না। মানুষের সুষ্ঠু চিন্তাধারা ও শিক্ষায় গলদ থাকলে তাদের নিয়ে উন্নয়নের কাজে আদৌ এগোনো যায় না। কোনো দোয়া-দাওয়াতেই তখন আর কাজ হয় না। মূলত সংশ্লিষ্ট মানুষের চিন্তাধারা ও চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। একমাত্র সুশিক্ষার অভাব, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগহীনতাকে এ অবস্থার জন্য দায়ী করা যায়। তাই জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানুষ বানানোর প্রক্রিয়া আগে। তাহলে জীবনের প্রতিটা পর্যায়ে সুব্যবস্থা, সুনিয়ন্ত্রণ, সুস্থ চিন্তা, জীবনের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি ফিরে আসে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাড়লে ব্যষ্টিক উন্নয়ন সেই তালে বাড়ে না। সামষ্টিক উন্নয়নে শ্রেণিবিশেষ বেশি উপকৃত হয়। সার্বিক উন্নয়ন টেকসই করতে ব্যষ্টিক উন্নয়ন আলাদাভাবে বিশেষ জনগোষ্ঠীকে সামনে রেখে করতে হয়। নইলে আয়-বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্য ও জীবন-মান বৈষম্য ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। এজন্য ব্যষ্টিক উন্নয়নের বিদ্যমান মডেলের ঢিমে-তেতালা গতিকে ত্বরান্বিত করা আশু প্রয়োজন। তাই নতুন কোনো ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের আশ্রয় নেয়া যায়। এদেশে সে-কাজ হাতে নিতে গেলেই তো রাজনীতির নামে, জনপ্রতিনিধির পরিচয়ে লুটেরা-খাদকগোষ্ঠী সামনে চলে আসে। বরাদ্দকৃত অর্থের অধিকাংশ পিঁপড়ের পেটে চলে যায়। পরিকল্পনা প্রণয়নে এটাও একটা বিবেচ্য বিষয়। একটা শ্রেণি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও ক্ষমতার ভাগ পাবার আশায় ইনিয়ে-বিনিয়ে সব সময় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলে ভেড়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। উদ্দেশ্য ঐ একটাই– চেটেপুটে পেট ভরা। সেজন্য ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেল বানাতে গেলে প্রথমেই খাদক সম্পৃক্ততা যার-পর-নাই কমাতে হবে। দম্পতি এইডস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সন্তান জন্মদান বন্ধ রাখতে বলতে হবে। দেশের রাজনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। আলাদা একটা নীতিবান সুশিক্ষিত সমাজগোষ্ঠীর হাতে অর্থ ও সেবা বণ্টনের দায়িত্ব দিতে হবে। সেই সুশিক্ষিত সমাজগোষ্ঠী তাদের স্বচ্ছ মেধা, শিক্ষা-সামর্থ ও সেবা দিয়ে সমাজ-

পরিচালনার কাজ করবে। সমাজে আবার সুশিক্ষা সুস্থ মানসিকতার আবহ ছড়িয়ে দেবে। সুশিক্ষার ছায়াতলে মানুষকে আনবে। চেষ্টা চলবে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন। জনগোষ্ঠীকে ক্রমশ জনসম্পদ বানাবে। জাতি মুক্তি পাবে।

এখানে অন্য আরেকটা সমস্যা আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে কাজ করে। আমাদের অনেকেই নিজের চিন্তা-চেতনাকে প্রতিফলিত করে ধরেই নিই যে, মানুষ মাত্রই দুর্নীতিবাজ; সুযোগ পেলেই দুর্নীতি করবে। তাই দায়-দায়িত্ব বণ্টনের সময় মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আর বিবেচনায় আনিনে। আসলে বাস্তবতা তা বলে না। প্রতিটা সমাজেই নীতিবান ও দুর্নীতিবাজ লোক উভয়ই থাকে। সহনীয় অনুপাতে আছে কি না– এটা বিবেচনার বিষয়। আমাদের সমাজে নীতিবান লোক এখনো আছে, সংখ্যাটা হয়তো একটু কমে গেছে; তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নেই। তাই তাদের করারও কিছু নেই। যাদের বলদর্পিত দাপট ও ক্ষমতা আছে; যোগ্যতাও নেই, সততাও নেই, মুখসর্বস্ব বুলি আছে– তারাই বর্তমান সমাজ বিবেচনায় যোগ্য। ভুলটা এখানেই। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে, খাজাঞ্জি পাহারার কাজে, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবহারের কাজে আমরা সচরাচর এসব ফ্যাক্টর আমলে নিইনে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, সুশিক্ষিত ও উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী যে মূলত অর্থনৈতিক সম্পদ, তা আমরা রাষ্ট্রীয় বা দেশের কাজে আদৌ বিবেচনায় নিইনে। তাই এই দুরবগ্রহ দুর্গতি নিয়েই আমাদের নিত্য বসবাস।

উন্নয়নের ধারা– এটা কোনো বস্তুগত অবস্থা না। এটা একটা মানসিক অবস্থার ধারণা। সুতরাং সরকারি কর্মব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীর মানসিকতার উন্নতি না হলে তাদের দেওয়া সেবার মানোন্নয়নের আশা করা বৃথা ও সময় ক্ষেপণের অজুহাত। মানুষকে পাহারা দিয়ে বেশিক্ষণ পারা যায় না। দেশ পরিচালকরা সুশিক্ষিত হবে। সুশিক্ষিত পরিবেশ দেবে। মানুষকে সশিক্ষিত ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হতে হবে। এজন্য নিয়মিত সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণগুলো জাগিয়ে তুলতে পারলে তার জাগ্রত বিবেক সতত তাকে পাহারা দেবে। সে স্বেচ্ছায় নিজের ও সমাজের ভালো কাজে কর্মব্রতী হবে।

(প্রকাশ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

উন্নত মানবসম্পদ গড়ে তুলবে যে শিক্ষাব্যবস্থা

যে অনন্য বৈশিষ্ট্য মানুষ জাতিকে অন্য কোনো প্রাণি থেকে পৃথক করেছে এবং শ্রেষ্টত্ব দিয়েছে তা হচ্ছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (হিকমাত/জ্ঞান-বিজ্ঞান)। এই জ্ঞান বা প্রজ্ঞার বিকাশ, সমৃদ্ধি ও উন্মেষ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। দেশে মানুষের মতো মানুষ অর্থাৎ মানবসম্পদ গড়তে জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। এই শিক্ষা সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা– দুই-ই হতে হবে। সামাজিক শিক্ষা সমাজের সাধারণ মানুষের উপাানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যার উপর ভিত্তি করে সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষা মানুষের মানসিকতার উন্নয়ন, আদর্শ সমাজ গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার উন্নতি একটা জাতিকে উন্নতির শিখরে বয়ে নিয়ে যায়। কার্যত আমাদের দেশে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়াতে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে সমাজ আজ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশিষ্ট পরিবেশে রূপ নিয়েছে। আমরা এই দুর্বিনীত অভিঘাত-জর্জরিত সমাজের উত্তরাধিকার হয়েছি।

শিক্ষা বলতে আমি লেখা, পড়া ও অংক জানা লোকদেরকে বুঝিনে। শিক্ষিত লোকের মধ্যে এ তিনটি উপাদান ছাড়াও আরো কয়েকটা উপাদান বা গুণ থাকতে হবে। এর মধ্যে সবার আগে ধর্মীয় মূল্যবোধ একটা। শিক্ষার ভিত্তিমূলে ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকা অবশ্যম্ভাবী। ধর্মীয় মূল্যবোধ অন্তর্নিহিতভাবে প্রতিটা মানুষের (হোক আস্তিক, হোক নাস্তিক) কাজে-কর্মে, চিন্তা-চেতনায় সুস্থ মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে ভালো পথে চলার ও মায়া-মমতা দিয়ে পরিবার নিয়ে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার সুবিধা দিয়ে আসছে। ধর্ম জনসম্পদের বুনিয়াদ সৃষ্টির একটা মূল উপাদান। তাই শিক্ষাকে ধর্মচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। যে শিক্ষায় সততা ও আদর্শ নেই, নৈতিকতা নেই– সে শিক্ষা মূল্যহীন। সেজন্য সেক্যিউলারিজম (নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়– এই মতবাদ) তত্ত্বকে বাদ দিয়ে শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে হবে। গবেষণা বা অনুসন্ধানও শিক্ষার অন্যতম উপাদান ও গুণ। গবেষণাহীন বা অনুসন্ধানবিহীন শিক্ষা হাজা-মজা, নিশ্চল এক জলরাশি। শিক্ষা নিতে গেলে শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটায়। তারপরই শিক্ষা পূর্ণতা পায়। তাই শিক্ষায় গভীরভাবে ভাবতে শেখা আনতে হবে। আরো যে দুটো উপাদান বা গুণ শিক্ষায় থাকতে হবে, তা হলো– জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধ এবং ন্যায়নিষ্ঠা। শিক্ষায় মানুষের অন্তর্নিহিত বিবেকবোধকে জাগিয়ে তুলতে না পারলে সে শিক্ষা নিষ্ফলা

ন্যাড়া ক্ষেতের সমান। ন্যায়নিষ্ঠা হলো ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, স্বচ্ছতা, সত্যের প্রতি আনুগত্য, অহিংসা, দেশপ্রেম, মিথ্যা-শঠতা-চৌর্যবৃত্তিহীনতা প্রভৃতি। এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণের মাত্রা যার মধ্যে যত বিসারিত হবে, সে তত শিক্ষিত। এই শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য অনেক বেশি। আমার মতে, এদেশের মানবসম্পদ গঠনে একজন মানুষের মধ্যে শিক্ষায় তিনটি অপরিহার্য গুণগত বিশেষত্ব থাকতে হবেঃ ১. জীবনমুখী শিক্ষা– শিক্ষা জীবনের ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা তৈরি করবে, সমাজ ও পরিবেশকে বুঝতে ও সেমতো চলতে শেখাবে, বাস্তবধর্মী সাধারণ জ্ঞান দেবে, ভাবনা-চিন্তার গভীরতা দেবে ইত্যাদি। ২. কর্মমুখী শিক্ষা– শিক্ষা মানুষের কোনো না কোনো কাজ বা পেশায় বিশেষত্ব আনবে, কর্মে সৃষ্টিশীলতার জন্ম দেবে, লুকায়িত প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে ইত্যাদি। ৩. মানবিক গুণাবলি-জাগানিয়া শিক্ষা– সততা, জাগ্রত বিবেক, অহিংসা, দেশপ্রেম, সৃষ্ট জীবের প্রতি সহমর্মীতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি। এই তিনটা বিশেষত্ব একটা মানুষের মধ্যে থাকলে তাকে মানবসম্পদ বলবো। এ মানবসম্পদ তার নিজের, সমাজের ও দেশের সম্পদ হিসাবে কাজ করবে। সমাজ, দেশ ও জাতি গড়তে গেলে অনেক কিছুকেই মগজে ঠাঁই দিতে হয়। আদর্শ সমাজ গড়তে গেলে অসংখ্য দিক-নির্দেশক ফ্যাক্টরকে বিবেচনায় আনতে হয়, ভাবতে হয়। পরিকল্পিতভাবে সমাজ গড়তে হয়। সেমতো পরিকল্পিতভাবে জাতিকে সামনে এগিয়ে নিতে হয়। তারপর উন্নত দেশ ও দীপ্তিমান জাতি গড়ে ওঠে। সে জাতির আলোকপ্রভা দিনে দিনে বিশ্বের সকল শ্রেণির সকল মানুষের চেতনার গহন কন্দরে ছড়িয়ে পড়ে।

এসব করতে গেলে একদল সমভাবাপন্ন সুশিক্ষিত দূরদর্শী পরিচালক লাগে। তারপর দেশ ও জাতির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। সুনির্দিষ্ট আদর্শের বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ উদারনৈতিক সামাজিক মূল্যবোধ, পুঁজিবাদ ও সেক্যিউলারিজম থেকে ক্রমশ সরে আসতে হয়। দেশীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, দীনি-নন্‌দীনি নির্বিশেষে সামুদয়িক শিক্ষা ও অহিংস ধর্মপালনের চর্চা করতে হয়। অভাবী-দুঃস্থ-অসহায় মানুষকে রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ সহায়তায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের বণ্টনের সময় একটা বড় অঙ্কের ভাগ দিতে হয়। এটা রাষ্ট্রের দয়া না, এটা তাদের অধিকার। দেশের ধর্মগুরুদের সৃষ্টি-উদাসী বেহেশত যাবার সটান (শর্ট-কাট) তরিকা বদল করে কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে সৃষ্টিসেবার দিকে মন দেবার জন্য আহ্বান জানাতে হয়। একটা টেকসই ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলকে গ্রহণ করতে হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এদেশের বড় সমস্যা। সিস্টেম-লস কথাটা অভিধান থেকে উঠিয়ে দেয়াটাই ভালো। দৃঢ়-শক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

দেশব্যবস্থায় মিথ্যাবাদী, অজ্ঞ, মুর্খ, সোস্যাল টাউট, মোসাহেব, লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধানদেরকে বাদ দিয়ে ন্যায় ও সত্যের অগ্রপথিক, সুস্থ-সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হয়। তখন রাষ্ট্রের নাম হয় কল্যাণ রাষ্ট্র।

এসব কথা একটু বেশি বলতে গেলেই সেই প্রথমে বলা জনগোষ্ঠীর মানসিকার উন্নয়নের প্রসঙ্গ চলে আসে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের পাঁচটি সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বাত্মক ব্যবহার প্রয়োজন– মানুষ, আহরিত ও উৎপাদিত মালামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি, এবং অর্থসম্পদ। এগুলোর মধ্যে মালামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি এবং অর্থসম্পদ নিষ্প্রাণ, অচেতন ও জড় সম্পদ। একমাত্র মানুষই জীবন্ত ও সজীব সম্পদ। অচেতন ও জড় সম্পদ নিজে নিজে কিছু করতে পারে না, সে সক্ষমতাও তাদের নেই। উন্নতি নির্ভর করে এই জীবন্ত সম্পদ দিয়ে কিভাবে অচেতন ও জড় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তার উপর। জীবন্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ও দক্ষ ব্যবহার আবার নির্ভর করে বসবাসরত মানুষের দক্ষতা, মানসম্মত যোগ্যতা, পরিবেশ, জীবন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ও মনোভাব এবং মানবিক চরিত্রের উপর। একটা দেশে অঢেল সম্পদ থাকলেও সুযোগ্য ও যথার্থ ব্যবহারের অভাবে জনগোষ্ঠী দুর্দশাগ্রস্ত, অনুন্নত ও মানব জাতির কলঙ্ক হতে পারে। অচেতন ও জড় সম্পদ সৎ বা দর্নীতিবাজ হতে পারে না। মানুষ তথা জনগোষ্ঠী 'জন-আপদ' বা 'জনসম্পদ' হতে পারে। ব্যতিক্রম বাদে জন-আপদ হয়ে কেউ জন্মাই না; আমরা নিজেরা সিস্টেম করে জন-আপদ গড়ে তুলি। জনগোষ্ঠী জন-আপদ হলে রাষ্ট্রীয় সুশাসন, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুযোগ্য জাতিগঠন দুর্বৃত্ত দুঃশাসন, দুর্বিনীত দুরাচার ও দুশ্ছেদ্য দুর্গ্রহে রূপ নেয়। সমাজ ও দেশের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অমানবিক কার্যকলাপ যারপরনাই বৃদ্ধি পায়। দেশের যাবতীয় সম্পদ প্রকাশ্যে লুটপাট করে কোনো এক গোষ্ঠী পকেটে ভরে। দেশের অসচেতন সাধারণ মানুষ এজন্য অজ্ঞতাবশত অদৃষ্টকে দোষারোপ করে, বুক চাপড়ে শান্ত্বনা খঁজতে থাকে। কিছুই করার থাকে না। এসবই জন-আপদ তৈরির পরিণাম। এটা একটা 'ভিসাস সার্কেল'। আমরা এই 'ভিসাস সার্কেল'-এ (দুষ্ট আবর্তে) পড়ে গেছি। বেরিয়ে আসাটা অতটা সহজ নয়। এই আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া যে যত কথাই কোরাস ধরে বলুক, প্রকৃত মুক্তি নেই। এজন্য সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে, জীবনমান উন্নয়নে এবং দেশের উন্নয়নে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন ও মানসম্মত দক্ষতা ও সুশিক্ষা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুষ্ট আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার সূচনা হিসেবে কোথাও না কোথাও থেকে শুরু তো একবার করতেই হয়। তাই পরিত্রাণের পথ খুঁজতে:

– সমাজের প্রতিটা মানুষের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যষ্টিক (জনে জনে) উন্নয়নের একটা টেকসই ভিত্তি তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।

– সাধারণ মানুষের মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী শিক্ষা, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সফটস্কিল্স ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

– স্বাস্থ্য সেবা, দরিদ্র-দুঃস্থ-অসহায় মানুষকে দান এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের আয়-রোজগার বৃদ্ধিতে সক্ষম সম্পদ গড়তে সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন ।

– ছাত্রছাত্রীদের ব্যবসায়, কারিগরি ও বিজ্ঞানমুখী আধুনিক শিক্ষার সম্মিলনে সমন্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দেশপ্রেম প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি তাদের মনে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন।

– সেই সাথে ছাত্রছাত্রীদের এবং যুবসমাজের বহুমুখী কারিগরি জ্ঞান, জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন ।

শুরুটা জনগোষ্ঠীর সুশিক্ষা, মানসিকতার উন্নয়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা দিয়ে করা দরকার। কোনো কাজ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে করা যায় না। এজন্য সমাজের অভ্যন্তর থেকে জনসম্পদ খুঁজে বের করা দরকার। একটা শিক্ষা-সমাজ (একদল লোক) দরকার, রাজনীতিমুক্ত সামাজিক সংগঠন দরকার। এই শিক্ষা-সমাজ দেশব্যাপী তৈরি করা দরকার। এই শিক্ষা-সমাজ সুশিক্ষার আদর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসেবা তথা মানসম্মত শিক্ষা সুনিশ্চিত করবে ও সমাজে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। শিক্ষার সাথে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণও থাকবে। আমাদের সমাজে গরিব, অসহায়, আর্ত-পীড়িত, খেটে-খাওয়া মানুষের টিকে থাকার জন্য, মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য স্বাস্থ্য-সেবা ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করবে। জীবনমান উন্নয়নমুখী শিক্ষা, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সফটস্কিল্স ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেবে।

সমাজের সুশিক্ষিত সচেতন জনগোষ্ঠী একটা সামাজিক শক্তি। সকল মানুষের সাথে সমাজেই তাদের বসবাস। সমাজে কার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন, ভালো-মন্দ তাদের জানা। সমাজের শিক্ষা ও সেবার কাজের জন্য তাদেরকে খুঁজে বের করে আনতে হবে। তাদের কাজ করার পরিবেশ দিতে হবে। জেলা ও উপজেলা

পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারাই এটা পারে। তাদেরকে শিক্ষা-সেবার সমাজহিতৈষী লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে দলবদ্ধ (গ্রুপ) হতে হবে। এরা সমাজের এক-একটা ওয়ার্ক-গ্রুপ। এই গ্রুপ স্ব-শাসিত ও স্বেচ্ছাসেবী হবে। এই গ্রুপের নাম হবে শিক্ষা-সেবা সমাজ। এরা কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করবে না; অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করবে না। নিজ স্বার্থের জন্য রাজনীতির লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করবে না। তারা 'সুশিক্ষাই জীবন ও সমাজের উন্নতি'– এ-কথার মর্মবাণী জনে জনে মানুষকে বোঝাবে। তারা সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান উন্নীত করবে, সামাজিক শিক্ষা দেবে; সুশিক্ষিত, সচেতন জনগোষ্ঠী তৈরি করবে ও সমাজসেবা দেবে। এতে সমাজে বসবাসরত মানুষের মন-মানসিকতার উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। মন-মানসিকতার উন্নতির ফলে উন্নতি হবে আর্থিক অবস্থারও। সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। জনে জনে সরাসরি নীড-বেইজ্‌ড আর্থিক সহায়তা দেবে, যেখানে অর্থের সিস্টেম-লস হবে না। ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কাজ করবে। মানুষ ক্রমশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। সময়ের ব্যবধানে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী জায়গা করে নেবে। সমাজ ও দেশ থেকে ক্রমশই দুর্নীতি, দুঃশাসন, অব্যবস্থাপনা দূর হবে। প্রথম কয়েক বছরের পর ক্রমবর্ধমান উন্নতির কারণে পরবর্তী সময়ে দ্রুততার সাথে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। এখানে কোনো নেতৃত্বের ক্ষমতা থাকবে না। থাকবে জনসেবার ক্ষমতা। সমাজসেবকরা সমাজের সেবামূলক কাজ করার কারণে সমাজের মানুষের ভক্তি ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পাবে। যে যত বড় জনসেবক সে-ই তত বড় নেতা। ত্যাগের মহিমাই এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। এটাকে সামাজিক রেওয়াজে একবার পরিণত করে দিতে পারলেই সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিণত হবে। মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা আবার ফিরে আসবে।

(প্রকাশ: ৭ অক্টোবর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী করতে হবে

এ দেশে মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থা বেশ প্রসার লাভ করছে। দেশের সর্বত্র প্রায় গ্রামে-গঞ্জে মসজিদভিত্তিক মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। সেখানে দীনি-ইলম (ধর্মীয় শিক্ষা) চালু হয়েছে। কওমি শিক্ষায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে না। এলাকার প্রতিটা বাড়ি থেকে চাল-ধান-ক্ষেত উঠিয়ে কিংবা চাঁদা উঠিয়ে কখনো-বা স্বাবলম্বী পরিবারের আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও মৌলবি-মাওলানাদের খাবারের ব্যবস্থা এবং পারিশ্রমিকের সংস্থান হচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকায়, গ্রামে-গঞ্জে এভাবে অবহেলিত অনানুষ্ঠানিক, অনৈয়মিক ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে কওমি মাদ্রাসা টিকে আছে। ধর্মভীরু মানুষের দান ও ত্যাগে টিকে আছে। উল্লেখ্য যে, এসব প্রতিষ্ঠানের লিল্লাহ-বোর্ডিংয়ে এদেশের গরিব, অসহায়, এতিম শিশুদের বিনা-খরচে থাকা-খাওয়া ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এ-ধরণের ব্যবস্থা অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নেই। নিঃসন্দেহে এটা একটা সমাজ-সেবা ও সমাজকর্ম। এছাড়া সামাজিক সমস্যার সুন্দর একটা সমাধানও বটে। শিক্ষা-নিয়ে-বেরোনো ছাত্রছাত্রীদের সবাই খোদা-ভীরু, সচ্চরিত্রবান এবং অল্পে তুষ্ট। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অল্প বয়সে বখে যায় না। কোনো সমাজ-বিগর্হিত কাজে সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের জন্য অ-ক্ষতিকর জনগোষ্ঠী তৈরির কাজে নিয়োজিত– এটাও একটা সমাজকর্ম।

অনেক ভালো দিকের মধ্যেও বেশ কিছু বিষয় আছে পরিবর্তিত সমাজ ও বিশ্ব-ব্যবস্থায় তাদের উন্নতির জন্য ভাবনা-চিন্তা আবশ্যক বলে মনে হয়। এই ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শিক্ষার মধ্যে মানবজাতির জন্য যত কল্যাণমূলক কাজ দিনে দিনে অন্য ধর্মের লোকের জন্য ছেড়ে দিয়ে কর্মঠ হাত গুটিয়ে নিয়েছে। স্রষ্টার সৃষ্টি পরিচালনায় ভূমিকা রাখছে না বললেই চলে; ‘হক্কুল ইবাদ’-এর দায়িত্বও পালিত হচ্ছে না। তারা নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে ও তসবিহ-তেলাওয়াত করে আর্থিক অনটনের মধ্যে দুনিয়াদারি বজায় রেখেছে। এরা অজ্ঞতাবশত স্রষ্টার সৃষ্টি-দর্শনকেই পাল্টে দিয়েছে। অন্য ধর্মের লোকেরা সৃষ্ট বিশ্বের উচ্চতর পেশাকে বেছে নিয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা দেখাচ্ছে, সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন করছে। সকল কল্যাণমুখী কাজ করে মুসলমানদের উপর প্রভূত্ব করছে। মুসলমানেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনীতি থেকে পিছপা হয়ে কবরমুখো পা এগিয়ে দিয়ে বসে আছে। জীবনযাপনে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অন্য ধর্মের লোকের উপর নির্ভরশীল হয়েছে।

তাই বিশ্বব্যাপী এরা প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত ও নিগৃহীত হচ্ছে। এ-সবই চিন্তা-চেতনার পশ্চাৎপদতা।

এই নিবেদিতপ্রাণ ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ মনের অজান্তেই কিংবা অজ্ঞতাবশত তাদের চিন্তা-চেতনা-শিক্ষা ও জীবন-ধারণা দিয়ে মুসলমান জাতিকে পিছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে একটা অনগ্রসর, অকর্মণ্য ও সৃষ্টির অযোগ্য জাতিতে পরিণত করে ফেলছে; যদিও ধর্মগ্রন্থ এদেরকে 'শ্রেষ্ঠ জাতি' হিসেবে মানবজাতির কল্যাণ করার জন্য যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছে। প্রযুক্তি-বিজ্ঞান-ব্যবসা শিক্ষা থেকে সরে এসে নিজেদের অজান্তেই নিজেরা এদেশে ধর্মহারা সেক্যিউলারপন্থীদের জন্য অভয়ারণ্য তৈরির পথ করে দিয়েছে। এটা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও কর্ম দিয়ে করেছে। মৌলবি-মাওলানারা নিজে ও তাদের তৈরি ছাত্রছাত্রী সমাজে বেকার অথবা ছদ্ম-বেকার; পরিবার ও সমাজের বোঝা। নিত্য যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। দুহাত পকেটে ভরে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে পড়ে থাকে। জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা নেই, উচ্চশিক্ষা নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই, প্রযুক্তিগত শিক্ষা নেই, উন্নত শিল্প-ব্যবসা শিক্ষাও নেই– উদ্দেশ্যহীন দুনিয়াদারী করে চলেছে। চিন্তা-চেতনা গোঁড়ামি ও আবেগপ্রবণতায় ভরা। তাদের অনেকে কোনো গঠনমূলক বুঝ নিতে চায় না। তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস এমনই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, সে অবস্থা থেকে তাদেরকে সরিয়ে আনতে গেলে কখনো কখনো তাদের কর্মকাণ্ড উগ্রতায় রূপ নেয়।

শত শত বছর আগে ঘোড়ার পিঠে চড়ে তলোয়ার নিয়ে মানুষ যুদ্ধের শক্তিমতা দেখাতো। বর্তমানে মানুষ সুপারসনিক রকেটে চড়ে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাচ্ছে। নিজ দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের শত্রুঘাটিতে রকেট-মারণাস্ত্র ছুড়ে অন্যকে ঘায়েল করছে। চোখের পলকে তথ্য বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠাচ্ছে। কোনো তারের সংযোগ ছাড়াই ভূপৃষ্ঠের এক প্রান্তের ঘটনা অন্য প্রান্তে বসে সরাসরি দেখছে। প্রায় সব কাজই মানব জাতি ও সৃষ্টির কল্যাণে হচ্ছে। বিজ্ঞান ও কল্যাণের এ ফল মৌলবি-মাওলানারা নিজে ভোগ করছে; অথচ বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক কোনো কাজে তারা নিজে ও তাদের ছাত্রছাত্রীদের নিযুক্ত করতে রাজি না। তারা বোঝে না, সময় এবং ঘটনাকে পিছনে ঠেলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। অতীতের ঘটনা ও কর্ম থেকে আমরা শিক্ষা ও আদর্শ নিতে পারি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কাজে-কর্মে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করাটাই বুদ্ধিমানের ও জ্ঞানের কাজ। এজন্য তাদের বিজ্ঞান-

ব্যবসাভিত্তিক শিক্ষা নেওয়া দরকার, মন-মানসিকতার গঠনমূলক পরিবর্তন দরকার– তাদের নিজেদের উন্নতির জন্যই তা দরকার, হক্কুল ইবাদের জন্য দরকার, অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই দরকার। নইলে একটা জাতির ধ্বংস অনিবার্য। অপরিণামদর্শী কোনো ভাবাবেগ দিয়ে কোনো প্রাগ্রসর জাতি গড়া যায় না।

ইহলৌকিক জীবনযাপন, সৃষ্টিকল্যাণ, মানবসমাজ ও সৃষ্টিসেবা ছাড়া পরলৌকিক কল্যাণ যে অসম্ভব– তা তাদের বুঝতে হবে। কত হাজারোভাবে যে মানবকল্যাণ ও মানবসেবা করা যায়, তা তাদের ভাবতে হবে। দুনিয়ার মানবকল্যাণ কীসে ও কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে তাদের গবেষণা করতে হবে। তারা জীবনের সকল কাজ-কর্মে, পেশায়, চিন্তা-চেতনায় আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলার নামই যে ইবাদত– এ ধারণা থেকে মুখ ফিরিয়ে ভিন্নমুখী অকর্মণ্য ব্যাখ্যায় গেছে। তাদের মধ্যে কুরআন ও হাদিসের আনুষ্ঠানিকতা আছে– বাস্তব জীবনে প্রায়োগিকতা নেই। আত্মোপলব্ধি, আত্মসংশোধন নেই। সেজন্য 'পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা'কে আংশিক জীবনে পর্যবসিত করেছে। দীনি-শিক্ষার আওতাকে খণ্ডিত করে, জীবনের সংকীর্ণ গলিতে আবদ্ধ করে শুধু পরকালের বিশ্বাস ও বেহেশত নসিবের শিক্ষা বলে মনগড়া ব্যাখ্যা করেছে। বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট (ধমীর্য়-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত) ও তা থেকে উত্তরণ এবং জয়লাভের উপায় নিয়ে পুরোপুরি বে-ওয়াকিফহাল হয়েছে। তারা থিও-পলিটিক্যাল যুদ্ধের মাঠ আগেই ছেড়ে দিয়ে হেরে বসে আছে; তাই জীবনের প্রতিটা পদে পদে জাতসুদ্ধ নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধমে মানবকল্যাণ ও চেতনার উৎকর্ষই যে এ যুদ্ধে জেতার একমাত্র উপায়– তা মাথায় আসে না, বুঝতেও চায় না। জীবনের বাস্তবতা বুঝতে গেলে, উপলব্ধি করতে গেলেও উপযুক্ত শিক্ষা দরকার। না বোঝার কারণে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা (দুনিয়াদারি) থেকে মুসলমানদেরকে নিজেরাই কোনঠাসা করে ফেলেছে। এসবই মুসলমানদের দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার অভাব; মুখে ধর্মকে 'পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা' বলে মেনে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় অজ্ঞতা; অনগ্রসরতা, কর্মবিমুখতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার পথে চেতনাহীন বাধা; যুগোপযোগী জীবনধারার অন্তরায়। পুরো ইসলামি বিশ্বে এ-ধারা বিদ্যমান; এদেশে এটা আরো বেশি।

এদেশের মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থা জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা থেকে অনেক পিছনে পড়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা (বিজ্ঞানময় কুরআন) ছাড়া জীবন চলে না। অথচ এরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বিধর্মীদের শিক্ষা বলে ফতোয়া দিয়ে, সমস্ত অফিস-আদালত-শিল্প-কলকারখানা-ব্যবসা থেকে হাত গুটিয়ে

নিজেরা ঘরবদ্ধ হয়েছে। তারা অন্যের গলগ্রহ হয়েছে। এতে বস্তুবাদী ও ইহবাদী (সেক্যিউলারপন্থি) শিক্ষার ধারক ও বাহকদের মুসলমান জাতির শোষণের পথকে প্রশস্ত করেছে এবং জাতি হিসাবে মুসলমানদের অস্তিত্বকে খর্ব করেছে। বিশ্বব্যাপী বহুজাতিক ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করেছে।

এদেশে ইংরেজদের পক্ষপাতদুষ্ট শাসনের আগেও মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন ছিল। বিশ্বের অনেক মুসলিম সভ্যতায়ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জীবনোন্নয়নের ও সৃষ্টিসেবার পাথেয় হিসাবে নেয়া হয়েছিল। এ উপমহাদেশে মাদ্রাসা নামের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর সাধারণ শিক্ষা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও বিজ্ঞান-ব্যবসায় শিক্ষা বাদ দেওয়াতে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একটা অনুন্নত, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীতে ক্রমশই পর্যবসিত করে ফেলছে। সুশিক্ষিত ও মর্যাদাবান জাতি গঠনে ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়গুলো আমাদের ইসলামি চিন্তাবিদ, মৌলবি-মাওলানাদের বিবেচনায় আনতে হবে।

এ বিষয়ে বিচারপতি হযরত শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উসমানীর সন্তান) মুসলিম উম্মহর চিন্তাগত ও আদর্শগত পতন ও বিভাজন থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বলেন, "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতবর্ষে (মুসলমানদের জন্য) বিশেষ তিনটি শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল। ক. দারুল উলূম দেওবন্দভিত্তিক শিক্ষাধারা; খ. আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিকেন্দ্রিক পড়াশোনা; গ. দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার সিলেবাসকেন্দ্রিক শিক্ষাধারা। যথাসম্ভব ১৯৫০ সনে আব্বাজান রাহ. কোনো সাধারণ এক সমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের আলীগড়ের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন নেই, নদওয়ারও প্রয়োজন নেই; এমনকি প্রয়োজন নেই দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষাব্যবস্থারও; বরং আমাদের প্রয়োজন একটি তৃতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, যা আসলাফ ও পূর্বসূরীদের ইতিহাসের ধারায় আমাদেরকে সম্পৃক্ত করবে।' এমন কথা শুনে অনেকেই হয়তো ভ্রু কুঁচকে ফেলবেন। দারুল উরূম দেওবন্দের নুন খাওয়া এক সুবোধ সন্তান, দারুল উলূম দেওবন্দের আস্থাভাজন প্রধান মুফতি কীভাবে এমন কথা বলতে পারেন যে, পাকিস্তানে আমাদের জন্য দেওবন্দের শিক্ষাব্যবস্থারও প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থার! আব্বাজান রহ.-এর এ বক্তব্যটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দূরদর্শিতাপূর্ণ।.. ভারতবর্ষে যে তিনটি ধারা প্রচলিত ছিল তা স্বাভাবিক কোনো ধারা ছিল না; বরং তা ছিল ব্রিটিশ-প্রবর্তিত ধারার প্রতিফল এবং তাদের চক্রান্তের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিকল্প মাধ্যম অবলম্বন মাত্র। নতুবা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ

সম্রাজ্যবাদীদের প্রবেশের পূর্বে মাদরাসা এবং স্কুল নামের দুটি বিজাতীয় ধারার অস্তিত্ব আপনি খুঁজে পাবেন না। এতদঞ্চলে ইসলামের সূচনা থেকে বৃটিশ পিরিয়ডের আগ পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলোতে একসাথে দ্বীনী এবং জাগতিক দু'ধারার শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।" (বর্তমান সময়ে প্রয়োজন নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থা: মুফতি তাকী উসমানি। OurISLAM24.com; মে ২৯, ২০২১)।

মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত মুসলিম দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঘেটে দেখলে দেখা যাবে– প্রতিটা দেশেরই একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার ভিত্তিমূলে আছে অন্যান্য শিক্ষার সাথে কুরআন ও হাদিস শিক্ষা। এরপর শিক্ষার্থী তার জীবনের প্রয়োজনে অথবা মেধা অনুযায়ী চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যবসায়-বিজ্ঞানসহ শতেক যে কোনো বিষয় নির্বাচন করে উচ্চ-শিক্ষা নিচ্ছে। অথবা টেকনিক্যাল শিক্ষা শিখছে। যদিও মধ্যপ্রাচ্যের আমখাস জনগোষ্ঠী শিক্ষা–অনিহ। কিন্তু আমাদের দেশের মাদ্রাসাপড়ুয়াদের এ দুর্দশা কেন? তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ও ব্যবসামুখী উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষার সুযোগ কোথায়? শিক্ষার্থীরা অকালেই জীবন ও কর্ম থেকে ঝরে যাচ্ছে। অথচ অসংখ্য কওমি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবিশ্বাস্য প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। পরিবেশের কারণে প্রতিভার বিকাশ হয়নি। কওমি মাদ্রাসার পরিচালকরা বা সেখানে কর্মরত শিক্ষকরা একটু মনোযোগ দিয়ে ভাবলেই বুঝবেন, তাদের ভুলটা কোথায় হচ্ছে। তারা দুনিয়াদারি থেকে (হক্কুল ইবাদ থেকে) অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগতের জীবন, জীবিকা ও কর্ম থেকে, এমন কি এদেশের অফিস-আদালতের প্রতিটা পর্যায় থেকে শিক্ষার্থী ও নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়ে একঘরে হয়ে বসে আছেন। সে সুযোগে অসংখ্য নীতিহীন, অসৎ, দুর্নীতিবাজ, ইহবাদী, ভোগবাদী লোকজন অফিস-আদালতের প্রতিটা পদ, ব্যবসা ও সমাজ দখল করে নিয়েছে। তাই জনসাধারণের ভোগান্তি বেড়েছে। সরকারি সম্পদ নয়ছয় হচ্ছে।

আসলে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুসলমানেরা একটা আত্মবিস্মৃত ও আত্মবিনাশী জাতি হয়ে পড়ে পড়ে ধুকছে। এদের চৈতন্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত, বিজ্ঞান, ব্যবসা ও প্রযুক্তিগত মানসম্মত শিক্ষায় জ্ঞানার্জন না করা পর্যন্ত, শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক বৈশিষ্ট্য অন্তরে না আসা পর্যন্ত সারা বিশ্বে এমন-কি বাংলাদেশেও মুসলমানরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। এদেশের মানুষকে যদি পরতন্ত্র ও কতিপয়তন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন রাখতে হয়, দেশের স্বাধীনতাকে যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়– তাহলে সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরাচারবৃত্তি ছেড়ে এদেশের মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে জাতীয় চেতনায় অখণ্ডতা,

সংহতি ও উৎকর্ষ বাড়ানো আশু প্রয়োজন। এ উপলব্ধি এদেশের প্রতিটা সচেতন নাগরিকের থাকতে হবে। এ উপলব্ধি থেকে একটু পিছপা হলেই এ জাতির ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাবে, কালের পরিক্রমায় টিকতে পারবে না। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা না থাকলে যে, পরিণামে এ জনগোষ্ঠী অন্য কোনো সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠীর হুকুমবরদারে পরিণত হবে– এ বোধশক্তি মগজে জোরালোভাবে ঠাঁই দিতে হবে এবং নিজেদের মুক্তি কীসে সে-পথে হাঁটতে হবে।

এদেশে একটা শিক্ষাসমাজ তৈরি হওয়া দরকার, যে সমাজ ধর্মীয় শিক্ষার সাথে ব্যবসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড ও ইউনিফায়েড শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবে। ইহকালের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থের সদ্‌ব্যবহার, সুশিক্ষা, কর্ম, পেশাগত দায়িত্ব পালনও ধর্ম ও ইবাদতের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা বোঝাবে। প্রতিটা মানুষেরই ধর্ম ছাড়াও সমাজে আলাদা একটা মর্যাদাশীল পেশা থাকতে হবে, তা বোঝাবে। শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে সুশিক্ষিত, সুপ্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করবে। তাহলে এই অমানিশার ঘোর আধার কেটে গিয়ে মৃতপ্রায় এই সমাজ-বৃক্ষ সূর্য-সারথি অরুণিম আলোর বর্ণচ্ছটায় আবার কচি-কিশলয়ে ভরে যাবে।

(প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

জীবনবিধান ও শিক্ষা– সবই মানুষের জন্য

এ লেখাতে কলম ধরতে গিয়েই হঠাৎ মনের কোণে উঁকী দিয়ে গেল একটা কথা। আসলে একটা কথা নয়– মনের সংশয়, দ্বিধা কিংবা ভয়– 'লেখাটা ধর্মীয় কোনো কলামের জন্য নির্বাচন করবে না-তো'! প্রায় প্রতিটা পত্রিকাতেই আমরা 'ধর্ম ও জীবন', 'ধর্ম', 'ইসলামী জীবন', 'ইসলাম ও জীবন' প্রভৃতি নামে ধর্মীয় বিষয়গুলোকে জীবনের সাধারণ বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে চমৎকারভাবে কলাম সাজিয়েছি। যারা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ভাবেন, ধর্মীয় জীবনযাপন করেন; তারা সে কলাম বেশি বেশি পড়বেন ও মেনে চলবেন; এটাই স্বাভাবিক। মনের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছে, 'সাধারণ কর্মজীবন ও ধর্মীয় জীবন আলাদা।' এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ধর্ম বলতে জীবন-বিচ্ছিন্ন আলাদা কিছু ভাবতে শিখেছি। জীবনকর্ম ও দৈনন্দিন চিন্তা-চেতনা থেকে জীবনবিধানকে (ধর্মকে) বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি– কখনো জেনেশুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে; কখনো মনের অজান্তে, না বুঝে। এভাবেই আমরা দৈনন্দিন জীবন-সাগর পাড়ি দিচ্ছি। হাসছি, খেলছি, কাঁদছি, সামনে এগোচ্ছি। কেউ কেউ আলাদাভাবে ধর্মবিধান পড়ছি; পরকালে কল্যাণের আশায় ধর্মীয় পোষাক পরে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করছি।

আমার এক বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার। কুয়েতে যেতে চায় চাকরি করতে। কুয়েতি এক ভদ্রলোক ইন্টারভিউ বোর্ডে বন্ধুর নাম জিজ্ঞেস করলেন। বন্ধু উত্তর দিলেন, 'আব্দুল বারী'। ভদ্রলোক এবার ভ্রু কুচকে আবার প্রশ্ন করলেন, ''এটা আবার কীভাবে সম্ভব? 'আব্দ-উল-বারী' অর্থাৎ 'সৃষ্টিকর্তার গোলাম'। 'আব্দ' (অর্থ 'দাস', 'বান্দা', 'গোলাম') দিব্যি আমার সামনে বসে, আর 'বারী' (মানে 'সৃষ্টিকর্তা') আছেন সাত আসমানের উপরে। এ সমীকরণ তো মেলে না! গোলাম থাকবেন সৃষ্টিকর্তার সাথে সাথে। এত দূরে গোলাম বসে থাকলে সৃষ্টিকর্তার সেবা হবে কীভাবে? এও কী সম্ভব?" সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির বিধান রেখেছে আকীর্ণ করে জীবনের পথে পথে, চলায়-বলায়, জীবন-স্পন্দনে, কর্মে, চিন্তায়, জীবনযাপনে, অন্তরিক্ষে। আমরা কতিপয় ধর্মতান্ত্রিক তা পথ ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চাই অন্য কোনো পথে, পরজনমে, নিস্তব্ধ কবরের সুনসান নীরবতায়। আবার কেউবা ভোগবাদী দর্শনের মোড়কে অনন্ত জীবনকে বাঁধতে চায় ভোগের অলীক পেলবতায়। জীবনবিধান (ব্যবস্থা, বিধি) ফেলেছি জীবন থেকে হারিয়ে। তাই বলছি, 'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও-দাও ফুর্তি কর, আগামীকাল বাঁচবে কি-না বলতে পার? হেই, দুনিয়াটা মস্ত বড় ..।' এভাবে সৃষ্টিসেরা মানুষের সাথে চতুষ্পদের কোনো পার্থক্য রাখছিনে।

চিন্তার বিষয় তো বটেই। এ মহাদেশের ধর্মগুরুরা ধর্মের প্রতি বেশি আনুগত্য ও ভক্তি দেখাতে গিয়ে কোরআনে ব্যবহৃত 'দীন' শব্দের অর্থ করেছেন 'ধর্ম'। শিক্ষাকে বিভক্ত করেছেন 'দীনি শিক্ষা' ও 'নন-দীনি শিক্ষা' বলে। ফলে জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা বিচ্যুৎ হয়ে গেছে। আসলে নন-দীনি শিক্ষা বলতে কি কিছু আছে? কোরআনে ব্যবহৃত 'দীন' শব্দটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আরবি দীন শব্দের অর্থ বাংলায় ধর্ম বলা হয়। আসলে দীন শব্দের সঠিক সমার্থক শব্দ বাংলায় নেই। একইভাবে ইংরেজি রিলিজিয়ন শব্দটিও দীন শব্দের ব্যাপকতা ধারণ করতে পারে না। ধর্ম ও রিলিজিয়নের আরবি হলো মাজহাব, দীন নয়। আমাদের দীনের একটি অংশ হলো ইবাদত এবং নৈতিকতা। কিন্তু দীন বলতে আরও বিস্তৃত বিষয়কে বোঝায়। মানব জীবনের যত দিক ও বিভাগ আছে সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।' মানুষের জীবনযাপনে ও চিন্তা-চেতনার জন্য যত রকমের শিক্ষা- সবকিছুই দীনি শিক্ষার অন্তর্গত। ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীন (ধর্ম)–এর বিভাজন মুছে দিয়েছে। আমার এ আলোচনায় আমি দীনকে 'জীবনবিধান' (জীবনের জন্য যে বিধান) অর্থে ব্যবহার করছি। কোরআনের অনেক শব্দ না-বুঝে নিজের মনমতো করে আমরা শুধু ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করি; মনের মধ্যে আলাদা দ্যোতনা ও অনুভূতির সৃষ্টি করি। সাধারণ জীবন থেকে জীবনবিধানকে যোজন দূরে ঠেলে দিয়ে জীবনযাপন করি। এতে আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা, কর্ম, চিন্তা-ভাবনা ব্যাহত হয়। তাই দিনে দিনে, কখনো ভোগবাদের সাহচর্যে, সাধারণ আটপৌরে জীবন থেকে জীবনবিধান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মানুষ এখন মানবিক বৈশিষ্ট্যবিহীন এক অভিশপ্ত ভোগবাদের নিছক ভাবলেশহীন যন্ত্র বনে গেছে। বোঝা যায় না, 'আমি কি মরে গেছি না-কি, মরে বেঁচে আছি।' এতেই বর্তমান সমাজ ও জীবনব্যবস্থায় যত বিপত্তি, অব্যবস্থা, দুর্গতি।

'কোরআন মানব জাতির জন্য পথনির্দেশিকা'। শুধু কোরআন ও হাদিস শিক্ষাকে দীনি শিক্ষা (ধর্মীয় শিক্ষা) বলছি; আর দুনিয়ার বাকি সকল বিষয়ের শিক্ষাকে নন-দীনি শিক্ষা বলছি। কোনো কোনো শিক্ষাব্যবস্থাকে দীনি শিক্ষার নাম দিয়ে শুধু নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের নিয়ম-নীতি (পরকালের জন্য আনুষ্ঠানিকতা) ও এ সম্পর্কীত মাসআলা-মাসায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। এ ধরনের বিভাজন নিতান্তই অমূলক ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কোরআন ছাড়া ইসলাম ধর্ম অচল। আবার শিক্ষা ছাড়া সৃষ্টিকে বোঝা, নির্দেশনা মোতাবেক জীবনযাপন করা, জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব। কোরআনকে ঘিরেই জীবনবিধানের সকল ব্যাখ্যা।

কোরআন বলে যে, 'এটি (কুরআন) মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য পথনির্দেশিকা ও উপদেশ।' আমরা জানি, পথনির্দেশিকায় উল্লিখিত সকল বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে পথনির্দেশিকা বোঝা যায় না; সেমতো চলাও যায় না। সেজন্য কোরআনে উল্লিখিত একটা তুচ্ছ মশা থেকে অকল্পনীয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যত বিষয়কে ইহকাল ও পরকালের জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা নেওয়াটা ধর্মশিক্ষার আওতাধীন। এর স্বপক্ষে কোরআন ও হাদিস থেকে অসংখ্য আয়াত ও বর্ণনা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বলা হয়েছে, "অসীম করুণাময় (আল্লাহ)। তিনিই কোরআন শিখান। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। (আর) তিনি তাকে শিখান 'বয়ান'।"। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন কোরআন ও 'বয়ান' (জ্ঞানের আওতায় আসা বিষয় উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করার দক্ষতা) শেখানোর জন্য। এখানে মানুষ সৃষ্টির আরেকটা উদ্দেশ্যকে (কোরআন শিক্ষা দেওয়া) বলা হয়েছে। 'কোরআন শেখানো' বলতে কোরআনে বর্ণিত শব্দগুলির শুধু উচ্চারণ করে পড়াকে বোঝানো হয়নি; কোরআনের আওতা অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিজগৎ, সকল কর্ম এবং প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত ও অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স) বিষয়ের জ্ঞানকে আহরণ করা, উপস্থাপন করা ও ব্যাখ্যা করাকে বোঝোনো হয়েছে। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে সামুদয়িক শিক্ষা চলে আসে। এ থেকে আমরা ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের আওতা সম্বন্ধে পুরো ধারণা পেতে পারি এবং বুঝতে পারি, শিক্ষা ও জ্ঞানের আওতাকে সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ করার কোনো যুক্তি নেই। আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ও জীবিকা অর্জনে কোরআন-হাদিসসহ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং অর্জিত জ্ঞান ভালো পথে কাজে লাগাতে হবে।

প্রতিটা দেশের আইন-কানুন থাকে; সেসব মেনে চলতে হয়। সেখানে জীবন ও চিন্তা-ভাবনা পরিচালনার কোনো বিধি-বিধান থাকে না। স্রষ্টার রাজত্বের বিধি-বিধান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত ব্যাপ্ত। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভালোভাবে চলুক, সৃষ্টির উদ্দেশ্যের স্বার্থকতা বিশ্ব-বিধাতা চান। সেজন্য তিনি বোধশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টির সেরা জীবের জন্য আইনকানুন (জীবনবিধান), চিন্তা-চেতনা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সৃষ্টির সেরা জীবের কাজ হবে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, নির্ধারিত আইনকানুন ও চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী চলা। নির্দেশিত পথ মোতাবেক কর্ম করা এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। সৃষ্টি টিকে থাকার জন্যও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সৃষ্টির

ভারসাম্য আছে। আছে স্বয়ংক্রিয় সৃষ্টি ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। একের প্রয়োজনে অন্যের সৃষ্টি। বলা যায়: জীব দিলো প্রাণ নিজ প্রয়োজনে, উদ্ভিদ দিলো সুধা প্রতিদানে; মিটলো জীবের ক্ষুধা অনায়াসে, সার্থক হলো সৃষ্টিকর্ম গূঢ়-তত্ত্ব রসে।

ধর্ম-দর্শন তা-ই বলে। আমরা কতিপয় না-বুঝ লোকের অপরিণামদর্শী কথায় ধর্মের আওতার মূল উপজীব্য ও উদ্দেশ্যকে গুটিয়ে শুধু পরকালের প্রতিদান প্রাপ্তির মধ্যে ধর্মকে (জীবনবিধান) সীমাবদ্ধ করি কী করে? ইহকালের উদ্দেশ্যভিত্তিক কর্ম-চিন্তা-চেতনা না থাকলে জীবনবিধান থাকে কী করে? পরকালই-বা থাকে কী করে? সৃষ্টি ও কর্ম আছে বলেই-না জীবনবিধান আছে। সৃষ্ট প্রকৃতি, জীবনাচার, ক্রিয়াকলাপ ও সৃষ্ট জগৎ নিয়ে শিক্ষা আছে। সৃষ্টি-কর্মকে জীবনবিধান থেকে পৃথক করা যায় না। যেমনি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা থেকে ধর্ম শিক্ষাকে আলাদা করা যায় না।

ইহবাদীরা ইহকালের কাজকর্মে ধর্মের ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে পুরো জীবনবিধানকে বিতাড়িত করে পরকালে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অধিকাংশ ধার্মীকেরাও ইহবাদীদের সাথে বাকবিতণ্ডায় না জড়িয়ে স্বেচ্ছায় অজ্ঞতাবশত জীবন ও জীবিকাকে উপেক্ষা করে জীবনবিধানকে ইহকালের আনুষ্ঠানিকতা ও পরকালে বেহেশত নসিবের সরু গলিতে আবদ্ধ করে ফেলেছেন। তাই ইহকালের পুরো সৃষ্টিজগৎ ও কর্মজগৎ ইহবাদীদের জন্য ছেড়ে পরকালের চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন এবং নিজেকে জিন্দা লাশের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। অথচ ইহকালের কর্ম ও চিন্তা-চেতনাই ধর্মের মূল ভিত্তি। ইহকাল আছে বলেই যে পরকাল আছে, সেটা বেমালুম ভুলে গেছেন। ধর্মগুরুদের ইহজগৎকে না বুঝে, বিনা তর্কে ইহজাগতিক কর্মজগৎ ছেড়ে দেওয়াটা আদৌ উচিৎ হয়নি। কোরআনের উপরে-বলা আয়াত ছাড়াও সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, 'তোমরাই (মুসলিমগণ) শ্রেষ্ঠ উম্মত (সম্প্রদায়/জাতি), মানবজাতির কল্যাণ করার জন্য যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে; তোমরা ন্যায় কাজ (সত্য বলা, পরোপকার করা, ন্যায় বিচার করা, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যেমন– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি)-এর আদেশ করবে আর অন্যায় কাজ (মিথ্যা বলা, মানুষকে কষ্ট দেয়া, চুরি করা, ঘুষ খাওয়া, কারো ক্ষতি করা ইত্যাদি) নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে; আর আহলে কিতাবিগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো; তাদের মধ্যে কিছু আছে মু'মিন তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক।' প্রশ্ন করা যায়, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ এ উম্মতের বিশ্বব্যাপী আজ এহেন

নিঃশেষিতপ্রায় শোচনীয় দুর্দশা কেন? শ্রেষ্ঠ উম্মত নিজেদের কল্যাণই তো বোঝে না, তা মানবজাতির কল্যাণ করবে কী করে? আবার সুচিন্তা ও নির্দেশনা মোতাবেক কাজ ছাড়া মানবজাতির কল্যাণ আসে কী করে? এখানে কল্যাণ অর্থ কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কাজের ও চিন্তার সমষ্টি। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' এখানে এক শ্রেণির ধর্মগুরু এই 'দাসত্ব, ইবাদত (লিইয়াবুদুন)' শব্দের ধর্মগ্রন্থের আলোকে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ব্যাখ্যা না দিয়ে সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা দেওয়াতে এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলমান জাতি আজ অধঃপতন ও অন্ধকারের পথে পরিচালিত হচ্ছে। এদের একটা বিরাট অংশ দুনিয়া ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তার মূল কাজ, পেশা, কাজের বাস্তব প্রায়োগিকতা ও দায়িত্বকে এড়িয়ে দুনিয়ার চিন্তা ও কর্মকে উপেক্ষিত ও অপ্রয়োজনীয় কর্ম বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছে। ইহজগতের সামগ্রীক শিক্ষাকে ধর্মীয় শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত না করে শিক্ষাকে খণ্ডিত করেছে।

জীবন পরিচালনার জন্য যদি শিক্ষা হয়, তবে সে শিক্ষায় জীবনবিধান সন্নিবেশ করতে হবে। জীবনবিধান আমাদেরকে কী শেখায়? শেখায়– কীভাবে শিক্ষাটা নেবো; কীভাবে জীবন পরিচালনা করবো; কীভাবে জীবনযাপন করবো; কীভাবে সন্তান প্রতিপালন করবো; প্রতিবেশীর সাথে কেমন ব্যবহার করবো; কীভাবে আয়-উপার্জন করবো; মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে; সমাজের অন্যদের প্রতি আমাদের দায়িত্বই-বা কেমন হবে; শকুনের মতো উপরে বসে মড়ির দিকে নীচে তাকাবো, না-কি উদারতার চর্চা করে মনুষ্যত্বের মর্যাদাকে উর্ধ্বমুখী করবো– আমরা মানুষ হিসাবে কোনটাকে বেছে নেবো! ইত্যাদি। সবকিছুরই তো সুবিন্যস্ত বিধান আছে। আমাদের দেশগুরু ও ধর্মগুরুরা এসব নিয়ে ভালোমতো ভাবলে ও কর্ম করলে আমাদের জীনযাপন ও চিন্তাধারার উৎকর্ষ ও উৎকৃষ্টতা বাড়ে।

(প্রকাশ: ১৩ নভেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে করণীয়

বিগত এক বছর আগে 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা' শিরোনামে একটা গোলটেবিল আলোচনা করেছিলাম। জাতীয় পর্যায়ের অনেক গুণীজন-শিক্ষাবিদ সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ দেশের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছিল। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপনায় আমি মাদ্রাসা শিক্ষাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা এবং কী করণীয় তা অনেকটাই তুলে ধরেছিলাম। অনেক আলোচকদের মধ্যে শুধু দু-জন দেশবরেণ্য আলোচক অন্য আলোচনার সাথে মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সংক্ষিপ্ত কথা বলেছিলেন। একজন বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ শাসনের আগেও ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন ছিল। ইংরেজরা সেটা বিচ্যুৎ করেছে। ইংরেজরা কেরানি ও ধর্মযাজক তৈরি করলো। পৃথিবীর প্রতিটা দেশেই ধর্মশিক্ষা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে রি-অর্গানাইজ করা দরকার। মাদ্রাসার বিশাল একটা জনগোষ্ঠীকে অনুৎপাদনশীল রেখে জাতি গঠনে সম্পৃক্ত করতে না পারা উচিৎ নয়।' অন্যজন বলেছিলেন, 'সমাজে দীনি শিক্ষা এবং নন-দীনি শিক্ষা বা বস্তুবাদী জগতের শিক্ষা বলে বিভাজন করে ধর্মটাকে সামগ্রীক শিক্ষা থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে। এই বিভাজন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে। মাদ্রাসাকে দীনি শিক্ষা বলে অভিহিত করছি। এভাবে মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ফেলেছি। আসলে ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী বিজ্ঞান শিক্ষাকেও দীনি শিক্ষা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আমরা সেটাকে গণ্য করছিনে। আমরা বিজ্ঞান শিক্ষা না থাকার কারণে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছি।' অন্য আলোচকরা মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে কোনো আলোচনা করলেন না। আমার কপালে চিন্তার ভাজ পড়লো। সন্ধ্যার পর আমার একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে, যিনি একটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় পদে আসীন, জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, আপনারা কেউ মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে কোনো কথা বললেন না কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'মাদ্রাসা নিয়ে কথা বললে খুব ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়।' কথাতে বুঝলাম, 'ইসলামি কোন দল কখন না-জানি কোন কথায় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, তখন মান-সম্মান নিয়ে বিপদে পড়তে হয়, বিরুদ্ধে শ্লোগান হাঁকার ভয় কাজ করে।' আমি তার কথার যৌক্তিকতা আঁচ করতে পারলাম। ভাবলাম, এভাবে ভয় পেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে সবাই এড়িয়ে গেলে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হবে কী করে? দেশের জনগোষ্ঠী জনসম্পদ হবে কী করে? এ দেশে সুশিক্ষিত জ্ঞানী মুসলমান পাবো কোথায়? এই উপমহাদেশ বাদে অন্য কোনো মুসলিম দেশে

মাদ্রাসাশিক্ষার এ দৈন্যদশা নেই। এ দেশের মাদ্রাসাশিক্ষা কর্তৃপক্ষ আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত সেই ব্রিটিশ আমল থেকে বলবত রেখেছে। এ দেশের জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশকে অনুৎপাদনশীল কর্মবিমূখ শিক্ষাব্যবস্থায় অঙ্গীভূত করেছে। ইসলামের ইতিহাস ও ধর্মীয় ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, যত নবি-রাসুল-পয়গম্বর এ বিশ্বে এসেছেন সবারই সমসাময়িক সময়ের কোনো না কোনো কর্ম ও পেশা ছিল। তাদের কেউই ধর্মপ্রচার ও ধর্মকে পেশা হিসেবে নেননি। ইসলাম কর্মশিক্ষাকে প্রথম ফরজের পর দ্বিতীয় ফরজ হিসেবে গণ্য করেছে। আমাদের রাসুল (সাঃ) যে যে মাদ্রাসা (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানেও ধর্মের পাশাপাশি কর্ম ও পেশার শিক্ষা ছিল। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে জ্ঞানচর্চা হতো।

গত ৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তরের এক প্রবন্ধে দেখলাম, আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২২ লাখ। কওমি মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। সংখ্যাটা কিন্তু অনেক। শিক্ষার্থীদের সবাই নাবালক অবুঝ শিশু-কিশোর। তাদের মধ্যেও প্রতিভা রয়ে গেছে। এ দেশের এ ফুলকুড়িও পূর্ণ বিকশিত হতে চায়। ভবিষ্যৎ জীবনের ভালো-মন্দ বোঝার বয়স তাদের হয়নি। তাদের মা-বাপ, শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়ে ভাবতে পারেন। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং এ দেশের দায়িত্ব-সচেতন ব্যক্তিবর্গেরও এ নিয়ে ভাবনা থাকা উচিৎ। বাস্তবে আমরা দেখছি, আলিয়া মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশই বেকার বা ছদ্ম-বেকার। তাদের লেখাপড়ায় অতি নগণ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। টেকনিক্যাল শিক্ষায়ও তাদের অবস্থান নগণ্য। আরবি, ইসলামি শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে তাদের লেখাপড়া বেশি। তারা ধর্ম বেশি বোঝে এটা সত্য, কিন্তু কর্ম বা পেশা অর্থাৎ দেশের পণ্য ও সেবার উৎপাদনে তারা কতটুকু অবদান রাখতে পারছে? জীবনের উৎকর্ষসাধনেই-বা তাদের অবদান কতটুকু? তারা প্রত্যেকে কী একটা মর্যাদাবান পেশা নিয়ে দুনিয়াদারি চালিয়ে যাচ্ছে? –এটা ভাবার বিষয়। কওমি মাদ্রাসা গ্রামে-গঞ্জে প্রতিটা জনপদে ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আলিয়া মাদ্রাসার চেয়েও এদের শিক্ষার অবস্থা ভয়াবহ রকমের খারাপ। কুরআন-হাদিস পড়তে জানে। অধিকাংশই কুরআন বোঝে না। বাংলাভাষাটাও ভালোমতো পড়তে ও লিখতে জানে না। অনেকে ভদ্র-দীনদার, নিম্ন-আয়ের পেশাতে অতি কষ্টে জীবন নির্বাহ করে চলেছে। এদের অনেকের সাথেই আমি কথা বলেছি। সৎ

হওয়ার কারণে বেশ কিছু বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। ভিত্তিমূল শিক্ষা না থাকাতে কোনো টেকনিক্যাল শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষায় তারা যেতে পারেনি। এদের নিয়ে মোটামুটি একটা গবেষণাও করেছি। জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা না থাকাতে জীবনের ভালো-মন্দ বুঝতে এরা অক্ষম। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বোঝে, প্রতিটা কাজে ও চিন্তায় ধর্মের প্রায়োগিকতাকে বোঝে না। চিন্তা ও চেতনাকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে না। জীবনের উপলব্ধি ও চিন্তাধারার মান অগভীর ও হালকা। জ্ঞান-বিজ্ঞান বোঝে না। শিক্ষা না থাকার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা নেই। ঘটনা বিশ্লেষণের সক্ষমতা নেই। সমাজবিজ্ঞান-অর্থনীতির জ্ঞান নেই। নিজের জীবন গড়বে কীভাবে? প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে ও আদর্শ সমাজ গড়বে কীভাবে? কুরআন নিজেকে 'বিজ্ঞানময় কুরআন' বলে। কুরআন ও হাদিস ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল ও উচ্চ-পেশার মর্যাদা দিয়েছে। অথচ এ দেশের মাদ্রাসাশিক্ষা বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষাকে দূরে ঠেলে দিয়ে জীবন পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। এটা কীভাবে সম্ভব? ইসলামি অর্থনীতি জীবনব্যবস্থার একটা অন্যতম অবিচ্ছেদ্য দিক। মাদ্রাসাশিক্ষার্থী কদাচিৎ এ বিষয়টা নিয়ে ভাবে।

মূলত কর্ম ও পেশা ধর্ম থেকে আলাদা কিছু না। একটির সাথে অন্যটি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। ধর্মের জন্যই কর্ম। ধর্মীয় 'জীবনবিধান'ই কর্ম বা কাজ, আবার বিধান মোতাবেক কাজই ইবাদত। কর্ম ধর্মের ফলিত রূপ। কর্মের সমষ্টিই ভিন্ন ভিন্ন পেশা। এগুলো তো ধর্মীয় দর্শনের একটা দিক, যা শিক্ষিত মুসলমানদের শিখতে হবে, জানতে হবে। ধর্মের প্রায়োগিক দিকগুলো একজন মুসলমান নিজে করবে এবং অন্যদের শেখাবে ও বাস্তবে প্রয়োগ করবে। এ দেশের মাদ্রাসাশিক্ষায় আমরা তা উপেক্ষা করছি। আমাদের এ উপমহাদেশের মৌলবি-মাওলানাসহ সাধারণ মুসলমানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মকে নামাজ-রোজা-হজ ও তসবিহ-তেলাওয়াতের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছে এবং সাধারণ মানুষ ইসলামের উপর লেখা ভালো মানের বইপত্র পড়ে না। শুধু দোয়া-দরুদ শিক্ষা, নামাজ শিক্ষার বই পড়ে। এতে ইসলামের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। আবার আমাদের মৌলবি-মাওলানারা বিচার-বিশ্লেষণ না করে সুর করে ধর্মের উপরিগত ব্যাখ্যা দেন। মুসলমানদের আবেগাপ্লুত করে তোলেন। 'হক্কুল ইবাদ' নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা নেই বললেই চলে। কর্মের মাধ্যমে ধর্ম পালনের তুলনায় সমাজে ক্রমশই ধর্মীয় লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা বেড়ে চলেছে। এতে আমরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পরিণতির দিকে যাচ্ছি। সাধু না হয়ে সাধু সাজার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছি। ইবাদত বলতে সাধারণ মানুষ সাধারণত নামাজ-রোজা-হজ ও তসবিহ-তেলাওয়াতকে বোঝে। আমরা অনেকেই 'ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ

জীবনবিধান’ বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলি, বাহবা দিই। বাস্তব কাজে ‘পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের’ প্রয়োগ কই? অথচ দুনিয়াদারির পুরো বিষয়টাই ধর্মের প্রায়োগিক দিক ও কর্ম বা কাজ। এই কর্ম বা কাজ ছাড়া ধর্ম হয় না। এগুলোও ইবাদত। ‘আমলনামা’ শব্দের বাংলা অর্থও কাজের বিবরণী। পরকালে আমাদের কাজের হিসাব দিতে হবে। আমরা সবাই আমলনামা ডান হাতে পেতে চাই। কীভাবে আসবে– এ নিয়ে বেখবর। ইসলামে কর্মবিমুখ বৈরাগ্য নেই। বৈধ জীবনযাপন, সংসার জীবন, সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষা এবং দুনিয়াদারির জন্য সকল অনুমোদিত কর্মই ধর্ম, সাথে সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিখাদ বিশ্বাস। আমাদের মৌলবি-মাওলানাদের এসব কথা সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। আমরা দুনিয়ার কর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মের শুধু পরলৌকিক ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছি বলে বাস্তব জীবনে ধর্মকে কাজে লাগাতে পারছিনে। জীবন-জীবিকা ও কাজ এবং সামগ্রীক শিক্ষা (অল ইনক্লুসিভ এজুকেশন) থেকে মুসলমানরা পিছিয়ে গেছে বলে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের এ চরম দুর্গতি চলছে এবং এরা দুর্দশায় পতিত হয়েছে। আমাদের ভুলগুলো খুঁজে বের করার সময় এসেছে। আমাদের দেশের মুসলমানদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন ও দৈন্যও তাদের পশ্চাৎপদ চিন্তা ও কর্মের ফসল। মূলত এ দেশের মুসলমানদের দৈন্যদশা ও শিক্ষামানের অবনতির মূলে মুসলমানরা নিজে এবং অনেকটাই মৌলবি-মাওলানাদের অপরিণামদর্শীতা। তাদের মধ্যে শতধাবিভক্তিও আরেকটা কারণ। মুসলমান কোনো পেশা ও পোশাকের নাম নয়। মুসলমান সৃষ্টি ও প্রকৃতির অনুকূলে মানবতাবাদী কতগুলো বৈশিষ্ট্য, কাজ ও চিন্তা-চেতনার নাম। এই কাজ ও চিন্তা-চেতনা যারা ধারণ করে তারাই মুসলমান। মৌলবি-মাওলানাদের সংকীর্ণ চিন্তাধারা ও খণ্ডিত শিক্ষার এ সুযোগে ইসলামবিদ্বেষী মুসলমান নামধারী ছদ্মবেশী একটা অংশ ইসলামি জীবনবিধান ও মুসলমানিত্ব ধ্বংস, মুসলিম সভ্যতা বিনাশ ও সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করার বুদ্ধি আটছে এবং তথাকথিত আধুনিকতার মোড়কে ইহবাদী ও ভোগবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠার জটিল খেলায় রত হয়েছে। এর দায়ভারও মৌলবি-মৌলানারা এড়াতে পারেন না। সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-বিচ্যুৎ কর্মবিমুখ ও অগভীর জ্ঞানসৃষ্টিকারী খণ্ডিত মাদ্রাসাশিক্ষা ও এর নিম্নগামী মান এজন্য দায়ী। এজন্য আজকের প্রশ্ন একটাই, আমরা কী নিয়ে, কী ভেবে সামনে এগোচ্ছি? আমি মুসলমান। মুসলমানিত্ব আমার অস্তিত্বের সংগে মিশে আছে। যে জাতি তার অতীতকে ভুলে যায়, সে জাতি নিঃস্ব। আমরা সবকিছুর মধ্যে রাজনীতির বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এটা কোনোক্রমেই কাম্য নয়। আমি আমার অস্তিত্বের সাথে কোনোমতেই প্রতারণা করতে পারিনে। এ দেশের মৌলবি-মাওলানা ও

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের এসব নিয়ে ভেবে দেখার সময় আছে কি না? তারা এ দেশের আত্মবিস্মৃত জটিল-কুটিল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থমুখী রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে সুস্থ ধারার রাজনীতিতে পরকালের কল্যাণের আশায় অহিংস মনে ইহকালীন শিক্ষা, কর্ম, সমাজসেবা ও মানবকল্যাণের কাজ করুক– এটা আমার প্রত্যাশা।

যে যত কথাই বলুক না কেন, মাদ্রাসা-শিক্ষার্থীরাও এ দেশের নাগরিক। এ দেশেই তারা আমৃত্যু বসবাস করবে। তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে অবহেলা করে কিংবা পাশ কাটিয়ে আমরা জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পারবো না। তাদেরকে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা দিয়ে, উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত করে মূল স্রোতধারায় আনতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। মাদ্রাসাশিক্ষায় আপদমস্তক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, খণ্ডিত-শিক্ষায় শিক্ষিত, কূপমণ্ডূক মানসিকতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী দেখতে কোনোক্রমেই চাইনে। তাদের মধ্যে সুস্থ ও উন্নত জীবনঘনিষ্ঠ চিন্তাধারার বিকাশ ঘটুক এটা আমরা চাই। আমি মাদ্রাসাশিক্ষাকে সুশিক্ষিত কর্মজীবী যুগোপযোগী মুসলমান তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চাই। তাতে এ দেশের মঙ্গল ও জাতীয় উন্নয়ন। এজন্য করণীয় করতে ও বিষয়টা নিয়ে ভাবতে মাদ্রাসা-শিক্ষার সাথে জড়িত মৌলবি-মাওলানা ও মাদ্রাসাশিক্ষা কর্তৃপক্ষই যথোপযুক্ত। তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। দরকার তাদের সদিচ্ছা ও ইচ্ছার বাস্তবায়ন।

এ দেশের মাদ্রাসা-শিক্ষাসহ সর্বাঙ্গীন সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা, মূল্যবোধ ও সমাজসেবা নিয়ে দেশ-সচেতন অনেক শিক্ষাবিদ, দেশপ্রেমী ও সুশিক্ষিত সমাজবিদের অনেক ভাবনার খোরাক রয়ে গেছে। এজন্য এই পত্রিকাকে আমরা একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বেছে নিতে পারি। রাজনীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে দেশ ও সমাজ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও সমাজসেবার বিষয়ে বিভিন্ন মতামত আলোচনা করা যেতে পারে। এটাও দেশসেবার একটা নির্বিরোধ পথ হিসেবে দেখা দিতে পারে। দেশপ্রেমী সুশিক্ষিত সমাজ ও পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে বিবেচনায় আনতে পারে।

(প্রকাশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; গবেষক ও প্রাবন্ধিক।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তেলেসমাতি না করাই ভালো

'এ জীবনে শুধু ভাঙা-গড়ার খেলা'। এই গানটা ছোটবেলায় শুনতাম, বাস্তবতার সাথে মেলাতাম। জীবনের পাদপ্রান্তে এসেও সেটার প্রমাণ অনেকবার পেয়েছি। দুর্মুখ বন্ধুমহল কর্মজীবনের প্রথম থেকেই আরেকটা কথা রসিকতা করে বলতো। বলতো ঢাকা শহরের আইল্যান্ড ভাঙা-গড়ার কথা। বলতো, 'প্রথমবার তৈরির সময়ই ঠিকাদার বুঝতে পারেন যে, তিন বছরের মধ্যে আবার ভাঙার প্রয়োজন হবে, তাই সিমেন্ট-বালি কম করে দেন, নিম্ন-মানের ইট ব্যবহার করেন।' এসবই এদেশের হাজার কিসিমের জীবন প্যারোডির অন্যতম। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েও এ দেশে 'ভাঙা-গড়ার খেলার' অন্ত নেই। গত কয়েকদিন আগে আমার এক স্বজাতির লেখা প্রবন্ধ পত্রিকায় পড়েছিলাম। তিনি ভালোভাবেই বুঝিয়েছেন যে, আমরা সৃজনশীল পদ্ধতির নামে যে লেখাপড়া শুরু করেছিলাম, সেটা ভালো ছিল না। যে পদ্ধতি বর্তমানে আমরা ব্যবহার করতে চলেছি তা উত্তম। লেখাপড়ার এখন শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হবে। এসব নিয়ে লেখা পড়লেই আমার ছোটবেলায় পড়া 'দাদির কবর কোথায়, আর আমরা কাঁদছি কোথায়' শব্দগুচ্ছটা মনে পড়ে।

যেদিকে বৃষ্টি সেদিকে আগ-বাড়িয়ে ছাতা ধরার রেওয়াজ আমাদের সামাজিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে অভ্যাসের তো তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং কথা না বাড়ানোই ভালো। আবার কোনো বিভাগ না রেখে এসএসসি পর্যন্ত সাধারণভাবে সবাই একই পড়া পড়ে যাওয়া– এটাও অনেক ভালো বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টাও তর্কের বাইরে নয়। অদূর ভবিষ্যতে এখান থেকে পিছুটান দিলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। কারণ এসএসসির পর দুবছরের কম সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের কোনো নির্দিষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য মূলশিক্ষার প্রস্তুতি কতটা সম্ভব হবে এ নিয়ে ভাবনার বিষয় আছে। আবার এ অসুবিধা উত্তোরণের জন্য এসএসসি পর্যায়ে উচ্চতর গনিত, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি দিলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা পেরে উঠবে না। এ নিয়ে একটা বিকল্প 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা' নামে জাতীয় পর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনায় তুলে ধরেছিলাম। একটা বইও প্রকাশ করেছিলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ নেট ঘেটে এখনো বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে পারেন। সে আলোচনায় আজ যেতে চাইনে। আমি যেমন সৃজনশীল পদ্ধতি তৈরির সময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে আশ্চর্য হয়নি, তেমনি ক্লাস ফাইভ ও অষ্টম শ্রেণি পাশ করতে, পাবলিক পরীক্ষার অবতারণা করাতেও আশ্চর্য হয়নি। আশ্চর্য হইনি আবার বন্ধ করাতে। এ সেই 'ভাঙা গড়ার খেলা'র অংশ। আমরা তো যখন

যেদিকে ধাই, বাচবিচার না করেই সবেগে ধাই। আবার দলীয় লোকের কথা ও প্রভাব ছাড়া সাধারণ শিক্ষকদের কথা হালে পানি পায় না। দূরে তাকাতাকির অভ্যাস আমাদের কম। যে যেখানে আছি নিজের লাভ-লোকসানকে, রাজনৈতিক আনুগত্যকে বড় করে দেখি। মাঝখান থেকে মাত্র কয়েকটা বছরের ব্যবধানে দুটো পাবলিক পরীক্ষার সমস্ত আয়োজন গুটিয়ে নিতে হলো। অভিভাবকমহল ও সরকারের তহবিল থেকে প্রচুর অর্থকড়ি ব্যয় হলো। অবুঝ শিশু-কিশোরদের মনের সহ্যসীমা পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক-রকমের গবেষণা শেষ হলো। অন্য গবেষণা আবার শুরু হলো। এ গবেষণায় এ জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে নতুন ছবক শিশু-কিশোরদের মগজে ঢোকাতে মরিয়া হয়ে উঠেছি। এর পরিণতি কি, ভাবার অবকাশ কম। আমাদের রাজনীতি করতে হবে, প্রভুভক্তি করতে হবে, ইজম চাপিয়ে দিতে হবে– এটাই মূল কথা। মুখে এ দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য একরকম বলি, কাজে উদ্দেশ্যকে অন্যভাবে প্রকাশ পায়, কু-মতলব ধরা পড়ে। এ দেশকে নিয়ে এই কু-মতলব, তা যে পক্ষেরই হোক, বর্জনীয়। এই গবেষণার ভোগান্তি নিয়েই যাদের লেখাপড়া-জীবন শেষ হয়েছে বা হতে চলেছে তাদের কাছে আমাদের কৈফিয়ত কী? আমরা কাজের সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখি। মনের আসল কথাটা প্রকাশ করিনে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মতো 'কর্তা ইচ্ছে কর্ম' করি। এগুলো সবই আমাদের স্বভাব। মাঝখানে পড়ে যারা ভোগার তারা ভোগে।

আমার বুঝ ভিন্ন। শিক্ষা বিষয়ে এসব বুঝের বেশকিছু বেশ কিছুদিন থেকে এ পত্রিকার মাধ্যমেই প্রকাশ করছি। একটা প্রবন্ধে অনেক কিছু বলা সম্ভব হয় না। জানিনা এসব কথা সংশ্লিষ্ট পক্ষ আমলে নেয় কি-না।

ব্লুমস ট্যাক্সোনমি একটা শিক্ষণপদ্ধতি। একজন শিক্ষার্থীর শেখার মাত্রা কতটুকু– তা এ পদ্ধতি নির্দেশ করে। যুগ যুগ ধরে এদেশে লেখাপড়ার প্রতিটা পর্যায়ে এটা চালু আছে। এ পদ্ধতির প্রচলন বিশ্বের অনেক দেশেও আছে। পদ্ধতি নিয়ে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে বলেশুনিনি। যত সমস্যা আমাদের দেশে। 'নাচতে না জেনে উঠোন বাঁকা' বলা আর কি! সম্প্রতি 'আউটকাম বেইজড এজুকেশন' নামে আরেকটা পদ্ধতির কথা আমরা জোরেশোরে শুনছি। সেখানে শিক্ষার মাত্রার মৌলিক কোনো পরিবর্তনের বিষয় আমার চোখে পড়েনি। এটাকে 'ব্লুমস ট্যাক্সোনমির' বর্ধিত রূপ বলা যায়। এতে 'ব্লুমস ট্যাক্সোনমির' প্রায়োগিক দিকের উপর জোর দেয়া হয়েছে বলে আমার মনে হয়। শিক্ষা দেওয়ার তুলনায় করণিকের কাজ বেড়েছে অনেক বেশি। বিদেশি এসব পদ্ধতিকে একবাক্যে ভালো কিংবা খারাপ বলা উচিত নয়। আমাদের দেশে এসব পদ্ধতির মূলভাবকে নিয়ে সমাজের

বুনন, চিন্তা-চেতনা, সামাজিক পরিবেশ ও মননশীলতাকে প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশের সৃজনশীল পদ্ধতি নামে খ্যাত বিষয়টাও মূলত কোনো পদ্ধতি নয়। 'ব্লুমস ট্যাক্সোনমির' মোট ছয়টি পর্যায়ের মধ্যে শেষের দুটো পর্যায়ের অর্থাৎ 'শিক্ষার্থীর শেখার ন্যায্যতা প্রতিপাদন (জাস্টিফাই) করতে পারতে হবে' এবং 'শিক্ষার্থীর শেখার একই রকমের নতুন কোনো জিনিস বা ধারণা সৃষ্টি করতে পারতে হবে'– শিক্ষণ-প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমসিকিউ-এর মাধ্যমে মূল্যায়নটাও 'ব্লুমস ট্যাক্সোনমির' দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের একটা শিক্ষণ-মূল্যায়ন। সেটা এদেশে ভালোভাবে প্রয়োগ করতে আমরা নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছি। সৃজনশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে আমরা ব্যর্থ হলাম বলে অনেকে মুখরোচক কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করছি। আসলে সৃজনশীল পদ্ধতি ও এমসিকিউ পদ্ধতি কোনো শিক্ষণ-পদ্ধতিই নয়– এগুলো শিক্ষণ-মাত্রা ও শিক্ষণ-মূল্যায়ন। একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষার মাত্রা আমাদেরকে মূল্যায়ন করতেই হবে, তা যেভাবেই করি না কেন। আমার দৃষ্টিতে এ দেশে এগুলো কোনো সমস্যাই নয়। এগুলো আমাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার শামিল। ছাত্রছাত্রী শিখতেই চায় না, আমরা না শিখিয়েই পাশ করিয়ে দিই, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না, শিক্ষার মান রক্ষা করা হয় না, ঠিকমতো শিক্ষা-তদারকি করা হয় না, শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি করেন, ক্লাশে ঠিকমতো পড়ানো হয় না– এসবই মূল সমস্যা। আমরা শিক্ষার্থী নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষাঙ্গণ নিয়ে, শিক্ষকদের নিয়ে রাজনীতি (?) করি, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছি– এসবও সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানে আমরা সহজে ব্রতী হই না, সমস্যা এড়িয়ে যায়। সমস্যার চারপাশে নৃত্য করি। এসব সমস্যা সমাধানে আমরা কোনো মেগাপ্রজেক্ট হাতে নিই না। এসব সমস্যার সমাধান আগে জরুরি। নইলে সিলেবাস যতই পরিবর্তন করি, শিক্ষার মান বাড়বে না। তাছাড়া এ দেশের আরেকটা মূল সমস্যা হলো বাস্তবায়ন সমস্যা, যাকে বলি বাস্তবায়নে সিস্টেম লস। অনেক কথাই মুখে বলি, পরিকল্পনা করি, সেমতো কাজ হয় না। এ দিকে গভীর মনোযোগ দেওয়া দরকার। সৃজনশীল পদ্ধতিই বলি আর ব্লুমস ট্যাক্সোনমিই বলি কোনোটাই বাস্তবে প্রয়োগ আমরা করিনে বা করতে পারিনে। অথচ এ পদ্ধতি নিয়েই অসংখ্য দেশ শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা কাজ বাদ দিয়ে অনেক বড় কথা বলি।

নতুন বইয়ের বেশ কিছু অংশে আমি মোটামুটি চোখ বুলিয়েছি। শিক্ষা পদ্ধতির তেমন কোনো পরিবর্তন আমার চোখে পড়েনি। আগের মতোই আছে। অনেক দিন থেকেই বলে আসছি আমাদের দেশের পাঠ্যক্রমের অবস্থা অনেক উন্নত

দেশের তুলনায় কোনো অংশেই খারাপ না। শিখতে চাইলে এই পাঠ্যক্রম দিয়েই ভালো কিছু শেখা সম্ভব। সমস্যা ঐ এক জায়গায়– বাস্তবায়নে। ছাত্রছাত্রীরা তো পাঠ্যবইয়ের তুলনায় নোটবই বেশি পড়ে। এসবকে আমরা শিক্ষার পরিবেশের সমস্যা বলে গণ্য করতে পারি। আমি বলি, 'সুস্বাদ করে কুল-কাসুন্দি খেতেই যদি চাও, নুনের সাথে একটুখানি মরিচবাটাও দাও'। এ দেশে এই মরিচবাটা দিতেই আমাদের যত আপত্তি। এখানেই আমরা ফেল মারি। এই মরিচবাটার কাজ গিয়ে বর্তাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উপর, ম্যানেজিং কমিটির উপর, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপর। সমস্যা শিক্ষাব্যবস্থাপনার। অনেকে বলেছেন, শিক্ষকদের অনেকে নাকি সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্রই ভালোমতো তৈরি করতে পারেন না। সেও তো আমাদেরই ব্যর্থতা। আমার প্রশ্ন, এমন শিক্ষক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এলো কীভাবে? এগুলো নিশ্চয়ই রাজনৈতিক স্বজনপ্রীতি, কখনো মানবিচার না করে খরচপাতির বিনিময়ে অতি নিম্নমানের শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের সরকারিকরণ, ভালো মেধাবী শিক্ষিত ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকর্ষণ না করতে পারাই মূলত দায়ী। এ দায় কে মাথায় নেবে? ভোগান্তি কার? আমাদের ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের দায় তো দেশকে বহন করতে হয়। কাউকে তো জবাবদিহি করতে হয় না, এখানেই সমস্যা।

এ ছাড়া বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে গিয়ে যেটা দেখলাম, সে বিষয়টা বেশ কয়েকদিন ধরে সামাজিক মাধ্যম এবং কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এটা তো শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন নিয়ে নয়, মানসিক বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে জটিল রাজনীতি নিয়ে। বইতে এদেশের ইতিহাসকে কোনো এক গোষ্ঠীর গোলামির নিগড়ে বাঁধার চক্রান্ত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের এ ভূখণ্ডের ইতিহাস তা বলে না। এক্ষেত্রে আমাদের তখন বলারও কিছু থাকে না। এটা আমাদের হীনমন্যতা এবং জাতিকে গোলামির নিগড়ে আবদ্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় আমাদের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের সমাজ পরিবর্তনের নামে বিবর্তনবাদের তালিম দেওয়ার চেষ্টা কতটা যৌক্তিক– এটা ভাবার বিষয়। ডারউইনের মতবাদের কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ নেই। নিছক যুক্তি ও অনুমান নির্ভর তত্ত্ব। নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে এ পাঠ দেওয়া অতি আবশ্যক মনে হলে এ তত্ত্বের পক্ষ-বিপক্ষ উভয় দিকই তুলে ধরা যেত। আমার মনে হয়, এটা কোনো ধর্মবিদ্বেষী বাতিল 'ইজম' চাপিয়ে দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা। এটা আমাদের ধর্মবিদ্বেষী 'কর্তাভজা সম্প্রদায়'-এর কাজ। এতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কৃতকর্মের দায় জাতিকে ভোগ করতে হয়। এ দেশে স্বাধীনতার পর

থেকেই একটা পক্ষ পূর্ব-ইউরোপের সাথে তাল মিলিয়ে প্রগতিশীলতার মোড়কে আমাদের দেশেও নাস্তিক্যবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ সেদিকে অনেকটা হেলে পড়াতে রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সে ক্ষতির রেশ এখনো দেশকে বইতে হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের মূল তত্ত্ব প্রায় দেশ থেকেই বিদায় নিয়েছে। সে তত্ত্বের পুরোধারা এ দেশে তলে তলে এখনোও নাস্তিক্যবাদী সমাজ চর্চার স্বপ্ন দেখে। পাঠ্যবইয়ের টপিক সিলেকশনে ও বর্ণনায় সে চর্চার প্রতিফলন দেখতে পাই।

শত শত বছর ধরে এদেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ গলাগলি করে একত্রে বসবাস করে আসছে। আমাদের অজান্তেই একটা অহিংস সমাজ তৈরি হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ একাকার হয়ে গেছে। এ দেশে সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে খুব একটা পৃথক করা যায় না। ধর্মীয় মূল্যবোধকে উড়িয়ে দিতে চাইলে বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধও উড়ে যাবে। এ দেশে নতুন কোনো ইজমের ক্রমশ প্রয়োগ করে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করার চক্রান্ত জাতির জন্য সুখকর হবে না। এদেশে প্রকৃতপক্ষেই শিক্ষিতসমাজ গড়তে গেলে জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার সাথে শিক্ষায় নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকতেই হবে। প্রগতিশীলতার মোড়কে ইহবাদ, ভোগবাদ কোনো আদর্শ নয় বরং মনুষ্যত্ব তথা মানবিক মূল্যবোধের বিকৃতি। মনুষ্যত্ব থাকা উচিত বলেই আমাদের নাম ‘মানুষ’ হয়েছে। শিক্ষায় যদি আদর্শহীন এসব ‘বাদ’কে জায়গা করে দেওয়া হয়, তাহলে এ দেশের শিক্ষা কোনোদিনই পূর্ণাঙ্গতা পাবে না। এ দেশের জনগোষ্ঠীকে এর খেসারত দিতে হবে। আমাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

(প্রকাশ: ২৮ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ কি ও কেন?

স্বাধীনতা অর্জনের তুলনায় কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে সুসংহত ও সমৃদ্ধ করা এবং জাতির উৎকর্ষ সাধন বেশ প্রয়াসসাধ্য। জাতির উন্নয়নে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের মধ্যে গুণগত ও মানসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা এবং সামাজিক পরিবেশকে আমি বেশি জরুরি ভাবতে শিখেছি। শিক্ষা অন্যান্য ফ্যাক্টরকে প্রভাবিত করে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন অনেক হয়েছে। সাক্ষরতার হার বেড়েছে। উচ্চশিক্ষার হারও বেড়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত মান বাড়েনি। শিক্ষাব্যবস্থাপনা, সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান, পরিবেশ ও সেবার সঙ্কট এ দেশে বিদ্যমান। শিক্ষা থেকে দেশীয় মূল্যবোধ, সততা, মানবিকতা, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলি হারিয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা থেকে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিযুক্ত হয়েছে; টেকনিক্যাল শিক্ষার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা খণ্ডিত শিক্ষায় পরিণত হয়েছে। এভাবে জাতি হিসেবে আমরা ক্রমশই দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। আবার শিক্ষা ও পরিবেশের অভাবে আমাদের সমাজে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা, সামাজিক আয়-বৈষম্য ক্রমশই বাড়ছে এবং ইতোমধ্যেই সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত শিক্ষা ও সেবা দিতে না-পারা আমাদের জাতীয় সমস্যারই একটা বড় অংশ। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকারি পর্যায়ে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ফল আশানুরূপ নয়। কোনো সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা ও সমাজসেবার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করে, মাঠ পর্যায়ে তার বাস্তবায়ন অনেকটাই হয় না। সামাজিক শিক্ষা ও পরিবেশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবেশহীনতা কুশিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে। এটা একটা ভিসাস সার্কেল। সেজন্য সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের এত অবক্ষয়। তাই সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী বা মানবসম্পদ গড়তে গেলে সামাজিক পরিবেশ গড়া ও সমাজসেবার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সামাজিক পরিবেশ ও মানবসম্পদ এবং শিক্ষা ও সেবা পরস্পর নির্ভরশীল ও রেসিপরোক্যাল। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার নিরঙ্কুশ উন্নতি আশা করা যায় না। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতি চাইলে সামাজিক শিক্ষা ও সামাজিক সেবার মানকেও উন্নত করতে হবে। এজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি ও

কর্মকৌশল প্রণয়ন করা জরুরি। সুশিক্ষিত পরিবেশ গড়তে গেলে সমাজের অভ্যন্তর থেকে সুস্থ-চিন্তাশীল, কর্মোদ্যোগী লোকের সহযোগিতা নিতে হবে। এদেরকে একত্র করে কাজে লাগাতে হবে। এখন প্রয়োজন এ ধরনের সমাজ ও মানব-কল্যাণকামী মানুষদের খুঁজে বের করা, একত্র করা, এদের নিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। এমন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ শিক্ষিতসমাজ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে একজোট হবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এভাবে জোটবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবী সমাজ-সংগঠনের নাম 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' (জাশিপ)।

'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' সমাজের ভালো লোকগুলোকে একত্রিত করবে। এলাকাভিত্তিক 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' তৈরি করবে। সমাজের কাউন্সিলরদের সমাজ উন্নয়নে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবে। এক্ষেত্রে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' ও 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে করণীয় করবে এবং শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে। এ প্ল্যাটফর্ম সরকারের শিক্ষা ও সমাজসেবা নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সামাজিক শিক্ষা বৃদ্ধি করতে সাধারণ মানুষকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া, ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া এবং জীবনমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই, যে দায়িত্ব 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' পালন করবে। প্রতিটা এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' অভিভাবকসহ সাধারণ মানুষকে সুশিক্ষা দেবে, সমাজসেবা দেবে, প্রশিক্ষণ দেবে, তাদেরকে শিক্ষা-সচেতন জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলবে। এভাবে সামাজিক শিক্ষাবলয় গড়ে তুলতে পারলে সমাজে শিক্ষার উন্নতি হবে, সামাজিক অপরাধ, রাজনৈতিক সংঘাত ও অপচিন্তা অনেকটাই কমে আসবে। জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবসম্পদরূপে গড়ে তুলতে গেলে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা প্রয়োজন। এই ত্রিমাত্রিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ, সফ্‌টস্কিলস ট্রেইনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও আর্থিক সহায়তা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে, আবার কখনো রাষ্ট্রীয় উৎস থেকে প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর আর্থিক সহযোগিতা ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কাজ অব্যাহত রাখতে এবং বণ্টনব্যবস্থা

ত্রুটিমুক্ত করতে ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ এবং ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের’ উদ্দেশ্য: ১. দেশে জাতীয় মূল্যবোধসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি করা; ২. স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটা পর্যায়ে গুণগত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা দেওয়া। ব্যবসায়, কারিগরি ও বিজ্ঞানমুখী আধুনিক শিক্ষার সম্মিলনে সমন্বিত শিক্ষার ব্যবস্থা করে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা ও মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা চালু করা; ৩. সমাজের প্রতিটা মানুষের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যষ্টিক (জনে জনে) উন্নয়নের একটা টেকসই অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করা। মানবকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠা করা। ৪. সমাজে দরিদ্র-দুঃস্থ-অসহায়, আর্ত-পীড়িত, খেটে-খাওয়া মানুষের টিকে থাকার জন্য, মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং আর্থিক সহায়তা ও দানের ব্যবস্থা করা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নিম্নবিত্ত পরিবারের আয়-রোজগার বৃদ্ধিতে সক্ষম সম্পদ গড়তে সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান। ৫. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম ও দেশসেবার মনোভাব জাগ্রত করা। শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি ছাত্রছাত্রীদের মনে জাগিয়ে তোলা। ৬. সাধারণ মানুষের জন্য জাতীয়ভাবে গণশিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক সামাজিক শিক্ষা এবং জীবনমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। জনগোষ্ঠীর মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী শিক্ষা, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সফট স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া; ৭. শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে এবং জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার ও যে কোনো সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে গঠনমূলক আলোচনা, শিক্ষানীতি তৈরিতে সরকারকে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহযোগিতা, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা এবং শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন মূল্যায়ন প্রজেক্ট পরিচালনা করা; ৮. দেশব্যাপী ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ পরিচালনা, তাদেরকে সামাজিক শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা, সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কিং প্ল্যান তৈরি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ের নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করা;

শিক্ষা-সেবা সমাজ: প্রতিটা সমাজে বসবাসরত মানুষের একটা সুশিক্ষিত ও সুপ্রশিক্ষিত অংশকে দিয়ে সেই সমাজের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার

পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সমাজের অন্যান্য সেবামূলক কাজ করলে সঠিক সময়ে সঠিক লোক দিয়ে সঠিক কাজটা করা সম্ভবপর হয়। সৎ, বিবেকবান, মানব ও সমাজদরদি মানুষের সংখ্যা এখন কম হলেও এমন মানুষ আমাদের সমাজে আছেন। এখন প্রয়োজন এ ধরনের সমাজ ও মানব-কল্যাণকামী মানুষদের একত্র করা, এদের নিয়ে দেশব্যাপী এলাকাভিত্তিক অসংখ্য সমাজ তৈরি করা, যার নাম 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'। এদেরকে বেছে আলাদা করে পরিবেশ দিয়ে কাজে লাগাতে হবে। 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' একটি স্বশাসিত, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, সেবাদানকারী সমাজ-সংগঠন হিসেবে কাজ করবে। প্রতিটা সদস্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অহিংস মনোভাবে বিশ্বাসী হবেন। সমাজসেবার মাধ্যমে ত্যাগের মহিমায় তারা মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন। শিক্ষা-সেবা সমাজের সব কার্যক্রম ক্ষমতাভিত্তিক ও কর্তৃত্ববাদী না হয়ে পরামর্শমূলক হবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজের কার্যাবলি হবে মোটামুটি এরকম: সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। সাধারণ মানুষকে জনে জনে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশসাধন করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সম্মিলনে শিক্ষার জন্য ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রতিটা পক্ষকেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা। বিশেষভাবে অভিভাবকমহলকে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে শিক্ষা ও শিক্ষার মান নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো। তাদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বলা। স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে 'ফুল-টাইম স্কুলিং' ব্যবস্থার দিকে ক্রমশ নিয়ে যাওয়া। ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-মাদ্রাসা থেকে ঝরে যাওয়া বন্ধ করা। স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে অভিভাবকদের ও সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাদেরকে সুপ্রশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত করা।

স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে পেশাজীবী মানুষের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা; সমাজের মানুষের সামাজিক স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।

গরিব, নিঃস্ব, পীড়িত, অসহায় ও মেহনতি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা। শ্রেণিভেদে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে সুদবিহীন স্বল্পকিস্তিভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা (ব্যক্তির আয়-রোজগার সৃষ্টিকারী সম্পদ তৈরি করে দেওয়া)। আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মানুষকে কর্মমুখী করে গড়ে তোলা।

‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ সমাজের সচ্ছল সদস্যদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে তাদেরকে দিয়ে এক বা একাধিক কৃষিভিত্তিক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করার পরামর্শক হিসেবে কাজ করবে। বর্তমানে ড্রাগ-এবিউজ সমাজে টিন-এজারদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে নিয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে।

কাউন্সিলরদের দায়িত্ব হচ্ছে, তাদের আওতাধীন বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসায় নিয়মিত যাওয়া। সেখানে কর্মরত মৌলবি-মাওলানাদের সাথে সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। মৌলবি-মাওলানারা না-বুঝে তাদের অজান্তেই কোমলমতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বেকার, ছদ্মবেকার, সৃষ্টি ও দুনিয়ার কাজে অযোগ্য করে খোদাভক্ত মুসলমান তৈরি করছেন। কাউন্সিলরদের কাজ হচ্ছে, স্থানীয় সব মাদ্রাসায় জীবনমুখী, কর্মমুখী ও জীবনের উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা চালু করার জন্য অনুরোধ করা। কাউন্সিলররা প্রতিটি মসজিদের ইমামকে অনুরোধ করবেন নামাজের দিন খুৎবা দেয়ার আগে বাংলাতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত, প্রতিহিংসার পরিণতি, অজ্ঞতার পরিণতি, স্বাস্থ্যশিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার গুরুত্ব, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব, গরিব-দুঃখীকে দানের সাওয়াব, সমাজসেবা সম্বন্ধে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা, সমাজসেবকের ইহকাল ও পরোকালের প্রাপ্তি, দুনিয়ার সমস্ত ন্যায়-কাজ ও পেশাগত সমস্ত কাজও ইবাদতের অংশ ইত্যাদি বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী করে বক্তৃতা দিতে। শিক্ষা-সেবা সমাজ নিজ এলাকায় একটি স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক ও একটা কমিউনিটি পাঠাগার তৈরি করবে। স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য সেমিনার, হাতে-কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। সার্বিক বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাহায্য-সহযোগিতা নেবে। ‘শিক্ষা-সেবা সমাজের’ পুরো কর্মকাণ্ডটাই হবে ব্যষ্টিক উন্নয়নের মডেল আকারে এবং সামাজিক উন্নয়নে মানবসম্পদ তৈরির প্রক্রিয়া হিসেবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও মানসিকতার উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুগামী একটা সহায়ক উপাদান।

জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ (জাশিপ) পরিচালনা: জাশিপ এ দেশের মানুষকে সুশিক্ষিত করা, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সামাজিক শিক্ষা, শিক্ষা ও সেবা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণ, সমাজসেবা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে জাতীয় প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করবে। জাশিপ ও ‘শিক্ষা-সেবা সমাজের’ কেন্দ্রীয় কার্যক্রম এ পরিষদ পরিচালনা করবে। এ পরিষদ

আদর্শ ও মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটা অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী প্ল্যাটফরম। স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুধু জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা, সেবা এবং সমাজ উন্নয়নের আদর্শকে কাজে ও কর্মে ধারণ করে পরিষদের নীতিমালা নির্ধারণ করবে এবং সে মতো কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এর বাস্তবায়নে পরিষদ প্রয়োজনানুযায়ী জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সাহায্য-সহযোগিতা অবশ্যই নেবে। এ পরিষদ সমাজের মানুষের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থিক-সেবা বিষয়ে সমাজ সচেতনতা বাড়াবে, করণীয় করবে এবং শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে। জাশিপ শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভাগ, মন্ত্রণালয়, কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের মাধ্যমে অভিভাবকমহলকে শিক্ষা-সচেতন করে স্কুল/মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রমকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রভাব সৃষ্টি করবে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষা, পৃথিবীকে রক্ষা এবং মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ 'এসডিজি' বা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়।

এছাড়া এ উন্নয়ন প্রক্রিয়া এসডিজি-১ (নো পোভার্টি), এসডিজি-৪ (গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ) এবং এসডিজি-৮ (শোভন কর্ম-সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন) বাস্তবায়নে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

মোট কথা হলো, এ দেশে মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন জনসম্পদ গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই, যাদের মানবিক মূল্যবোধের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে হবে। এতে শিক্ষার উন্নয়নের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নও সহগামী হবে। এজন্য দেশব্যাপী জনসচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' ও 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'কে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' ও 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' একটা পথ (অ্যাপ্রোচ) ও উন্নয়ন পদ্ধতি। এর কর্মকাণ্ড একটা জাতির লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাথেয়। এজন্য দলমত নির্বিশেষে এদেশের সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সকলকে জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শিক্ষা-সেবা (আর্থ-সামাজিক) উন্নয়ন মডেল

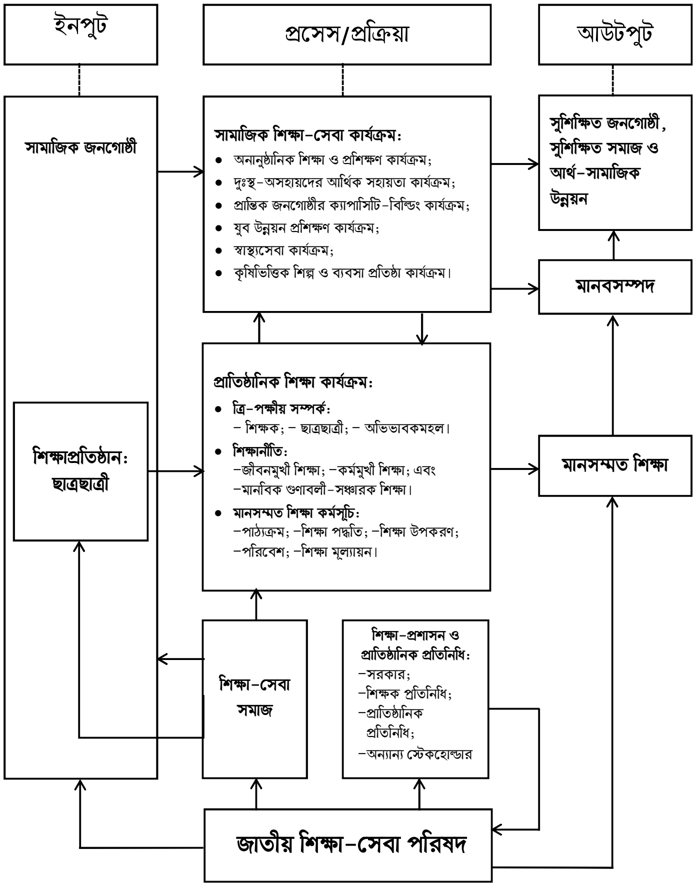

(৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলা একাডেমি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং 'জাশিপ: মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় উৎকর্ষের রূপরেখা' শীর্ষক আলোচনাসভা উপলক্ষ্যে পঠিত মূলপ্রবন্ধের সারসংক্ষেপ পত্রিকায় প্রকাশিত।)

(প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক; প্রেসিডেন্ট, জাশিপ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

স্কুল শিক্ষার হাল হকিকত ও কর্তব্যকর্ম

আমরা যেভাবেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথাটাকে বলিনে কেন, শিক্ষার উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতির চেষ্টা অবান্তর। এই শিক্ষা বলতে আমি সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উভয়কেই বুঝাতে চাচ্ছি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সাধারণ স্কুল-কলেজসহ মাদ্রাসাশিক্ষাকেও অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। কারণ আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমি মাদ্রাসা মিলিয়ে এ দেশের কমপক্ষে ছত্রিশ লাখ ছেলেমেয়ে মাদ্রাসায় পড়ে। সেজন্য সাধারণ স্কুল-কলেজসহ মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে, শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। আমি অনেক সময় একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লিখি। না লিখে গত্যন্তর থাকে না, তাই। সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে-না বলেই লিখি। সেই স্বাধীনতার পর থেকে আমরা অনেকবার অনেক পরিবর্তন শিক্ষাক্ষেত্রে এনেছি, এখনো আনছি। বারবার অনেক বড় বড় প্রজেক্ট হাতে নিচ্ছি। কিন্তু কেন জানি কাজের কাজ আশানুরূপ হচ্ছে না। প্রজেক্টের টাকা- খরচের কোনো অসুবিধা নেই– হাতে ফল পাওয়াতে অসুবিধা। লাভের লাভ কতটুকু হয়, প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশন করলেই বোঝা যায়। আমরা প্রজেক্টের টাকা খরচ করতে হয় তাই করি, নিজেদের লোকজন সাথে নিয়ে খরচ করি। অর্জন কতটুকু হলো সে হিসেব অলক্ষ্যে রয়ে যায়। শেষে একটা দায়সারা গোছের কথা বলে দিন পার করি, দায়িত্ব ঝেড়ে-মুছে ফেলে দিই। তাই এদেশের শিক্ষার এই দৈন্যদশা। অনেক লেখার মধ্যেই অনেকবার লিখেছি যে, শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি পরিবর্তন করে কিংবা মানব জাতির উৎপত্তি ও এদেশের ইতিহাসে কার কতটুকু অবদান, আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির রূপ কেমন, তার বর্ণনা কম-বেশি করে বা বিকৃত করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে না। কারণও অনেকবার বলেছি যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটা ক্লাসের প্রতিটা বিষয়ের সিলেবাস যথেষ্ট ভালো বা চলনসই। সমস্যাটা অনেকটাই প্রায়োগিক বা বাস্তবায়নের। এই সিলেবাসটা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষার মধ্যে পুরোপুরি তিনটি অংশ থাকতেই হবে– এক. শিক্ষা হতে হবে জীবনমুখী; দুই. শিক্ষা হতে হবে কর্মমুখী; এবং তিন. শিক্ষা মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক হতে হবে। এ তিনটি উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের ফল হবে একজন শিক্ষিত লোকের বৈশিষ্ট্য, অথবা বলা যায়, এই ত্রিমুখী শিক্ষা যে অর্জন করবে তাকে আমাদের সমাজে শিক্ষিত লোক বলবো। নিজের উন্নয়নে, সামাজিক ও দেশের উন্নয়নে সে অবদান রাখতে পারবে। এভাবে শিক্ষা দিতে গেলে নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই তা শুরু করতে হবে।

আমি মনে করি, শিক্ষার পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গেলে অর্থাৎ বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে আমরা মাত্র দুটো বড় ও প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। একটি পরিবেশগত সমস্যা, অন্যটি শিক্ষকের মান ও ইচ্ছা সমস্যা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এদেশে ভালো শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশই বিলীন হবার পথে। শিক্ষক হতে গেলে তার মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান যেমন থাকতে হবে, আবার জ্ঞানান্বেষীও হতে হবে। সত্য কথা যত তিক্তই হোক বলে ফেলা ভালো। শিক্ষামানের নিম্নগতির অন্যতম কারণও এই শিক্ষক ও পরিবেশ। অনেক বছর থেকেই শিক্ষার মান নিম্নমুখী শুরু হয়েছে। অনেক শিক্ষক নিম্নমানের শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা-ক্ষেত্রেও ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। নিম্নমানের ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত, কেউবা বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করে অথবা পাঠবিচ্যুত হয়ে কর্মজীবন পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। তাই শিক্ষার মানহীনতা এখন রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটা কাজেই প্রকাশ পাচ্ছে। এটা অপ্রিয় সত্য যে, কোনো স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় আসতে গেলে সরকারি বা এমপিওভুক্ত হবে এই আশায় মধ্যস্বত্বভোগীর পকেটে অনেক মাল-মসলা ঢালতে হয়। এছাড়া সরকারি বা এমপিওভুক্ত করতেও মাল-মসলা লাগে না– এ দেশে এটা অবান্তর। এভাবে অনেক নকল-করে-পাশ বা না-শিখেই-পাশ নিম্নমানের শিক্ষার্থী টাকা কিংবা মামা-খালুর জোরে শিক্ষক হয়ে শিক্ষাঙ্গণে ঢুকেছে। আমরা এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাপনা দিয়ে এ অপাঙ্‌ক্তেয় অনুপ্রবেশকে রোধ করতে পারিনি– এটা আমাদের অপারগতা। শিক্ষাঙ্গণে এদের পাল্লা এখন ভারী। তাদেরকে যত বেশি করেই প্রশিক্ষণ দেয়া হোক না কেন, কাঠ কখনো ইটে রূপান্তরিত হয় না। এখানেই সমস্যা। এ থেকে শিক্ষা এটুকুই যে, শেষ-বাজারের নিম্নমানের সবজি সাশ্রয় দামে কিনলে বা কুড়িয়ে পেলে যত তেল-মসলা খরচ করেই রান্না করা হোক না কেন, রাধুনী যত ভালোই হোক না কেন, রসনা তৃপ্ত হয় না, ব্যঞ্জন বিস্বাদ হতে বাধ্য। বাস্তবে আমরা এই বিস্বাদ ব্যঞ্জনকে কখনো কাঁচা নুন যোগ করে, কখনো হলুদের রং মিশিয়ে, কখনো মুখের জোর খাটিয়ে সুস্বাদু করতে চাই। বাস্তবে কি এ-কাজ কখনো সার্থক হয়? তবুও শিক্ষক যত খারাপই হোক যদি ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিত, মন দিয়ে পড়াতো, প্রশিক্ষণটা কাজে লাগাতো, শিক্ষাকে বাণিজ্যিকিকরণ না করতো, প্রাইভেট টিউশনির রমরমা ব্যবসা না ফাঁদতো, তাহলে পরিস্থিতির কিছুটা হলেও উন্নতি হতো। কিন্তু বিধি বাম। পত্র-পত্রিকা ঘাটলে, সোস্যাল মিডিয়া খুঁজলে দেখা যায় আমরা পচা কাদার পাঁকে পড়ে অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছি আর হাঁপাচ্ছি। বলা যায়, 'দিল্লি হনুজ দুরস্ত'। বলতেও না পারি, সইতেও না পারি অবস্থা। বললেই 'খালু বেজার হয়'। 'স্বজাত বিদ্বেষী' বলে মানুষ আমাকে গালি দেয়। না বলে উপায়ও নেই। শিক্ষার উন্নতি

তো এদেশের প্রতিটা সচেতন মানুষই চায়। শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে জাতীয় উন্নতি কীভাবে সম্ভব? আমি নিজের উদ্যোগে অনেক স্কুলে সশরীরে গিয়েছি। পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক খবর বিশ্লেষণ করেছি। শিক্ষকদের এখন শুধু বেতন বাড়ানোর দিকে ঝোঁক। সরকারি এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের রাত-দিন ঐ একটাই চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে 'কীভাবে বেতন বাড়ানো যায়'। তাদের এ দাবির সাথে আমিও অনেকটাই একমত। তবে তাদের এই সুবিধা আদায়ের দাবি কখনো একমুখী হতে পারে না। শিক্ষাদানে তাদের আগ্রহ ও দায়িত্বের কথাটাকেও বিবেচনায় আনতে হবে। আমি 'কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলে ডাকতেও' চাই না। অন্য কোনো পেশাজীবী ও শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ববোধ কি এক হওয়া উচিৎ? একজন নিম্নমানের শিক্ষক শিক্ষাঙ্গণে ঢুকলে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। কমপক্ষে ত্রিশ বছর ধরে এ নষ্টকর্ম চলতে থাকে। সুখের বিষয় যে, এসব নিয়ে চিন্তাধারা-বিশ্লেষণ এদেশে খুব কম করা হয়। এজন্যই রক্ষে। বেতন কম বলে দায়িত্বহীনতাকে আদৌ মেনে নেওয়া যায় না। ক্রিকেট খেলার হারজিত কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে। ফুটবল খেলার হারজিত নব্বই মিনিটের মধ্যেই বোঝা যায়। ভালো শিক্ষক বা খারাপ-বাতিল শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল ভালো হোক বা খারাপ হোক পরিণতি বুঝতে বেশ ক-বছর সময় লাগে। আমরা কাজে-কম্মে দূরদর্শী হতে বড্ড অনীহ। আমাদের অতীতের কর্মফল এখন আমরা দেখতে পারছি। ভালো দায়িত্বশীল শিক্ষক ভালো বেতনে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দিতে পারিনি এটা আমাদেরই ব্যর্থতা। আশার কথা যে, সরকার ইদানীং সরকারি প্রাইমারি স্কুলে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করেছে। তারা এবং আগে নিয়োগপ্রাপ্ত হাতে-গোনা কিছু মানসম্মত শিক্ষক প্রথমে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়েই শিক্ষাঙ্গণে থাকবে। সরকার এ কাজ অব্যাহত রাখলে ভবিষ্যতে এ থেকে আমরা ভালো ফল পেতে পারি। তবে এ কাজে ইতোমধ্যেই আমরা অনেক দেরি করে ফেলেছি।

পরিবেশ ফিরিয়েও আমরা শিক্ষার অনেকটা উন্নতি করতে পারি। সে-কাজেরও অগ্রগতি আমরা করিনে, বাস্তবমুখী ফলপ্রসু কোনো ব্যবস্থা আমরা আমলে নিইনে। বাস্তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধানের অবস্থাও খুব খারাপ। অধিকাংশ শিক্ষক ও তত্ত্বাবধয়কের দায়িত্ববোধে ঘাটতি আছে। স্কুল কমিটিও তার মূল দায়িত্ব পাশ কাটিয়ে নানাবিধ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ও রাজনৈতিক (?) গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগী থাকে। থানা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা-কর্মকর্তাদেরও খাতাকলমের কাজ ফেলে প্রতিনিয়ত অসংখ্য স্কুলের শিক্ষামানের তদারকি করা সম্ভব হয় না। এভাবেই প্রতিটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাথাভারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপ

নিয়েছে। প্রাইমারি স্কুল ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোর তাই বর্তমান অবস্থা একটুও ভালো না। ভুগছে কোমলমতি অবুঝ ভবিষ্যত প্রজন্ম।

পরিবেশের কথা বলতে গেলে শিক্ষক নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গণ নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি, পাঠ্যসূচি নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গনে সামাজিক-রাজনৈতিক টাউটদের পদচারণা যতক্ষণ বন্ধ করা না যাবে, ততক্ষণ যে যত কথাই বলি, শিক্ষার এ দীনহীন অবস্থা থেকে মুক্তি নেই। অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে পরামর্শ দিতে শুনেছি, যতক্ষণ দম্পতি এইডসমুক্ত না হয়, ততক্ষণ সন্তানের জন্ম না দিতে। অথচ সব রাজনৈতিক দলই শিক্ষাঙ্গণ নিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে ইনিয়ে-বিনিয়ে একটাই নীতিমালা বজায় রাখার প্রতিজ্ঞা করেছে যে, ‘তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই’ই। এভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। পরস্পর বিপরীতমুখী ঘটনা ঘটা ‘সম্ভাবনা তত্ত্ব’ অনুযায়ীও অসম্ভব। ‘চোরকে বলবো চুরি করতে আর সাধুকে বলবো সাবধান থাকতে’- এটা হয় না। অথচ এই অসম্ভবকে সম্ভব করার কাজে প্রজেক্টের নামে রাষ্ট্রীয় বিশাল অর্থসম্পদ ব্যয় করি, বিশাল অঙ্কের সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি পুষি, মুখে মুখে সাঁতার শেখায়; সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ ব্যয় করে নিজেদের সুবিধার্থে শিক্ষাঙ্গণে দলবাজ, ধান্দাবাজ, অনুগত সন্ত্রাসী তৈরি করি; আরো কত কি করি! আমাদের আত্মবিশ্লেষণ বড় প্রয়োজন। অভিভাবকমহলকেও দেখেছি তাদের অনেকেই শিক্ষা বোঝেন না। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে আত্মসচেতনতা অনেক কম। শিক্ষার পরিবেশ পরিবর্তন করতে হবে– এ ধরনের অভিব্যক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় নেই বললেই চলে। সে যাই হোক, আমি তো আর স্কুল-মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষকদের মধ্য থেকে বাতিল শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করে ছাটাইয়ের ব্যবস্থাপত্র দিতে পারিনে। এতে আবার যে তদবিরের মাধ্যমে তারা এসেছিল সেই তদবির বাড়বে, একটা অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হবে, শিক্ষকদের একটা বড় অংশ কর্মহারা হবে। বরং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যতটা মান বাড়ানো যায়, সে চেষ্টা করে, পরিবেশের উন্নতি করে এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা জোরদার করে যতটা কর্মসাধন করা যায় সেটাই উত্তম। এতে শিক্ষকদেরকে কাজের দায়িত্ব নিয়ে সকল পক্ষের ভালোর জন্য এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষা নিয়ে দলবাজি বন্ধ করে ক্রমশ জাত শিক্ষকদের হাতে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে ছেড়ে দিতে হবে।

প্রতিটা এলাকার স্কুল-মাদ্রাসাগুলো দেখভালের জন্য আমরা সেই সমাজ থেকে রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত নয়, অথচ সততা আছে ও সমাজসেবা করতে

চায় এমন সরকারি/বেসরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সুশিক্ষিত শিক্ষানুরাগীদেরকে কাজে লাগাতে পারি। পার্শ্ববর্তী কোনো কলেজের বয়ঃজ্যেষ্ঠ কোনো অরাজনৈতিক এক বা একাধিক শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারি। এদেরকে নিয়ে একটা টীম তৈরি করতে পারি। জেলা ও থানা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা ও জেলা প্রশাসক এ টীমে থাকবেন। সবাই মিলে একটা যুতসই পরিকল্পনা করবেন। এ টীমের সদস্যরা অভিভাবক-শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়বেন। অভিভাবকদের সচেতন সম্পৃক্ততা ছাড়া বর্তমান সময়ের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া কখনোই সম্ভবপর হবে না। এ টীম ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ককে সক্রিয় করবেন। ত্রিপক্ষকে নিয়মিত উপদেশ, নির্দেশনা দেবেন; অভিভাবকদের আত্মসচেতন করে তুলবেন। অভিভাবকমহলকে নিয়মিত স্কুল-মাদ্রাসায় এসে সন্তানের শিক্ষা-কার্যক্রমের অবস্থা দেখতে বলবেন। টীম শিক্ষাঙ্গণের দৈনন্দিন সার্বিক কার্যক্রম, শিক্ষাদান কার্যক্রম তদারকি করবেন। সুশিক্ষিত লোকজনকে নিয়ে ক্রমশই টীমে সদস্যসংখ্যা বাড়াবেন। সামাজিক দ্বন্দ্ব-কোন্দল-ফেসাদ এড়িয়ে চলবেন। একই সমাজে বসবাস করাতে সমাজশিক্ষার সার্বিক কার্যক্রম তদারকির কাজ তাদের জন্য সহজ হবে। পুরো কার্যক্রমকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে রাখতে হবে। সর্বজনীন এসব কাজকে দলীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ করলে ফল ভালো হয় না, এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে।

সমাজের সুশিক্ষিত অংশকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে পারলে, শিক্ষার উন্নতির কাজে তাদের এগিয়ে আনতে পারলে, তাদের মনে সমাজসেবার উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে পারলে আমাদের বিদ্যমান পুরো জনগোষ্ঠীকে এখনো সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করা অসম্ভব ও অবাস্তব কোনো কাজ নয়। সংশ্লিষ্ট সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, এটাই কামনা।

(প্রকাশ: ১২ মার্চ ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?’

বিগত ৮ এপ্রিল ২০২৩ ‘দৈনিক ইনকিলাব’ পত্রিকায় ‘আলেমদের ঐক্য সময়ের অনিবার্য দাবি’ শিরোনামে তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী একটা নিবন্ধ পড়লাম। আমি কোনো মৌলবি-মাওলানা নই, জন্মসূত্রে মুসলমান। তাই অস্তিত্বের সংকট উপস্থিত হলে দু-কথা না বলে পারিনে। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা আমার বলার আছে বলেই কলম ধরেছি। উল্লিখিত নিবন্ধ থেকে প্রথমত কিছু কথার উদ্ধৃতি দিতে হবে। নিবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, ‘দেশে কম-বেশি, ছোট-বড় মিলে আলিম সংখ্যা চল্লিশ লাখের বেশি। বিশেষত কওমি অঙ্গনের অধিকাংশ আলিম মসজিদ ও মাদ্রাসাকেন্দ্রিক খেদমতে নিয়োজিত আছেন। আমাদের দেশের বর্তমান বাস্তবতা হলো আলিমগণ আর্থ-সামাজিকভাবে অনেক পিছিয়ে। ... তারা মৌলিক ও বড় বিষয়গুলোর প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন করেন। অথচ এগুলোর প্রতি উদাসীনতা উম্মার অস্তিত্ব ও সামগ্রিক সত্তাকে বিপন্ন করে দেয়। অনৈক্যের কারণে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব আজ এক দিশেহারা অথর্ব জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের বর্তমানে ইসলামের নামে দেশে মোট ঊনপঞ্চাশটি দল ও উপদল রয়েছে। তবে এ গণনার বাইরেও ইসলামের নামে কিছু দল ও দরবার আছে। ...বাংলাদেশের আলিমদের বর্তমানে বড় দুর্দিন যাচ্ছে। দেশের শিক্ষানীতিতে ইসলামি শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটেছে’ ইত্যাদি।

অনেক মূল্যবান কথার মধ্যে আমি শুধু দু-একটি বিষয় নিয়ে এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু বলতে চাই। একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, আমরা প্রতিনিয়ত যত কথা বলি, সেগুলোর ভালো দিকগুলোকে যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষ আমলে না নেয়, বাস্তবে প্রয়োগ করতে না পারে, চিন্তাধারার গঠনমূলক উন্নতি না করতে পারে, তখন কথার কোনো মূল্য থাকে না, সে-কথা না-বলারই নামান্তর। আমরা তো এদেশে এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। নিবন্ধের মধ্যে মূল তিনটি বিষয় হলো: ‘বাংলাদেশের আলিমদের বর্তমানে বড়ই দুর্দিন যাচ্ছে’; ‘অনৈক্যের কারণে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব আজ এক দিশেহারা অথর্ব জাতিতে পরিণত হয়েছে’ ; এবং মুসলমানদের শিক্ষা। তিনটি বিষয়ই পরস্পর নির্ভরশীল, ‘কান টানলে মাথা আসার মতো’। একটির সাথে অন্যটির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা সম্মানীত মৌলবি-মাওলানাদের ইসলামি সমাজব্যবস্থার নেতা বলে মানি। আমরা সমাজের আম জনতা ইসলামি নিয়মনীতিতে এদের কথাকে বিশ্বাস করি। এদেশে ইসলামকে এরাই টিকিয়ে রেখেছেন। সুস্থ চিন্তাভাবনা করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে এদেরকেই পুরো মুসলমান জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে হবে।

মুসলমানদের উন্নতি হলে দেশেরও উন্নতি হবে। সত্য যে, অধিকাংশ মুসলমান ধর্মীয় নিয়ম-নীতি, অনুশাসনসহ অনেক কিছুই পড়েন না, বোঝেন না। শুধু মৌলবি-মাওলানাদের কথা শুনে, বাজার থেকে দোয়া-দরুদের চটি বই পড়ে জীবন পার করে দিচ্ছেন। এছাড়া ইসলামি জীবনব্যবস্থা যে মানুষ সৃষ্টি, পৃথিবীতে মানুষের কর্মপদ্ধতি, চিন্তা-চেতনা ও বৈশিষ্ট্যের একটা পরিপূর্ণ জীবনবিধান, যা প্রতিপালন করলে ও মেনে চললে আমাদের নৈমিত্তিক সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, এটাকে আমরা মন থেকে কখনই মেনে নিতে পারিনে। আবার এদেশের মৌলবি-মাওলানারাও সে-বিষয়গুলোর প্রতি সুন্দর ও গঠনমূলকভাবে আলোকপাত করেন না। কেউ ধর্ম নিয়ে রুজি-রোজগার করেন, কেউবা রাজনীতি করেন, কেউ আবার অসংখ্য সাগরেদ জড়ো করে নিজেকে বড় মানের পির-দরবেশ বলে পরিচিত করেন।

এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মৌলবি-মাওলানাদের চিন্তাধারার কতটুকু উন্নতি করতে পেরেছি? এক সময়ে প্রকৃতি ও কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে নিজের শরীর ও পার্শ্ববর্তী চারদিক তাকালেই আমরা সবকিছুর মধ্যেই বিজ্ঞান, টেকনোলোজি, শিল্পসামগ্রী, ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে পাই। এসব এড়িয়ে চলতে গেলে জীবনযাপন ও কর্ম অচল ও অকেজো হয়ে যায়। আমরা বিজ্ঞান, টেকনোলোজি ও ব্যবসাভিত্তিক কোনো লেখাপড়া করবো না, শিল্পপ্রতিষ্ঠান তৈরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করবো না, শুধু অন্যের তৈরি করা শিল্পপণ্য বসে বসে খাবো, অন্যের সেবা ভোগ করবো, অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হব, অশিক্ষা-কুশিক্ষাবশত নিজেদের মধ্যে অনৈক্য তৈরি করবো আর বেহেশত পাবার আশায় নামাজ-রোজার মতো আনুষ্ঠানিক ইবাদতে মশগুল থাকবো। তাহলে কি দুনিয়াদারি চলে? আল্লাহর দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হয়? আমরা কি টিকে থাকতে পারি?

মুসলমানদের মধ্যেও একটা অংশ তৈরি হয়েছে, যারা নামে মুসলমান কিন্তু চিন্তা-চেতনায় মুসলমানি-বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত। এদেরকে কাজীর হিসাবের খাতায় ধরা যায়, গোয়ালে ধরা যায় না। আমরা তাদের সামনে ইসলামি পথ, বৈশিষ্ট্য, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। আমরাও কুরআন-হাদিসে নির্দেশিত 'সহজ-সরল' পথ থেকে দূরে চলে এসেছি। যত কিছুই বলি আমরা নিজেদের দায় এড়াতে পারিনে। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় এতটাই পিছিয়ে গেছি যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্যবসা-বণিজ্য নিয়মনীতি মেনে করতে পারিনে; মুসলমান গরিব, অনাথ-অসহায়দেরকে নিজের সম্পদ থেকে সাহায্য করতে পারিনে, আমরাই

পরমুখাপেক্ষী হয়ে গেছি। নিজেরা গরিব বলে মনটাও ছোট হয়ে গেছে। অন্যভাবে বলা যায়, মন-মানসিকতায় ছোট হয়ে গেছি বলে গরিব হয়ে গেছি। মুসলমানরা ত্যাগী জাতি হবার কথা, অথচ আমরা 'দেওয়ান সা'ব' থেকে 'নেওয়ান সা'ব'-এ পরিণত হয়ে গেছি। নামে মুসলমান 'আল্ট্রা-মডার্ন' যে ধণিক শ্রেণি আমাদের আছে, তারাও ইসলামি নিয়ম-নীতি মেনে চলেন না, বেশি মুনাফার আশায় প্রতিটা শিল্পপণ্য ও ব্যবসায়ী-পণ্যের দাম বাড়ায়, পবিত্র রমজান এলে সিন্ডিকেট করে আরো দাম বাড়ায়। ব্যবসার নামে, কখনো রাজনীতির কাধে ভর করে তারা জনগণকে শোষণ করে, টাকার পাহাড় গড়ে, ইসলামি আদর্শ রক্ষা করে না। ইসলামি ত্যাগের আদর্শ ভুলে ভোগবাদের নেশায় পাগলপ্রায় হয়ে টাকার পিছনে ছোটে। যে টাকা ইসলামি উম্মার কল্যাণে কোনো কাজে লাগে না, মুসলমানদের কাছে সে-টাকার কোনো মূল্য নেই। 'কারুণের ধন-সম্পদ পিঁপড়েয় খায়, কুপথে উড়ে যায়', 'বেগমপাঁড়া গড়া'র কাজে ব্যয় হয়। এসবই আমাদের নিখাদ বাস্তবতা।

এদেশে মৌলবি-মাওলানারা সোজাসাপটা পথে কামিয়াবি হাসিল করতে চায়। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা আর সোজাসাপটা না। উৎপাদনব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পব্যবস্থা, অর্থনীতি, জীবনযাপন জটিল অবস্থা ধারণ করেছে। প্রবলেম সলভিং এ্যাবিলিটি অর্জন করতে হবে, এ্যানালাইটিক্যাল এ্যাবিলিটি অর্জন করতে হবে; বিজ্ঞান পড়তে হবে, শিখতে হবে, টেকনোলোজি শিখতে হবে; মঙ্গল গ্রহে যাবার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। কুরআন-হাদিসের পাশাপাশি বিজ্ঞান-ব্যবসায় শিক্ষাসহ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। ইসলামি অর্থনীতি বুঝতে হবে। লক্ষ লক্ষ অবুঝ শিশু মাদ্রাসায় পড়ছে। প্রত্যেকের মধ্যে অবিকশিত অত্যধিক সম্ভাবনা রয়ে গেছে। আমরা লক্ষ লক্ষ অপ্রস্ফুটিত গোলাপকে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ না দিয়ে কুঁড়িতেই পোকায় খাইয়ে দিচ্ছি। এটাও এক ধরনের অপরাধ। মাদ্রাসার শিক্ষকরা আল্লাহর কাছে এ অপরাধের জন্য কী জবাব দেবেন! এটা সরকারেরও দায়িত্ব। কোমলমতি এ অবুঝ শিশু-কিশোরদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তারা নিশ্চয়ই সৎ ও কর্মে নিষ্ঠাবান হবে। তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ভার দিতে হবে। তাদেরকে অফিস ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তুলতে হবে। এদেশে নব্বইভাগ জনগোষ্ঠীই মুসলমান। এদেশের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হলে মুসলমানরাই লাভবান হবে, গরিবানা হাল দূরীভূত হবে। মুসলমানরাই দানের মাধ্যমে পরকালের কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে পারবে। অনৈক্য ও দুদর্শা লাঘব হবে। মৌলবি-মাওলানারা তখন দান গ্রহণের পরিবর্তে দান করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবেন। ছোটবেলায় পাঠ্য বইতে

পড়েছিলাম, 'নবীর শিক্ষা কোরোনা ভিক্ষা মেহনত করো সবে' নীতিকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এজন্য সম্মানীত মৌলবি-মাওলানাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। ইসলামের জীবনবিধান, মর্মবাণী মানুষকে জনে জনে বোঝাতে হবে। কুরআন ও হাদিসের পরতে পরতে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা ও চিন্তাচেতনায় দুনিয়াদারির কর্ম ও সেবার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের যে ধর্মদর্শন প্রতিষ্ঠিত, আমরা ত্রোয়োদশ শতাব্দির পর থেকে সেখান থেকে ক্রমশ সরে এসেছি। আমরা কাজে-কর্মে পরকালকেই একমাত্র গুরুত্ব দিতে গিয়ে নিজেদেরকে কর্মহীন জিন্দা-লাশের পর্যায়ে নিয়ে গেছি। 'শিক্ষা', 'দীন', 'আলেম', 'ইবাদত', 'কর্মের বিবরণ (আমলনামা)' 'মাদ্রাসা শিক্ষা' প্রভৃতি শব্দের ভিন্ন অথবা আংশিক ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছি। তাই সাধারণ মানুষের অনেকেই জীবন বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ার সৎকর্ম না থাকলে যে পরকালের কল্যাণ থাকে না, সৃষ্ট জীব ও সৃষ্টির সেবা না থাকলে যে দুনিয়া সৃষ্টি বৃথা হয়ে যায়– এসব কথা আমরা ভুলেও চিন্তা করি না। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সক্ষমতা বিলীন হতে চলেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভুলগুলো চলতে থাকলে আগামী আনুমানিক বিশ বছরের মধ্যে মুসলমানদের অবস্থা আরো সঙ্গিন, নির্জীব ও দুর্দশাগ্রস্ত রূপ ধারণ করবে। তখন আমি থাকবো না জানি। পরিবেশ এত বিরুদ্ধ হয়ে উঠবে যে, আমার মতো কেউ এমন লেখা লিখতেও পরিবেশ পাবে না। সবই আমাদের কর্মফল। আমরা নিজের দিকে নিজে তাকিয়ে দেখিনে। আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নিজের বিশ্লেষণ করতে বড্ড ভয় পাই। 'চেরাগের গোড়ায় অন্ধকার' রয়ে যায়। অন্যের দোষ অন্বেষণ করি, তাই নিজেদের মধ্যে অনৈক্য বাড়ে। এগুলো আমাদের স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ। তবে আমরা যেন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বভাবের দায় ইসলামি জীবনব্যবস্থার উপর না চাপায়, এটা অন্যায় হবে। অথচ বর্তমান যুগে তাই-ই হচ্ছে। যদি প্রশ্ন করি, এগুলো কীসের আলামত? কুরআন ও হাদিসে তো সুনির্দিষ্টভাবে শুধু একটি পথের কথা বিস্তারিত ও লিখিতভাবে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। তারপরও এহেন অবস্থা হলো কেন? শুধু অনৈক্যের কারণে নয়; যুগোপযোগী শিক্ষার অভাব, কূপমণ্ডূকতা, কুশিক্ষা, গরিব-মিসকিনে পর্যবসিত হওয়া প্রভৃতি কারণে মুসলমান জাতি 'এক দিশেহারা অথর্ব জাতিতে পরিণত হয়েছে'।

অতীতের ভুলগুলোকে মনেপ্রাণে শুধরে নিতে হবে। ইসলাম একটি 'পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা', ওটা কোনো রাজনীতি নয়; রাজনীতি জীবনব্যবস্থার একটা অংশ

মাত্র। নিজেদের চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে, রাজনীতি (ওটা রাজা হওয়ার নীতি) থেকে দূরে থাকতে হবে, কর্মবিমুখ শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, শিক্ষাব্যবস্থায় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ত্রোয়োদশ শতাব্দীর মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর উপর ভর করে দুহাত পকেটে গুজে অলস দিন পার করলে চলবে না। মাথাটাকে কাজে লাগাতে হবে, কর্মঠ হাত দুটো পকেট থেকে বের করে কর্মের জন্য প্রসারিত করতে হবে। শিক্ষা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করতে হবে। ইসলামে সম্পদের জিম্মাদার হবার তো কোনো বাধা দেওয়া হয়নি, ব্যবসা করতেও কোনো বাধা নেই। বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তা হলে দোষ কী? নিজের রুজি ছাড়াও অন্যের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে প্রভূত কল্যাণের ভাগিদার হওয়া যায়। মুসলমানদের মূলত তিনটি কাজ করতে হবে: ১. জীবনমুখী শিক্ষা; ২. কর্মমুখী শিক্ষা; ও ৩. মুসলমানিত্বের বৈশিষ্ট্য-সঞ্চারক শিক্ষা। এই তিনটি শিক্ষার বাস্তবায়নের পথে কি কি বাধা আছে তাও জানি। এ বাধা কোনো বাধা নয়। বাধা অতিক্রমের জন্য ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ঠ। একমাত্র এই তিনটি শিক্ষা মুসলমান জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। নইলে বিশ্বময় মুসলমানদের অন্যের গলগ্রহ হয়ে অন্যের অনুগ্রহে দুর্দশাগ্রস্ত জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হবে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হবে। এই বোধ আমাদের সম্মানীত মৌলবি-মাওলানাদের মধ্যে আসতে হবে।

অতীতকে নিয়ে বেশি আলোচনা না করে ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে নিজেদের নেওয়া সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সকল বিষয়ে একমত হওয়া যাবে কিনা, জানিনে। যুগোপযোগী শিক্ষা না থাকলে, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে না পারলে ঐকমত্যে পৌঁছানো কখনোই সম্ভব হবে না। বিশেষ করে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে একমত হতেই হবে। মুসলমানদের উন্নতির ভিত নিশ্চিতভাবে এখানেই লুকিয়ে আছে। উন্নতি মানে মন-মানসিকতার পজিটিভ পরিবর্তন। সেখানে আবেগ প্রবণতা, গোঁড়ামি ও অজ্ঞতাকে কোনোরকম প্রশ্রয় দিলেই পশ্চাদপদ মুসলিম জনগোষ্ঠী ক্রমশই বিলীন হবার পথে চলে যাবে।

(প্রকাশ: ২০ এপ্রিল ২০২৩, দৈনিক ইনকিলাব এবং ২৮ এপ্রিল ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

তমসা আসিছে ঘিরে সময় যে বয়ে যায়

বিগত ৮ এপ্রিল ২০২৩ ‘দৈনিক ইনকিলাব’ পত্রিকায় ‘আলেমদের ঐক্য সময়ের অনিবার্য দাবি’ শিরোনামে তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী নিবন্ধের ভিত্তিতে ২৮ এপ্রিল ২০২৩ ‘দৈনিক যুগান্তর’ উপসম্পাদকীয়তে প্রকশিত ‘রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?’ শিরোনামে আমার কিছু কথা তুলে ধরেছিলাম। অনেক কথার মধ্যে যা বলেছিলাম মোটামুটি এরকম: ইসলামি রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দল ও গ্রুপের সংখ্যা অগণিত। বর্তমান বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও ব্যবসাভিত্তিক জীবনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ধারাকে বুঝতে হবে, পরিবর্তিত অবস্থাকে মনেপ্রাণে মেনে নিয়ে করণীয় করতে হবে। মুসলমানদের তিনটি কাজ করতেই হবে: ১. জীবনমুখী শিক্ষা; ২. কর্মমুখী শিক্ষা; ও ৩. মুসলমানিত্বের বৈশিষ্ট্য-সঞ্চারক শিক্ষা। বিভিন্ন ইসলামি দল বা গ্রপের সাথে আলোচনা করে একটা সুচিন্তিত ও অভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকলে নিজ নিজ কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবে। তবে যুগোপযোগী শিক্ষা না থাকলে, লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতিও নির্ধারণ সম্ভব নয়। আজকের এই নিবন্ধে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে আরো কিছু কথা বলবো। কোনো চলমান কলাম লিখলে হয়তো পূর্বাপর এত যোগসূত্র উল্লেখ করতে হতো না।

মাদ্রাসা শিক্ষায় দুটো ভাগ– আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা; এবং কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা। উভয় শিক্ষাব্যবস্থা শহরে ও গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে গেছে। এসব মাদ্রাসায়ও অনেক মেধাবী ও সম্ভাবনাময় ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। এ দেশের প্রায় সব গ্রামে মসজিদকে কেন্দ্র করে অন্তত মক্তব ও কওমি শিক্ষা বিস্তার লাভ করেছে। সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার মান ক্রমশই নিম্ন থেকে নিম্নতর হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশ বেকার কিংবা ছদ্ম-বেকার। ভুক্তভোগী ছাড়া এ অবস্থার ভোগান্তি বলে অনেককেই বোঝানো যাবে না। আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার মান সে তুলনায় বরং আরো খারাপ। আরবি ও ইসলামি শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দিলেও সে-শিক্ষার মানসহ জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার মানের গতি নিম্নমুখী। জীবন পরিচালনা করতে শুধু আরবি ও ইসলামের ইতিহাস শিখবো, এটা ভাবাবেগ তাড়িত শিক্ষাভাবনা ছাড়া গঠনমূলক ভাবনা বলা যায় না। অথচ আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যবসা ও বিজ্ঞান শাখায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা আছে, জানি। কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা আরবি, ইসলামি শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে লেখাপড়া করেই জীবন পার করে দিচ্ছে। লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকা, আর লেখাপড়া করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এক কথা নয়।

এদেশের যেসব ছাত্রছাত্রী মাদ্রাসায় ভর্তি হচ্ছে, তাদের দিয়েই অনেক ভালো কিছু করা সম্ভব। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়ার করণে মাদ্রাসাতেই ছাত্রছাত্রীদের মনমতো করে গড়ে তোলা আরো সহজ হয়ে গেছে। সাধারণ স্কুল-কলেজের সাথে সুস্থ প্রতিযোগিতা করে মাদ্রাসা শিক্ষায় ভালো মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যেতে পারে। প্রয়োজন পরিবেশ উন্নত করা, মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা-কর্তৃপক্ষকে সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসা। এটা করতে পারলে সাধারণ স্কুল-কলেজের অনেক ছাত্রছাত্রী মাদ্রাসা শিক্ষায় স্বেচ্ছায় ভর্তি হতো। আমরা নিজেরা উদ্যোগী হই না, সব কিছুর দায় সরকারের উপর চাপিয়ে দিয়ে নীরবে বসে থাকি। এটা ঠিক নয়। প্রয়োজন শিক্ষকদের সুস্থ চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হওয়া এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসনের আগ্রহ ও গতিশীল শিক্ষাব্যবস্থাপনা। মাদ্রাসাশিক্ষার গঠনমূলক উন্নয়ন এ মুসলিম ভূখণ্ডের সামগ্রিক উন্নয়ন ও টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের চৈতন্যোদয় হওয়া ও ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার। এটা সময়ের দাবিও বলা যায়। এ বোধশক্তি মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের যত তাড়াতাড়ি ফেরে, দেশ ও উম্মার জন্য ততই মঙ্গল।

এ দেশের কওমি মাদ্রাসাশিক্ষা দেওবন্দ মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে শুরু হয়েছিল। তখন হিন্দুত্ববাদী জমিদার ও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় মুসলমান নিধন ও দমন থেকে ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ও টিকে থাকার জন্য এ শিক্ষাব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য চালু করা হয়েছিল। সে সময়ে এটার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ছিল। তখনকার সমাজব্যবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা, জীবনব্যবস্থা, পেশা ও কর্ম বর্তমান সময়ের মতো এত উন্নত, শিল্পপণ্যসমৃদ্ধ, গতিশীল ও টেকনোলজি-নির্ভর ছিল না। কওমি শিক্ষাব্যবস্থার নীতিনির্ধরকদের এসব বাস্তবতাকে সামনে রেখে যুগোপযোগী করে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হতো। এ কাজে তারা পুরোটাই ব্যর্থ হয়েছে। এতে ভুগছে লক্ষ লক্ষ অবুঝ শিশু-কিশোর। তারা শিশু-কিশোরদের জীবন ও অমিয় জীবনীশক্তিকে ধ্বংস করে ছাড়ছেন। তাদের শিক্ষার মান তো বেজায় খারাপ। জীবনমুখী শিক্ষা নেই, কর্মমুখী শিক্ষাও নেই, সময়ের সাথে শিক্ষার গতিশীলতা নেই। প্রতিনিয়ত তাদের সাথে চলছি, কাজ করছি, দেখছি ও ভাবছি। তারা নিজেরা যত আত্মপ্রসাদেই উদ্বেলিত হোক, মাতৃভাষা বাংলাটাও ভালোমতো লিখতে ও বলতে পারেন না, সে ব্যবস্থাও তাদের নেই। এক পৃষ্ঠা বাংলা পড়ে মর্মোদ্ধার করার সাধ্য তাদের নেই। তাহলে কুরআন-হাদিস ও ইসলামি জীবনদর্শন পড়ে ভাবা, মর্মোদ্ধার করা ও মানুষের কাছে তুলে ধরা

কতটুকু সম্ভব? এর পরিণতি ও ভোগান্তি কিন্তু আমাদের সমাজে নিত্য বিদ্যমান। এসব কথা লিখলেই তো আমাদের সম্মানীত দীনি ভাইয়েরা অসন্তুষ্ট হন। তর্কে জড়িয়ে যান। আমাদেরকে এড়িয়ে চলেন, কখনো কটু কথা বলেন। কিন্তু নিজেদেরকে একবার ভেবে দেখেন না, পথে আসেন না। তারা ইসলামি পোশাক পরে দেহকে সাজান, কিন্তু জীবনকে সাজান না। এসব দেখা ও ভাবার মতো লোক এদেশে ক-জন আছেন? আমি তো দেখছি কওমি মাদ্রাসা থেকে পাশ করে অধিকাংশ আদম সন্তান মসজিদ-মাদ্রাসার খেদমতে হাজির হতে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের পিয়ন অথবা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে। এরা তো আজীবন শোষিতই হবে! আমার মতো কিছু মাস্টারসাহেব পত্রিকার পাতায় লিখে এদের রক্ষা করবে কেমন করে! এরা প্রকৃতির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে কেমন করে? সমস্যা চিহ্নিত করতে না পারলে সমাধান আসবে কোত্থেকে? তাদেরকে বিষয়গুলোর বাস্তবতা বেশি বুঝতে হবে। আমি বলতে চাই, কুরআনে উল্লিখিত সকল বিষয়, যেমন– ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আইন, দর্শন, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, হিসাববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রভৃতি সকল বিষয়ে মুসলমানদের জ্ঞানার্জন করতে হবে; উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। দেশ ও শিল্প-ব্যবসা পরিচালনায় সকল পদে যোগ্যতার সাথে কাজ করার দক্ষতা আনতে হবে। আমি দীনি শিক্ষা বলতে এ সকল (অল ইনক্লুসিভ) শিক্ষাকেই বুঝি। জীবনের বাস্তবতা না বুঝলে অন্য কোনো শোষক গোষ্ঠীর কাছে শোষিত হতে হতে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। এটা প্রাকৃতিক নিয়মের কারণেই হবে। ইসলামি জীবনব্যবস্থা বা দুনিয়াদারি যে মানুষের সৃষ্টি, পৃথিবীতে মানুষের কর্মপদ্ধতি, চিন্তা-চেতনা ও বৈশিষ্ট্যের একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন ও তার বাস্তব প্রয়োগ- তা তাদেরকে জানতে হবে ও বুঝতে হবে। প্রতিটা বিষয়ের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করে হাত গুটিয়ে ঘরের কোণে অলস মেধা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। খোলস ছেড়ে গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। অকর্মণ্যতা ও কূপমণ্ডুকতা, দলবাজি শপথ নিয়ে পরিত্যাগ করতে হবে। এরা যে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, এটা এদেরকে বুঝতেই হবে। যুগোপযোগী জীবনযাপন নির্বাহ করতে হবে, চলতি বড় বড় পেশাকে দুনিয়াদারি পরিচালনার জন্য বেছে নিতে হবে, কেউবা টেকনিক্যাল পেশায় যাবে। প্রকৃত মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্প প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে। গরিব, অসহায় মুসলমানদের পাশে দাঁড়াতে হবে; তাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার বন্দোবস্ত করতে হবে। নির্দেশনা মোতাবেক দুনিয়াদারি কাজের মাধ্যমে ইবাদতের পথকে বেছে নিতে হবে। অশিক্ষা, অকর্মণ্যতা, ধর্মব্যবসা ও বিভেদ মুসলমানদের চরম ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে; মুসলমান জাতি এমশই ভূতের

মতো পিছে হাঁটছে− এ বোধ আমাদের অন্তরে জন্মাতে হবে। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় বাস করে পুরোনো জীবনব্যবস্থা মনের মধ্যে পুষে রাখা যাবে না। মোবাইল ফোন, গুগল নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার চালাতে ভালো লাগে, তৈরি করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আগে মন মানসিকতা ও শিক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। অশিক্ষা ও আর্থিক দীনতার কারণে আমাদের প্রতিবেশী দেশের রোহিঙ্গাদের করুণ পরিণতির কথা গভীরভাবে ভাবতে হবে।

মাদ্রাসায় লেখাপড়া শিখে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন পদে সুনামের সাথে কাজ করতে হবে। প্রতিযেগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম সারিতে থাকতে হবে। যে কোনো মূল্যে শিক্ষার গুণগত মান অর্জন করতে হবে। বিজ্ঞানী হতে হবে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, কৃষিবিদ, বিজ্ঞান-গবেষক হতে হবে। টেকনিক্যাল শিক্ষায় পারদর্শী হতে হবে। ব্যবসায় ও শিল্পব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত হতে হবে। শিল্পোদ্যোক্তা হয়ে দেশে ব্যবসা ও শিল্প স্থাপন করতে হবে। ইসলামি নীতিমালা বজায় রেখে জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবসা ও শিল্পপণ্যের ব্যয় নির্ধারণ করতে হবে। সমাজ-উন্নয়নমূলক ও দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। শিক্ষার মান অন্য যে কোনো দেশের শিক্ষিত লোকের সাথে তুলনীয় হতে হবে। শুধু ছয়-সাতটা করে নোট মুখস্তের মাধ্যমে সার্টিফিকেটসর্বস্ব অনার্স-মাস্টার্স পাশ করলে চলবে না।

একটা বিষয় ধন্যবাদযোগ্য যে, মাদ্রাসায় শিক্ষারত ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান তথাকথিত আধুনিকতায় গা ভাসিয়ে দেয়নি। শিক্ষকদের অবাধ্যও হয় না; নেশাসক্তও নয়। মোবাইল ফোন ব্যবহার করে পর্ণগ্রাফিতে আশক্তির সংখ্যা নেই বললেই চলে। কওমি শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক তদারকি, ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষার কারণেই নিশ্চয়ই এটা সম্ভব হয়েছে। এদেরকে ব্যবসা-বিজ্ঞান ও আধুনিক টেকনোলজি শিক্ষা দিয়ে অনেক বড় ও প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ রয়ে গেছে। কওমি মাদ্রাসাশিক্ষায় শুধুমাত্র কুরআন ও হাদিস পড়িয়ে যেভাবে কোমলমতি প্রতিভাবান শিশু-কিশোরদের খণ্ডিত শিক্ষায় শিক্ষিত করা হচ্ছে; বেকার, অনুৎপাদনশীল, ছদ্মবেকার করে ফেলা হচ্ছে; অন্য যে কোনো দেশ হলে সে দেশের সরকার এটা আইন করে বিষয়টা সরাসরি তদারকি করতো। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পাওয়া তাদের শিশু-অধিকার। অবুঝ শিশুদের প্রতি এহেন প্রতিকূল-ব্যবস্থা ও আচরণ এক ধরণের অপরাধ। আমাদের দেশে যে সরকারই যখন আসে, মৌলবি-মাওলানাদের রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করে। মাদ্রাসার পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করে না। আমি মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত অগণিত বেকার ও ছদ্মবেকারদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। ছাত্রাবস্থায় তারা অবুঝ ছিল। তারা তাদের এ পরিণতির জন্য

তাদের বাপ-মা ও শিক্ষকদের দোষারোপ করে। আমি অনেক দেশের খবর রাখি। এ উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম দেশে এ ধরণের খণ্ডিত শিক্ষাব্যবস্থা নেই। আমাদের বক্তব্য হলো, প্রতিটা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর এমনভাবে শিক্ষার ভিত গড়তে হবে, যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পর্যায়ে গিয়ে তার মনমতো কোর্স বেছে নিয়ে যে-কোনো পেশায় উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। প্রতিটা পর্যায়ে সাধারণ স্কুল-কলেজ থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে যে কোনো শাখার পেশায় যেতে পারে। প্রতিযোগিতা হবে চলমান বিশ্বব্যবস্থায় অন্য যে-কোনো দেশের সমমান শিক্ষার্থীর সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রতিযোগিতা। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে আরবিতে কথা বলতে পারা ও টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া লোকের খুব চাহিদা। আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলোতে কুরআন-হাদিস শেখানো হয় কিন্তু শিক্ষার্থীরা আরবিতে কথা বলতে পারে না। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন না থাকায় টেকনিক্যাল শিক্ষাও নেই। ফলে এদেশের মাদ্রাসা পাশ করে বিদেশে গিয়ে উটের রাখাল অথবা ড্রেন ক্লিনার অথবা নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আমাদের বোধশক্তির বড়ই অভাব।

আমার মতো নগণ্য এ শিক্ষকের কথার কীইবা এমন মূল্য দেয় এদেশ । পত্রিকার পাতায় একদিন লিখি, তো পরের দিন পত্রিকার সেই পৃষ্ঠাগুলো ঝাল-মুড়ি বিক্রির কাজে ব্যবহৃত হয়। আইডিয়াগুলো বাতাসে মিশে উড়ে চলে যায়। যাদের শোনার কথা তারা 'কানে দিয়েছেন তুলো, পিঠে বেঁধেছেন কুলো'– এটাই বড় আক্ষেপ। এদেশে লাঠিয়াল বাহিনী ও চাটুকারই সর্বেসর্বা। সময়, জীবন, দেশ ও সভ্যতা সামনের দিকে দুর্নিবার বেগে হু-হু করে ধেয়ে চলেছে। বড় বড় কথা বলে, অনুৎপাদনশীল দুষ্কর্ম করে, মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে জীবনটা পার করে দেবার জন্য এদেশই যথেষ্ঠ।

(প্রকাশ: ১৬ মে ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

আগামীদিনের শিক্ষা ও সেবায় যা করতে হবে

জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ (জাশিপ) নিয়ে বেশ কয়েকটা লেখা এ কলামে ইতোমধ্যেই লিখেছি। অনেকেই জেনে গেছেন যে, এটা কোনো রাজনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ নয়, নয় কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন। এত কথা এভাবে বলছি এ কারণে যে, আমাদের এ সমাজে শিক্ষা ও সেবার গুরুত্ব ও বাস্তব দশার তুলনায় রাজনৈতিক এ্যাজেন্ডা, হার-জিত, পক্ষ-বিপক্ষ, আঘাত-প্রত্যাঘাত নিয়ে অনুসন্ধিৎসা ও কর্ম-অপকর্ম অনেক বেশি। এদেশে রাজনীতির আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা, দমকা হাওয়া চলছে। মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এদেশের মানুষ ও সমাজ রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চায় না। রাজনীতি সব পেশার সেরা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিবিদদের জিভ দিয়ে আমরা প্রাত্যহিক জীবন, জীবনের চাওয়া-পাওয়া ও কর্মের উৎকর্ষের স্বাদ গ্রহণ করি। কম পড়লে পরে টের পাই, যদিও জীবনের সবকিছু রাজনীতি দিয়ে পরিচালিত হয় না। যে দেশের শিক্ষার মান ভালো না, সমাজে সুশিক্ষিত লোকের অভাব, সে দেশের রাজনীতিও ভালো হয় না। সমাজের মানুষ যা ডিজার্ভ করে, তাই পায়। যদি প্রশ্ন করা হয় জীবন ও সমাজের জন্য শিক্ষা ও সেবা আগে, না-কি রাজনীতি আগে?। আমি নিশ্চিত, এদেশের অনেক নমস্য ব্যক্তিই ভ্রু কুঞ্চিত করে একটু আঁতেল ভাব দেখিয়ে বলবেন, 'না, রাজনীতিই আগে'। কারণ আমরা অনেকেই রাজনীতিকে রুটি-রোজগার ও জীবনোন্নয়নের সিঁড়ি হিসেবে ভাবতে শিখেছি। আসলে জন্ডিস রোগী প্রকৃতিকে হলুদ-রঙা দেখাটাই স্বাভাবিক। এদেশের রাজনৈতিক দল ও কোনো মামলার উকিল একচোখা বলেই জানি। কেউ বাম চোখে দেখেন, কেউবা ডান চোখে দেখেন। অথচ বিচারককে স্বভাবত দুচোখ মেলে দেখতে হয়। নইলে বিচার নিরপেক্ষতা হারায়। তেমনি একজন শিক্ষককেও ছাত্রছাত্রীদের দুচোখ দিয়ে দেখতে হয়, সবাইকে সমান চোখে দেখে মূল্যায়ন করতে হয়। শিক্ষা ও জনসেবা সর্বজনীন। এসব নিয়ে রাজনীতি করলে চলে না। এর পরিণতি শুভ হয় না। এ ধরণের শ্রুতিকটু বেরস কথা আমার বদভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাই লেখনীতে চলে আসে। 'ইল্লত যায় ধুলে আর খসলত যায় ম'লে'। রাজনীতি এদেশকে প্রকৃতপ্রস্তাবে এই একান্ন বছরে ভালো কিছু দিতে পারুক বা না পারুক, রাজনীতি নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। রাজনীতি অন্তত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মানশূন্য করেছে, দলবাজিকে উস্কে দিয়ে মনের মধ্যে জিঘাংসার বীজ বপন করেছে। সামাজিক শিক্ষা ধ্বংস করেছে। এদেশের সকল অনিষ্টের মূল এই দিগ্‌ভ্রষ্ট রাজনীতি। আবার রাজনীতি আমাদের অবকাঠামোগত উন্নতি দিয়েছে। জীবনের এই বেলাশেষে এসে এ সত্যটুকু অন্তত প্রকাশ করা আমার জন্য সমীচীন মনে করি। আমার মনে হয়, আগে মানুষকে

মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে; তারপর তাকে দিয়ে রাজনীতি করাতে চাইলে করাতে হবে। তখন সে-মানুষ মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। আমরা বিভিন্ন পেশার বেশকিছু সমমনা ব্যক্তি একমত হয়েছি যে, যত কথাই আমরা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলি না কেন, শিক্ষা ও জনসেবা এবং শিক্ষা-মানের উন্নতি ছাড়া দেশ ও জাতির উন্নতি অসম্ভব। সুশিক্ষা না থাকলে জনসেবাও হয় না। 'অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চচ্চড় করে।' আগে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতি হতে হবে। এতেই এদেশের 'যত বালা-মুসিবত' ঠিকঠাক হয়ে যাবে বা দূরে পালাবে।

শিক্ষা কখনো আপনা-আপনি আসে না– কেউ-না-কেউ কাউকে দিতে হয়, অথবা সুচিন্তার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। সুশিক্ষার জন্য একটা উপযুক্ত পরিবেশও লাগে। এতে থাকতে হবে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা ও মানবিক গুণাবলী-সঞ্চারক শিক্ষা। এসব নিয়ে এ কলামেই বারান্তরে বিস্তারিত লেখালেখির ইচ্ছে আমার আছে। এদেশে শিক্ষা ও সেবার মান বেশ নিম্নমুখী– শিক্ষিতসমাজ ও পরিসংখ্যান এ কথা বলে। তাই অবহেলিত এ দুটো বিষয়ের উন্নতিসাধন নিয়ে 'জাশিপ' কাজ করে। জাশিপ আসলে একটা পথের নাম, একটা সমাজ-উন্নতির এ্যাপ্রোচ, যা সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত করে, সামাজিক সেবা দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে চায়। জাশিপের হাতিয়ার হচ্ছে সুশিক্ষিত মানুষ। পদ্ধতি হচ্ছে, সমাজের অভ্যন্তরভাগের সুশিক্ষিত মানুষ দিয়ে সেই সমাজের অশিক্ষিত, নিরক্ষর ও অজ্ঞ মানুষদের কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে সুশিক্ষিত করা। এটি একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহযোগিতায় দেশব্যাপী কাজ করতে চায়। আমরা দেখছি, সরকারের শিক্ষা ও সেবা খাতে ব্যয়ের সদিচ্ছার অভাব নেই। হাজার হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ রাখছে। কিন্তু আমাদের দেশের হিসাব তো একটু ভিন্ন, অনন্যসাধারণ। কাজির গরুর হিসাবের মতো। খাতার হিসাব এবং গোয়ালের বাস্তবতা পৃথক। বাস্তবায়নে গলদ রয়ে যায়। 'জাশিপ' সরকারের সহযোগিতা নিয়ে এ দুটোকে মেলাতে চায়। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে শিক্ষা ও সেবার মান বাড়াতে চায়। কর্ম চালিয়ে যেতে পারলে উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব। আমাদের কাছে এটাই দেশসেবা ও ধর্মকর্মও বটে। 'যুগান্তর' কর্তৃপক্ষ দেশসেবার মানসিকতা নিয়ে প্রথম থেকেই 'জাশিপ'কে সহযোগিতা করে চলেছে, এজন্য আমরা বাধিত।

বিগত ১৩ মে ২০২৩ 'আগামীদিনের শিক্ষা ও সেবায় জাশিপ-এর করণীয়' শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জাশিপের 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সেল' এবং 'গবেষণা ও উদ্ভাবন সেল' দুটো বিষয় উপস্থাপন করে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয় উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা: শামীম এবং গবেষণা ও উদ্ভাবন

বিষয় উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মহান উদ্দিন। বিভিন্ন পেশার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদের সভাপতিত্বে এবং অধ্যাপক ড. ফরিদ এ. সোবহানীর সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাবেক শিক্ষা সচিব জনাব মো. এন আই খান, অধ্যাপক ড. ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দাম হোসেন, অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, আইসিএমএবি'র প্রেসিডেন্ট জনাব মো. আবদুর রহমান খান, এফবিএইচআরও'র প্রেসিডেন্ট জনাব মো. মোশাররফ হোসেন।

বক্তারা শিক্ষা-সেবা ও এ সম্পর্কীত গবেষণার উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তারা বলেন: স্কুল-মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্তরেই গুণগত-মানসম্পন্ন শিক্ষার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া সামাজিক শিক্ষার মানও আশানুরুপ নয়। যে কোনোভাবে শিক্ষার মান বাড়াতে হবে, কর্মমুখী ও ব্যবহারিক শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নার্সিং পেশার যথেষ্ঠ চাহিদা আছে, কারিগরি শিক্ষারও অনেক চাহিদা। আমরা সে-সব দেশে জনশক্তি রপ্তানি করে প্রভূত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। আমাদের দেশে সরকারি নার্সিং ইন্সটিটিউট ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিটা শহরে এগুলো গড়ে উঠেছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সেখানে লেখাপড়া করছে, কিন্তু সবই সার্টিফিকেটসর্বস্ব। বাস্তবে তারা কাজ করতে শিখছে না। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি গাইডবই ও নোটবই নির্ভর বা মুখস্ত নির্ভর। আমরা শুধু মুখস্ত করছি, চিন্তা করছিনে। পড়ছি কিন্তু স্বপ্ন দেখছিনে, লেখাপড়া বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারছিনে। ফলে আমাদের চিন্তাশক্তি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধি ও জ্ঞান বিকশিত হচ্ছে না।

শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা অনুপস্থিত। এতে শিক্ষা খণ্ডিত হয়ে গেছে। কারণ শিক্ষা থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, দেশপ্রেম, মানবিকতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলি হারিয়ে যাচ্ছে। আবার শিক্ষার অভাবে সমাজে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা সামাজিক আয়-বৈষম্য ক্রমশই বাড়ছে। অন্যদিকে মাদ্রাসাশিক্ষা থেকে বিজ্ঞান ও ব্যবসাশিক্ষাকে বিযুক্ত করেছি, টেকনিক্যাল শিক্ষার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। মাদ্রাসাশিক্ষায় জীবন ও কর্মমুখী শিক্ষা না থাকাতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী আর্থ-সামাজিকভাবে অনেক পিছিয়ে। তারা বেকার অথবা ছদ্ম-বেকার, অনেকেই অনুৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত। মাদ্রাসাশিক্ষাকে রি-অর্গানাইজ করা সময়ের দাবি। এভাবে শিক্ষা ও সেবা-মানের অবনতিতে জাতি হিসেবে আমরা ক্রমশই হারিয়ে যেতে বসেছি। অথচ এসবের কোনো নিয়ামকই প্রকৃতিসৃষ্ট নয়; মনুষ্যসৃষ্ট ও আমাদের কৃতকর্মের ফল। আমরা ইচ্ছে করলে ও সদিচ্ছা থাকলেই এ অবস্থা

থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। এদেশে শিক্ষা ও সেবার পরিবেশের বড় অভাব। শিক্ষা ও সেবা গ্রহণ ও প্রদান সুস্থ পরিবেশের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। পরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। সরকার এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের এ বিষয়ে আরো সচেতন ও যত্নবান হতে হবে। বক্তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নিম্নবিত্ত পরিবারের আয়-রোজগার বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, গুণগত সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সেবার মাধমে মানবকল্যাণমুখী একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী অর্থনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

যে কোনো আর্থ-সামাজিক গবেষণার জন্য এদেশে নিজস্ব ডেটা-ব্যাংক গড়ে তোলা প্রয়োজন। অনেক দেশেই ডেটা-ব্যাংক আছে। তারা তাদের আর্থ-সামাজিক প্লানিং, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের কাজে নিজস্ব ডেটা-ব্যাংক ব্যবহার করে গবেষণা করেন। গবেষণার ফল বাস্তবে কাজে লাগান। শিক্ষা ও সেবার নিম্নমুখীতার কারণ উদ্ঘাটনে অধিক সময় ব্যয় না করে কীভাবে শিক্ষা ও সেবাহীনতার অভিশাপ থেকে বের হয়ে আসা যায়, সে পথের সন্ধান গবেষণা করে বের করতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।

জাশিপ শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে এবং জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার ও যে কোনো সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে গঠনমূলক আলোচনা, শিক্ষানীতি তৈরিতে সরকারকে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহযোগিতা, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা এবং শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন মূল্যায়ন প্রজেক্ট হাতে নেবে। জাশিপ শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভাগ, মন্ত্রণালয়, কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের মাধ্যমে অভিভাবকমহলকে শিক্ষা-সচেতন করে স্কুল/মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রমকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রভাব সৃষ্টি করবে।

একটা সম্ভাবনা আমরা মনের মধ্যে ভাবতে পারি। দেশে টেকনিক্যাল শিক্ষা শিখেই হোক আর সাধারণ শিক্ষা শিখেই হোক, গ্রামে-গঞ্জে, প্রতিটা এলাকায় বেকারের অভাব নেই। প্রতিটা বেকার আট-দশ লাখ টাকা ব্যয় করে/অনুদান দিয়েও যে কোনো চাকরিতে ঢুকতে ইচ্ছুক। তারা চাকরি করতে চায়। এমন দশ-পনরো জন বেকার যুবক-যুবতীদের একত্র করে যৌথ ফান্ড ব্যবহার করে নিঃসন্দেহে একটা কোম্পানি গঠন করা যায়। প্রত্যেকে হবে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার। এলাকায় পাওয়া যায় এমন কাঁচামাল ব্যবহার করে ছোট ছোট কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। কোম্পানি-ব্যবস্থাপনার

নীতিমালা অনুযায়ী কোম্পানি পরিচালিত হবে। শেয়ারহোল্ডারদের জাশিপ নির্ধারিত কয়েকটা কোড অব এথিক্স মেনে ব্যবসা করতে হবে। জাশিপ কোম্পানির মালিক হবে না। জাশিপ তার দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে। ইচ্ছা করলে 'শিক্ষা-সেবা সমাজের' কেউ-না-কেউ ব্যবসাতে অংশগ্রহণও করতে পারেন। জাশিপে অনেক পেশাদার শিল্প-উপদেষ্টা ও ইঞ্জিনিয়ার আছেন, তারা তাদের সাধ্যমতো ব্যবসা পরিচালনায় সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবেন। বছর শেষে প্রতিটা কোম্পানি এর অর্জিত লাভের শতকরা পাঁচ থেকে দশভাগ জাশিপ ফান্ডে জমা দেবে। এ টাকা দিয়ে জাশিপ তার দেশব্যাপী কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। এভাবে দেশের প্রতিটা অঞ্চলে ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অসম্ভব কিছু না। শুধুমাত্র সমন্বয়ের অভাবে, আস্থার অভাবে এবং অভিজ্ঞতার অভাবে এ-জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়ে উঠছে না। গঠনমূলক উদ্যোগের অভাব দেখা দিচ্ছে। দিন পার হয়ে যাচ্ছে। আস্থা, সমন্বয় ও অভিজ্ঞতার সঙ্কট জাশিপ নিঃসন্দেহে ঘুচিয়ে দিতে পারে। দেশ ক্রমশই শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। বেকারদের কর্মসংস্থান হতে পারে।

জাশিপ নেতৃবৃন্দ বলেন, একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির তিনটি দায়িত্ব রয়েছে- নিজের প্রতি দায়িত্ব, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ব এবং সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব তাকে স্বেচ্ছায় পালন করতে হবে। আমাদের বড় বড় কথা না-বলে কাজে বিশ্বাসী হতে হবে। এদেশের শিক্ষা ও সেবার উন্নয়নে এদেশের সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই জাশিপের এ সামাজিক আন্দোলনে শরিক হতে হবে এবং স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে। জাশিপের এ অরাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাও একান্তভাবে কাম্য। উন্নতি হলে লাভ কিন্তু সবার।

(প্রকাশ: ২৩ মে ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ- অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
ডবন ঢ়ধমব: যঃঃঢ়ং://ীীী.ঢ়ধঃযড়ৎবশযধযধংহধহ.পড়স

মনুষ্যত্বের আবশ্যিকতা ও আমাদের অবস্থান

ছাত্রজীবনে আমি গানের প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। জীবনে ভাটার টান এসে যাওয়াতে এ-কথা বলতে এখন সংকোচ বোধ করি। কিছু কিছু গান আমার বেশ ভালো লাগতো, যেমন– 'নদী যদি বলে সাগরের কাছে আসব না, তা-কি হয়! মেঘ যদি বলে আকাশের বুকে ভাসবো না, তা-কি হয়, তা-কি হয়!!' 'মানুষ মানুষের জন্য একটু সহানুভুতি কি মানষ পেতে পারে না, ও বন্ধু, মানুষ মানুষের জন্য...' ইত্যাদি। মনে প্রশ্ন জাগে, নদী সাগরের সাথে না-মিশলে তাকে কি নদী বলা যায়? আকাশের বুকে না-ভাসলে তাকে কি মেঘ বলা যায়? নদীকে সাগরের কাছে আসতেই হবে; মেঘকে আকাশের বুকে ভাসতেই হবে, তারপরই নদী ও মেঘের সার্থকতা। আচ্ছা, মেঘ ও নদী ছাড়া কি সাগরের কর্ম পূর্ণতা পায়? মানুষ হতে গেলে মনুষ্যত্বের গুণ থাকতেই হবে, এও মানুষের সার্থকতা। গানে 'মানুষের জন্য একটু সহানুভুতি'র অর্থ এও হতে পারে যে, মানুষের জন্য মানুষের মনুষ্যত্ব জেগে উঠতেই হবে। প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক, শাশ্বত এগুলো না-হলে কী হয়? মনুষ্য সমাজের একজন হওয়াতে এগুলো ভাবাও আমাদের দায়িত্ব। এখন রমজান মাস চলছে। প্রতি বছরের মতো এবারও সারা বছরের জন্য রমজানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মুনুষ্যত্ববোধ জাগরণের ট্রেইনিং চলছে। আমরা মানুষ হিসেবে সে ট্রেইনিং কতটুকু গ্রহণ করতে পারছি, সেটাই প্রশ্ন। মানুষের জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্র। ভাবা প্রয়োজন, মনুষ্যত্বহীন মানুষ হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা কেমন হয়?

একজন মানুষকে শিক্ষিত মানুষ হিসেবে পরিগণিত হতে গেলে বেশ কয়েক ধরনের শিক্ষা তার মধ্যে থাকতে হয়। এর প্রধান উপাদানটি হচ্ছে মনুষ্যত্ববোধের শিক্ষা। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের গুণ ও পশুত্ব দুই-ই থাকে। পশুরা জন্ম থেকে আমৃত্যু পশু। কিন্তু মনুষ্যত্বের শিক্ষা মানুষকে বিবেকবোধ ও জ্ঞান খাটিয়ে সমাজ ও প্রকৃতি থেকে অর্জন করতে হয়। পশুরা যাতে অন্য কোনো প্রাণিকে আক্রমণ করে জীবন রক্ষা করতে পারে, প্রাণি শিকার করে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে, তার জন্য প্রকৃতি তাদেরকে নখর, শিং ও ধারালো দাঁত দিয়েছে। মানুষ অন্যকে আক্রমণ করার জন্য, জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য শত কোটি টাকার প্রজেক্ট হাতে নিয়ে কৃত্রিম নখর, শিং ও দাঁত তৈরির জন্য প্রতিযেগিতায় নেমেছে। মানুষের বিবেকবোধ খাটিয়ে অন্যের কথা ভাবা উচিত কিন্তু পশুরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। মানুষের লজ্জা-শরম থাকা উচিত, কিন্তু পশুরা লজ্জাশূন্য। এতে আমরা তাদেরকে খারাপ বলি না। তাদের বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় কোনো জ্ঞান নেই। 'খাও-দাও ফূর্তি কর, আগামীকাল বাঁচবে কী-না বলতে পারো, হেই,

দুনিয়াটা মস্ত...' নিয়েই তারা মত্ত। মনুষ্যত্ব মানুষ ও অন্য কোনো প্রাণির প্রতি সদয় হওয়ার গুণ। মনুষ্যত্ব কোনো একক গুণ নয়, অনেকগুলো মানবিক গুণের সমাহার। এর প্রধান কয়েকটি হলো– সততা, চারিত্রিক শুদ্ধতা, সত্যের প্রতি আনুগত্য, দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, বিবেকবোধ, ত্যাগের মহিমা, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি। মনুষ্যত্বের সম্মিলন আছে বলেই আমাদের নাম মানুষ হয়েছে। মানুষ হতে গেলে এসব গুণ বিভিন্ন মাত্রায় মনের মধ্যে থাকতে হয়। এসব গুণ মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে। মানুষকে সৃষ্টিতে শ্রেষ্টত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও কাজের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের গুণ মানুষের মধ্যে বিকশিত ও প্রকাশিত হয়। তখন আমরা বুঝি সে একজন মানুষ। মানুষ মরে যায় কিন্তু টিকে থাকে তার মনুষ্যত্ব। এটাই সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করেছে।

মানুষের কোনো কাজে পশুত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটলে বা মনুষ্যত্বের গুণের অনুপস্থিতি দেখলে আমাদের মধ্যে তখন একটা অস্বস্তিবোধ কাজ করে। আমরা তখন সেই মানুষটিকে পশুর সাথে তুলনা করি। আমাদের বিবেকে বাধে বলেই আমরা সরাসরি মানুষটিকে পশু বলে সম্বধন করতে পারি না। আবার পশুর মধ্যে মনুষ্যত্বের গুণাবলি বিদ্যমান থাকে না বলে আমরা পশুকে মানুষ বলি না। ভবিষ্যতে পশুরা মনুষ্যত্বের গুণাবলিসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠলে পশুকে মানুষ নামে অভিহিত করতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। তখন পশুকুল মানুষকুলকে হার মানাবে। পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে কোনো কিছুকে একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো হেতু নেই। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারণাস্ত্রের ব্যবসা, মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা, বাঘের হরিণ শাবক খাওয়ার গল্পের মতো কল্পিত অজুহাতে বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ ও সতীর্থ নিধন, রাষ্ট্রক্ষমতার দাপট, এক দেশকে শোষণ করে নিজের দেশের লোকজনের অসদিচ্ছাপূরণ, নির্লজ্জ মিথ্যার প্রকাশ্য বেসাতি, গণরায় আদায়ের জন্য যে-কোনো পন্থা অবলম্বনের মানসিকতা, পশুত্বকে হার মানানোর মতো ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-স্বার্থপরতা ইত্যাদির অনুরূপ মনুষ্যত্বের অপমানি যেভাবে ঘটে চলেছে, এগুলো দেখে পশুসমাজ যদি অলক্ষ্যে হেসেই ওঠে, অমূলক ভাবার কিছু নেই।

এ বিষয়ে আমরা উদাহরণ হিসেবে আপাতত হাতে-গোনা ফিলিস্তিনিদের কথা, সিরিয়াবাসীর কথা, কাশ্মির উপত্যকার জনসাধারণের কথা, সবে মুক্তি-পাওয়া আফগানিস্তানের কথা, রোহিঙ্গাদের কথা, ইরাকবাসীর কথা, উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা, সাধারণ ইউক্রেনবাসীর কথা একটু পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারি। পশুসুলভ কর্মকাণ্ডের সাথে এসব কর্মকাণ্ডকে মিলিয়ে দেখতে পারি। প্রতিটা

দেশের অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। সব মানুষেরই একই রংয়ের রক্ত। হাসি-কান্না, অনুভূতিও এক। অথচ রাষ্ট্রের হর্তাকর্তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য করে এক, অন্য সম্প্রদায় বা দেশের জন্য ভাবে ও করে আরেক। কখনো কোনো দেশ বা সম্প্রদায়কে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। কোনো কোনো দেশের হর্তাকর্তা নিজের ও সাঙ্গপাঙ্গদের জন্য ভাবে ও করে এক, দেশবাসীর জন্য করে আরেক। এ আবার কেমন জনসেবা? গলদটা কোথায়? আমরা যতটুকু জানি লর্ড ক্লাইভ নিজ দেশবাসীর কাছে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হলেও ভারতবর্ষসহ বিশ্ববাসীর কাছে কুখ্যাত জালিয়াত, প্রতারক ও দুর্নীতিবাজ ছিল। মানব চরিত্রের এ আবার কেমন বহুরূপী ও বিপরীতমুখী আচরণ! একই অঙ্গে এত রূপ! মনুষ্যত্বের গুণ না থাকলে কি তাকে মানুষ বলা যায়? বিশ্বব্যাপী এ মনুষ্যত্বহীনতা থেকে কি মানব জাতির কোনো পরিত্রাণ নেই? বিশ্বের ইতিহাস ও ঘটনাপরম্পরা থেকে কি মানব জাতি শিক্ষা নেবে না? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না; আর তাদের চোখ আছে তা দিয়ে দেখে না; আর তাদের কান আছে তা দিয়ে শোনে না; তারা পশুর মতো বরং তার চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট; ওরা উদাসীন (ওরা কমন সেন্সও ব্যবহার করে না)। (আল আ'রাফ, ৭:১৭৯)।

আমি শিক্ষক। আমি সাড়ে-তিন যুগ ধরে প্রাপ্ত-বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিচ্ছি। আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মনুষ্যত্বের গুণ বাড়ছে, না কমছে। আমার অভিজ্ঞতা বলে, ক্রমশই কমছে। কিন্তু এর জন্য আমি তাদেরকে কোনোক্রমেই দায়ী করতে পারিনে। আমার মতো কতকগুলো শিক্ষক নামের অসহায় ব্যক্তি পুস্তকী নীতিকথায় যুক্তি-তর্কে অনেক সময় তাদের কাছে হেরে যায়। তারা আমাদেরকে সমাজের বাস্তবতার কথা তুলে ধরে। আমরা নৈতিকতার কথা যতবারই উচ্চারণ করি না কেন, বুঝি তাদের অধিকাংশই সামাজিক বাস্তবতাকে অনুসরণ করে। আমরা নিরুপায় বোধ করি। তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করছে। তাহলে সমাজের অবস্থাও আমরা অনুমান করতে পারি। এছাড়া আমরা কেউই অন্ধ নই; পত্র-পত্রিকায় পড়ছি, নিজ চোখে দেখছি মনুষ্যত্বের অবক্ষয়। নির্লজ্জ দুর্নীতি, রাহাজানি, ডাহা মিথ্যার বেসাতি, প্রতারণা, উদগ্র দুরাচারবৃত্তি, কথার সাথে কাজের গরমিল, নিজের কোলে ঝোল টানার সীমাহীন প্রয়াস– সবই চোখের সামনে ঘটছে। তা-ও বাস্তবে আমরা সবাই দেখছি, অথচ আমরা নিশ্চুপ। আমাদের শিক্ষক সমাজের অনেকেই নিজের মনুষ্যত্বের সাথে আপস করে কোনো না কোনো কায়েমি স্বার্থবাদী গ্রুপের সাথে সুর মিলিয়েছে। বাকিরা অসহায়, সাক্ষিগোপাল। কখনো গানের তানে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে

ভুগি, ‘আমি কি মরেই গেছি, না-কি মরে বেঁচে আছি...’। সমাজের শিক্ষার নিয়ামক শক্তিগুলো যদি সজোরে ছাত্রছাত্রীদের পুরো অবয়ব ধরে নীচের দিকে টানে, আমাদের মতো কতিপয় শিক্ষক নামধারী ব্যক্তির পক্ষে যতই ছাত্রছাত্রীদের ওপরের দিকে টানার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের মুরোদে কুলায় না, আমরা ওপরে ধরে রাখতে পারিনে, হেরে যায়। এতে বোঝা যায় যে, সামাজিক শিক্ষা মনুষ্যত্বের গুণ বিবর্জিত হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যথাযথ শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয়। যদি বলি সামাজিক শিক্ষার এ দৈন্যদশার জন্য দায়ী কে বা কারা? তখনই মাথার মধ্যে ঘট পাকায়। বিভিন্ন পক্ষ এসে দায়িত্ব ঝাড়া মেরে ফেলে দেয়। ধমকের সুরে বলে, ‘আমাকে দায়িত্বজ্ঞান দীক্ষা দিতে আসিয়াছ, আমি যাহা করি তাহা তোমরা করিও না, আমি যাহা বলি তাহা তোমরা মানিয়া চলিও ও করিও’। এ হিতোপদেশ কি কখনো বাস্তবায়ন হয়? অন্য মানুষ কি তা মানে?

কোনো সমাজের ক্ষমতাবান মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ লোপ পেলে সমাজ বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে; সমাজে অশান্তি বিরাজ করে, ‘জোর যার মুল্লুক তার’ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়; ভালো-মন্দ বোধ লোপ পায়। মানুষ নির্লজ্জ হয়ে যায়। ‘চোরের মা’র বড় গলা’ই আদর্শ হয়ে যায়। দুর্নীতি ও কালো টাকার দাপট প্রাধান্য পায়, প্রতিটি পর্যায়ে আইনহীনতা দেখা দেয়। সমাজ অশিক্ষা-কুশিক্ষায় ছেয়ে যায়। সমাজে বুনো আবহ বিরাজ করে। সত্য থেকে মিথ্যাকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে। ভয়ে সাধারণ মানুষ মিথ্যার দাপটের কাছে হার মানে। সমাজের মনুষ্যত্বহীন স্বার্থান্বেষী লোকগুলো হীন স্বার্থ উদ্ধারে মিথ্যাবাদী ও অন্যায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মিথ্যার স্বপক্ষে জোটবদ্ধ হয়ে জিগির তোলে। ভালো মানুষের পক্ষে সমাজে লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সবই মনুষ্যত্বহীনতার সিম্পটম। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি মনুষ্যত্বের জাগরণ হয়, সমাজ যদি শিক্ষিত লোকদেরই হয়– তাহলে পত্রিকার পাতা উল্টালেই চারদিকে পশুত্ব ও পাশবিকতার জয়ধ্বনি কেন? দেদারছে অপরাধ করছে, টাকা লুটপাট করছে, আবার অপরাধকারীরা সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? সৎপথে জীবন নির্বাহ করতে অসৎ, প্রতারক ও অশিষ্টদের প্রতিনিয়ত উঠতে-বসতে সালাম ঠোকার প্রয়োজন হয় কেন? সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা করা হয় কেন? এত সব কেন-র উত্তর কেউ দিতে প্রস্তুত নয় কেন? আমরা জানি, মনুষ্যত্বসুলভ চিন্তা-চেতনা মানুষের মধ্যে না থাকলে সমাজ অশান্ত হয়ে ওঠে, সমাজ ও রাষ্ট্র বিশৃঙ্খলায় রূপ নেয়। আধুনিক সমাজে যন্ত্র দিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বসুলভ আচরণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তা কতক্ষণ ও কী পরিমাণে সম্ভব!

এর সমাধান যে নেই, তা নয়। বাক্য যত দীর্ঘই হোক না কেন, পূর্ণ-যতিচিহ্ন তার থাকবেই। মানুষ কেবল মনুষ্যত্বের গুণাবলিসম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস শান্তিময় হয়ে উঠতে পারে। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নিজের বিশ্লেষণ নিজেই করে সমাজে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে। রাজনীতিসহ প্রতিটা পেশাতেই এখনো অনেক মনুষ্যত্বজ্ঞানে উজ্জীবিত মানুষের মতো মানুষ রয়ে গেছেন। তাদের আত্মোপলব্ধি জাগরিত হতে হবে। মৌন সম্মতি যথেষ্ঠ নয়, ইচ্ছাশক্তি বাড়াতে হবে। মিথ্যার আগল ভেঙে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের জন্য বেরিয়ে আসতে হবে। সমাজে সুশিক্ষিত লোককে কাজ করার জন্য জায়গা করে দিতে হবে। সুশিক্ষিত লোকদেরকেই সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে আসতে হবে। সুশিক্ষিত লোকদের শিক্ষা-কর্মের ছোঁয়ায়, ভোর আকাশের অরুণিম আলোর প্রাদুর্ভাবে রাতের নিকষকৃষ্ণ আঁধার দূরীভূত হয়ে চারদিক ক্রমশ আলোকিত হবার মতো, সুখ-শান্তিতে ভরা সমৃদ্ধ দেশ আমরা নিশ্চয়ই পাবো।

(প্রকাশ: ১৬ এপ্রিল ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
ডeb page: https://www.pathorekhahasnan.com

শিক্ষার পরিবেশই নেই, শিক্ষিত জন্মাবে কীভাবে?

শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার ভূমিকাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। খাটো করে দেখলে যা হয়, আমাদের দেশের শিক্ষার বেহাল অবস্থা তার বাস্তব প্রমাণ। বলা যায়, এক বৈঠকে যত দেশের নাম মনে আসে, সব দেশের তুলনায় শিক্ষার উন্নয়ন ও মানের ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছনে পড়ে গেছি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এ অবস্থায়ও আমাদের কোনো গাত্রদাহ হয় না। বরং এ ধরনের লেখালেখিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বিরক্ত হন। আমাদের ছেলে-মেয়েরা এজন্য কোনোভাবেই দায়ী না, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাই এজন্য দায়ী। অথচ দায়ভারটা ছেলে-মেয়ে ও অভিভাবকদের উপরে এসে পড়ে। দেশ পিছিয়ে যায়।

এদেশের শিক্ষানীতির লক্ষ্য অর্জনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো সুষ্ঠু পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার অভাব। আমরা ভবিষ্যৎ ভেবে যেমন কাজ করি না, আবার আগেভাগে প্রতিবিধানের চেষ্টাও করি না। অব্যবস্থা ও কর্দমাক্ত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই। আমাদের একটা মানসিক ব্যামো হলো, আমরা আগে বোঝার চেষ্টা করি না, কম পড়লে পরে টের পাই। যারা সিদ্ধান্ত নেন, তারা ফল ভোগ করেন না। ফল ভোগ করেন সাধারণ মানুষ ও দেশ। তখন বিলাপ করা ও পারস্পরিক দোষারোপ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। আমরা অনিয়ম, অব্যবস্থা, স্বজনপ্রীতি, সামাজিক-দুর্বৃত্তায়ন, বিকৃত রাজনীতির চিন্তাধারা ও অমানবিক মনোভাবের যাতাকলে চ্যাপটা হয়ে অর্ধেক অঙ্গ নিসাড়-হওয়া ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে চলা চতুষ্পদের মতো পড়ে পড়ে ধুঁকছি। এদেশে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে, 'চোরের মা-র বড় গলা', বিবেকের দংশন নির্লিপ্ত হয়ে গেছে এবং আমরা নির্দিধায় ব্যক্তিস্বার্থ বিবেচনায় তা মেনে নিই। অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, প্রতারণা, মুখে মধু পেটে বিষ, আত্মবিভাজন, পরচর্চা আমাদের পরিবেশকে ক্রমশই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এসবই শিক্ষার অভাব। এর জন্য বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থী, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। আমরা রাজনৈতিক দলবাজি, অপচিন্তা ও গলাবাজিতে এতই উন্মাদ ও মত্ত হয়ে গেছি যে, ন্যায়-অন্যায় বোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে তো একটা কথা আছে– তাও বিস্মৃত হয়েছি। এসবের প্রতিফল ও পরিণতি ভেবে দেখার এক মুহূর্তও ফুরসত আমাদের নেই। চারদিকে সুস্থ-সাবলীল চিন্তার চর্চা ও বিকাশ নেই। অন্তত প্রতিদিনের পত্রিকাটা একটু গভীরভাবে পড়লেই আমরা এ জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাযুক্ত, দুর্বিপাক-ভারাক্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। একটা দেশ ও জাতি গড়ার জন্য বায়ান্ন বছর একেবারে কম সময় নয়। বায়ান্নটা

বছর আমরা পার করে ফেললাম– এ পরিস্থিতির কোনোক্রমেই উন্নতি হলো না। অথচ একটি সুশিক্ষিত জাতিই কেবল মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম। আমরা মানবসম্পদকে পচিয়ে ফেলেছি, সেখান থেকে শুধুই দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। শিক্ষার উন্নয়ন মানেই মানবসম্পদের উন্নয়ন। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বহুমাত্রীক সমস্যায় জর্জরিত, যা আমরা প্রত্যেকে অবগত। আমি পরিসংখ্যান তুলে না ধরে পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার বাস্তব অবস্থা নিয়ে কিছু কথা বলবো।

গত ১২ জুন ২০২৩ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিক্ষার্থীর মানসিক সমস্যার কারণ ইন্টারনেট' শীর্ষক এক জরিপে দেখা যায়, জীবনে কোনো না কোনো সময়ে মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হন ৭২.২ শতাংশ শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ৮৫.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছে, তাদের মানসিক সমস্যার পেছনে ইন্টারনেটের ভূমিকা রয়েছে। জরিপ অনুসারে, তরুণ শিক্ষার্থীদের বড় অংশই অফলপ্রসূ কাজে ইন্টারনেটে বেশি সময় ব্যয় করে। ইন্টারনেটে সময় ব্যয় তাদের স্বাভাবিক জীবনে প্রচণ্ড নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইন্টারনেটে সময় ব্যয় তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ বিঘ্নের জন্য দায়ী। তাদের অনেকেই ইন্টারনেটে পর্নো দেখা, সাইবার ক্রাইম, বাজি ধরা, বুলিং করা প্রভৃতি অপ্রীতিকর কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে। ইন্টারনেটে অন্য একাধিক সমীক্ষায় দেখলাম আরো ভয়ঙ্কর চিত্র। ফলাফল এক জায়গায় করলে দেখা যায়, তেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সী ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী স্মার্টফোনের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফিতে আশক্ত। কী পিলে-চমকানো তথ্য! উঠতি-বয়সী এ ছেলেমেয়েগুলোর লেখাপড়া আদৌ হয়, কি হয় না? তাদের লেখাপড়ার মান কেমন হয়? তাদের জীবনে উন্নতিই-বা কেমন? এহেন পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ড্রপ-আউট হচ্ছে, কিশোর গ্যাংয়ে শামিল হচ্ছে, জীবন-বিধ্বংসী নেশার আড্ডায় নাম লেখাচ্ছে। পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এপথে যুক্ত হচ্ছে ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যায়ের বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েরাই বেশি। তারপর তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ আলো নিভে যাচ্ছে। পরবর্তী জীবন এভাবেই কুঁড়িতে পোকায় খাওয়া অর্ধপ্রস্ফুটিত ফুলের মতো অভিশপ্ত জীবনের কালিমা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এদের অনেকেই উন্নতির পথ খুঁজতে নীতিভ্রষ্ট রাজনীতির তালিম নিচ্ছে। অধিকাংশই সমাজ ও পরিবারের বোঝা ও আপদে রূপ নিচ্ছে। যারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উপরের ক্লাসে উঠছে, তারাও সুস্থ জীবনের ঠিকানা পাচ্ছে না। সার্টিফিকেটসর্বস্ব কর্মহীন-শিক্ষাহীন অবহেলিত এক ভাসমান জনগোষ্ঠী, শিক্ষিত মানবকূলে যাদের নিরাপদ ঠাঁয় নেই। এদেরকে আমি আমার

মতো করে নাম দিয়েছি 'মানব আপদ' বলে। বর্তমান সমাজের প্রতিটা জায়গায় এদের প্রাধান্য ও বিচরণ।

প্রতিনিয়ত অনেক ছাত্রছাত্রী, তাদের শিক্ষক, অভিভাবকদের সাথে এ বিষয়ে আমার কথা হয়। আলোচনা থেকে শিক্ষাকার্যক্রমের বাস্তবতা সম্পর্কে অনেককিছুই বুঝতে পারি। অভিভাবকমহল অভিযোগ করেন, 'ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের কথামতো চলতে চায় না, স্কুলে শিক্ষকের কথাও নেয় না, তারা মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে গেছে। কেবলমাত্র এলাকার পাতিনেতাদের কথায় এরা সাড়া দেয়। বিস্তৃত সমাজ থেকে তারা প্রতিনিয়ত কুশিক্ষা নিচ্ছে, নীতিকথা ও নৈতিকতার বর্তমান বাজার বড্ড মন্দা'। শিক্ষকরাও অনেক ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার বিষয়ে বিরক্ত হয়ে গেছেন। তারাও আশাহত হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় কি কোনো দেশ ও জাতি সামনে এগোতে পারে? খুব কম ছেলেমেয়েই বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধানে, আদেশ-নির্দেশ মেনে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে যারা লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হচ্ছে, তাদেরকে নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করি। তাদের সংখ্যা হাতে গোনা। অথচ যে বিশাল অংশ লেখাপড়া না শিখে জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হতে পেরে সমাজের বোঝা ও সমাজে কলুষতা ছড়ানোর কাজে নিয়োজিত হলো, সমাজে শিক্ষিত মানুষের গণনা থেকে হারিয়ে গেল, তাদের আমরা হিসাবে ধরিনে, আমলে নিইনে। এই পোকাধরা নাফোটা ফুলগুলো কিংবা রোগাক্রান্ত অর্ধপ্রস্ফুটিত ফুলগুলো অনুকূল বাতাসে রাজনীতির পাখায় ভর করে থানা ও জেলা পর্যায়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্লোগান হাঁকছে, অপকর্ম করে সমাজে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সমাজের নীতিনির্ধারক হয়েছে। সমাজে দুর্নীতি-দুরাচারবৃত্তিসহ অন্যায়, অশালীন হেন কাজ নেই যা তারা করছে না। এরাই আমাদের 'সোনার ছেলে'র ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে। এরাই দলেবলে স্কুল-মাদ্রাসা, কলেজের গভর্নিং বডিতে সসম্মানে বিচরণ করছে। শিক্ষাঙ্গন নিয়ে রাজনীতি করছে ও টাকার গন্ধ শুকছে। আমরা প্রতিনিয়ত তাদের গলায় ফুলের মালা পরাচ্ছি। তাদের কথায় সমাজ চলে। তারা স্কুল-কলেজের হেডমাস্টার ও অধ্যক্ষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বনে গেছে। সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কি পরিবেশ ঠিক থাকার কথা? আদৌ লেখাপড়া হওয়ার কথা?

যারা মানবসম্পদ নিয়ে গবেষণা করছেন, সমাজবিজ্ঞানী, পরিকল্পনাকারী সকলেই নির্বাক। যৎকিঞ্চিত গবেষণার ফলও বাস্তবায়ন হয় না। পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনাও বাস্তবায়নকারীরা আমলে নেন না। দিন পার হয়ে যায়। দেশে রাজনীতির ব্যবসা হালে পানি পায়। আমরা 'বাঙালি জাতিসত্তার উত্তরাধিকার' বলে গর্ববোধ করি।

শিক্ষার মান বিষয়ে একটা গোলটেবিল আলোচনায় গেলাম। একজন বাদে সকল বক্তাই শিক্ষার নিম্নমান অবস্থা ও হালদশার কথা বললেন। করণীয় কি করতে হবে বললেন। বুয়েটের একজন বক্তা বললেন, 'না, আমরা তো ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী পাচ্ছি, এদেশে লেখাপড়ার মান অতটা খারাপ না। বুয়েট থেকে পাশ করে অনেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাচ্ছে'। বুঝলাম, তিনি একটা বদ্ধ ঘরের ভেতর বসে পুরো দেশের অবস্থাকে দেখছেন। বাস্তব অবস্থা হলো: হাতে গুণে দু-চারটা সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হচ্ছে তাদের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীদেরই আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়ে শিক্ষা নেওয়ার মতো শিক্ষার ভিত নেই। শিক্ষকরা দায়ে পড়ে, কখনো চাকরি বাঁচাতে তাদেরকে পাশ নম্বর দিয়ে পাশ করাচ্ছেন। এরা লেখাপড়ার ব্যাপারে উদাসীন ও নির্বিকার। লেখাপড়া শেখার কোনো আগ্রহ নেই। রাতদিন ফেসবুক ব্যবহার ও জোড়া বেঁধে গল্প করতে ব্যস্ত। জীবনের সব বয়সের সব চাওয়া-পাওয়া ও ভালোলাগা যে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য উপযুক্ত নয়, এমন কি– চোখের সামনের ক্ষুদ্র বুড়ো আঙুল সুদূরের হিমালয়কেও যে ঢেকে দেয়– এ বোধ ও উপলব্ধি তাদের মধ্যে নেই। আমি অধিকাংশ ছেলেমেয়ের মধ্যে ঐ পর্যায়ে লেখাপড়া করার মতো মানসিক পরিপক্কতার অভাব দেখতে পাই। তাদের চিন্তার ব্যাপকতা ও গভীরতা লোপ পেয়েছে। লেখাপড়ার ভিত্তির মধ্যে মুখস্তকর্ম বেশি, চিন্তাশীলতা ও বাস্তবতা কম বলেই এমনটি হয়েছে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে দৈনিক পত্রিকাটাও পড়ে না। বাংলা-ইংরেজি কোনো ভাষাতেই দখল নেই। ইংরেজি অক্ষর দিয়ে ভুল বাংলা শব্দ লিখে বাক্য তৈরি করে। এ বিষয়গুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আমার সহকর্মীদেরও বলতে শুনেছি।

মূলত শিক্ষামানে ধস নেমেছে প্রাইমারি ও হাইস্কুলগুলোতে। সেকথা বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ পায়। সেখানে শিক্ষামানের পতনের কোনো জবাবদিহিতা নেই। এতে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি ও মূল্যায়নব্যবস্থার কথা ভেবে হাততালি দেওয়া ও পুলকিত হবার কোনো কারণ নেই। এই এক বছরের মধ্যেই দেখবেন প্রায় সকল ছেলেমেয়েই সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বসে আছে। শত শত কোটি টাকা ব্যয়ের নতুন মূল্যায়নব্যবস্থা 'যাহা পূর্বং তাহাই পরং' হয়ে গেছে। দেখবেন, 'নামেই তালপুকুর, কিন্তু ঘাটে ঘটি ডোবে না'। এসব শুভঙ্করের ফাঁকি এদেশের সচেতনমহল ভালো বোঝে। কারণ চাকরি বাঁচাতে কিংবা শিক্ষক হিসেবে কৃতিত্ব নিতে শুধু উপরের ঘরে টিক দিলেই হয়ে যায়, শিক্ষকের তো আর ব্যক্তিগত জমি বন্ধক রাখতে হয় না! এজন্য শিক্ষক জাত শিক্ষক না হলে এবং জবাবদিহিতা না থাকলে যা হবার তা-ই হবে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আছে, তা আশাপ্রদ নয়। সেখানে

‘গমও উদা, জাতাও ঢিলা’। একটা দেশের মানবসম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে সেখান থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া অনেক কঠিন। সেজন্য সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় আইনকানুন তৈরি, আইনের বাস্তবায়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এ বিষয়ে তো আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রেই অনিহ্ এবং দুর্নীতিতে আগেভাগেই মোটামুটি চ্যাম্পিয়ন হয়ে বসে আছি। ছাত্রছাত্রীদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে বেশি বেশি নম্বর দিয়ে রাখা, দায়িত্বে অবহেলা করে আলাদাভাবে সুবিধা নেওয়া, এগুলোও দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে। এদেশের সকল বিভাগের দুর্নীতির লাগাম আলগা করে দিয়ে একমাত্র শিক্ষা বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত করার বাসনা কতটুকু সফল হওয়া উচিত, প্রতিটা ভাবুক লোকই তা বোঝেন। সেজন্য শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি নিয়ে আমি খুব একটা ভাবাবেগতাড়িত হই না, যেমনি অতীতে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা চালু করাতে পরিণতি নিয়ে যা ভেবেছিলাম ও বলেছিলাম, তা-ই হয়েছে; সেজন্য বরং বলি, ‘সিইং ইজ বিলিভিং’।

ইউজিসি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অনেক আইনকানুন তৈরি করে ফেলেছে। বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায়গুলোতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় অনেকদূর এগিয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষামানের কী দশা? এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি প্রত্যেকের হাতে হাতে একটা করে উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া, না-কি জনগোষ্ঠীকে জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবসম্পদরূপে গড়ে তোলা? উদ্দেশ্য আমরা কতটুকুই-বা হাসিল করতে পারছি? স্বার্থকতার কোনো ইভ্যালুয়েশন আছে কি? আমাদের সকল মহৎ উদ্দেশ্য ও অর্জন তো ‘নীতিভ্রষ্ট রাজনীতি’ নামের ‘বিষাক্ত গুটি পোকা’য় নিরবধি কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। শিক্ষাকার্যক্রমের হালহকিকত স্বল্পকথায় বলে তিয়াষ মেটার কথা না। এটাও একটা ‘হাজার রাতের কেচ্ছা’ হতে পারে। সংশ্লিষ্টমহলের হুঁশ যত তাড়াতাড়ি ফেরে এ জনগোষ্ঠীর মুশকিল ততই আসান হয়।

(প্রকাশ: ২২ জুন ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার সংকট

জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এসে একটা বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পেরেছি। একটা জীবন আসলে অগণিত জীবনপথের অবিরাম ও অনিবার ক্রসিং, ঠিক আঁকাবাঁকা হয়ে বয়ে চলা সুদূরের রাস্তার মতো। যেখান থেকে জন্ম নেয় অভিজ্ঞতা। সত্তর দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে ভর্তি হয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটা চিরচেনা হয়ে আছে। বিগত ২ জুলাই ২০২৩ ঈদের খুশি ম্লান হবার আগেই যুগান্তর পত্রিকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে পড়তে হলো 'ইউজিসির অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা নিয়ে কিছু প্রশ্ন' শিরোনাম। সেখানে পুরো আর্থিক নীতিমালা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি, তবে তরুণ প্রাবন্ধিকের লেখার মধ্যে কিছু বিষয় উল্লেখ থাকাতে বিষয়টা আঁচ করতে পেরেছি। সে বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। প্রাবন্ধিক হয়তো মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মাস শেষে বেতনের কম টাকা গুণতে গিয়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে বাস্তবতার সাথে খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তাই মনের এ অভিব্যক্তি। তিনি কম অভিজ্ঞতার কারণে জানেন না যে, এদেশে লেখালেখির মাধ্যমে শিক্ষকদের দুর্দশা ও পেশাগত উন্নয়নে কথা শোনার যেন কেউ নেই, বোঝারও কেউ নেই। নেই শিক্ষার মান বাড়ানোর কার্যকরী কোনো ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলছি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন রাজনীতির উন্মুক্ত মাঠ। প্রতিটা দলই এখন এ মাঠ দখলে নিতে মশগুল। দেশব্যাপী পুরোটাই আছে রাজনৈতিক দল আর শিক্ষাঙ্গন নিয়ে 'দলবাজি'। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এটাই হাল-হকিকত। এটা বুঝতে পেরে অনেক গুণি জ্যেষ্ঠ শিক্ষক হয়তো নীরব ভূমিকা পালন করেন। পরিবেশ যতটুকু অনুমতি দেয় নীরবে কায়ক্লেশে নিজের দায়িত্ব সাধ্যমতো পালন করে যান। আমার অফিসে এইট পাস একজন গাড়িচালক মাসে পঁচিশ হাজার টাকা বেতন তোলেন, আর একজন সেরা ছাত্র/ছাত্রী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন মাসে সর্বসাকুল্যে ত্রিশ হাজার টাকা বেতনে। এতে তাদের মধ্যে হতাশা থাকারই কথা। যে হতাশার কথা আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে জীবনভর শুনছি।

পরের দিন যুগান্তর পত্রিকায় আবার পড়লাম, 'র‍্যাংকিং: গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধিতে নজর দিন'। এটাও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে লেখা। গবেষণার বরাদ্দ বাড়লেই র‍্যাংকিং শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হবে, শিক্ষার মান আকাশ ছুঁয়ে যাবে– আমি এত সহজ সমীকরণে আস্থা আনতে পারি না। শিক্ষকদের সার্বিক এই বঞ্চনার কথা মনে হলেই আমার কিন্তু একটা গানের কথা মনে হয়, 'শিকল ছিঁড়িতে না পারে, খাঁচা

ভাঙিতে না পারে, পাখি ছটফটাইয়া মরে, পাখি ধড়ফড়াইয়া মরে, মনরা পাখি আমার, মনরা পাখি...'।

জানিনে গানটা কে কীভাবে নেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাঁচার গণ্ডিতে শুধু একদল মেধাবী পুরোনো ছাত্রছাত্রী, যারা বর্তমানে শিক্ষক, ধড়ফড়াইয়া মরছে না, এদেশের মেধাবি ছাত্রসমাজও ছটফটাইয়া মরছে। শিক্ষকরা মেধাবি ছাত্র হওয়াতে যে কোনো পেশায় হয়তো জীবন গড়তে পারতেন। শিক্ষকতা শুধু একটা পেশার নাম নয়, একটা ব্রত। শিক্ষার আদর্শে জীবন কাটিয়ে দেবার ইচ্ছায় জীবনের বেশ কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে এসে এখন পিছু ফিরে অনেকেই পস্তাচ্ছেন। পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাকে পস্তাতে বাধ্য করছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ এদেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের একটা বৃহৎ অংশ, এটা তো কারো অস্বীকার করার জো নেই। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে সেখানে ক্রমশ শিক্ষার ও পরিবেশের মান নামতে নামতে বর্তমানে বঞ্চনার গ্লানি এবং সময় শেষে একটা সার্টিফিকেট ছাড়া শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ সেখানে নেই। আমাদের মতো ভূক্তভোগী শিক্ষকরা ছাড়া সেখানকার বর্তমান অবস্থা আর কে জানে! আমি অনেক ছাত্রছাত্রীর সাথে কথা বলেছি। শুধু টিউশন ফি কম ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নামের মোহে পড়ে অনেকেই সেখানে ভর্তি হয়। তবে ছাত্র নামধারী যারা রাজনৈতিক দলের বরপুত্র হয়ে অকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ থেকে বা পরিপার্শ্ব থেকে দলীয় ছত্রছায়ায় আদায়কৃত চাঁদা ও জীবনের রসদ, গাড়ি-বাড়ি, পদ সংগ্রহে ব্যস্ত, কিরিচের ধার পরীক্ষায় মত্ত– তাদের কথা আলাদা। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সেখান থেকে সরকারি টাকায় তাদের ভবিষ্যৎ লাঠিয়াল বাহিনী, দেশ-শোষক ও পেশিশক্তি-সমৃদ্ধ যোগ্য (?) উত্তরাধিকার তৈরি করে নিচ্ছে। এ ছাত্রগুলোও কিন্তু মেধার ধার দেখিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। পরে উদ্বায়ু হাতের ইশারা ও রঙিন ভবিষ্যতের নেশায় পথ ভুলে বিপথগামী হয়। শুরু হয় পচনধরা-দিকভ্রান্ত রাজনৈতিক দলের তল্পিদারি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও রাজনীতির নামে স্লোগান দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য। কখনো কদাচিৎ বিচারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিচারকের রায় শুনে ফাঁসির মঞ্চের বিভীষিকাময় অবস্থা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় (বুয়েটে আবরার হত্যাকারীদের যেভাবে দেখেছি)। যাদের প্রশিক্ষণে এরা হত্যাকর্মে লিপ্ত হয়, যারা এদেরকে হত্যাকারী বানায়, তারা বহাল তবিয়তে থাকে। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে মেধাবী ছাত্র, বাপ-মায়ের ভবিষ্যৎ স্বপ্নপূরণের ভরসা হয়ে; বের হয় সন্ত্রাসী, অস্ত্রবাজ, পেশিশক্তির আধার নাম নিয়ে। সময়ের অনিবার স্রোতে একসময় হারিয়ে যায়। আমার কথা বিশ্বাস না হলে, পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলো ঘেটে দেখা যায়, কিংবা রাজনৈতিক বিবেচনায় যেসব বড় পদে

শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাদের সাথে কথা বলা যায়। বুয়েটের আবরার হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ভেবেছিলাম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মনে হয় ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে, যদিও তা হয়নি। বন্ধ হলে শিক্ষাঙ্গন নিয়ে রাজনীতিই পুরোটা বন্ধ হতে হবে, শুধু ছাত্র রাজনীতি কি দোষ করলো! স্বাধীনতার পর থেকে এটাই এদেশের শিক্ষা নিয়ে রাজনীতির অনিবার পরিণতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যতবারই বলি, 'এইডসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এইডসে আক্রান্ত দম্পতির সন্তান জন্ম দিতে ডাক্তার নিষেধ করেছেন।' কে শোনে কার কথা! 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই। মন হরণ চপল চরণ সোনার হরিণ চাই।'

শুধু ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পঙ্কিল রাজনীতিই-বা বলি কেন, পত্রিকায় মাঝেমধ্যেই আসে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ-বাণিজ্যের কথা, সাদা-লাল-নীল-সবুজের সমারোহ, কর্ম ও শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি– মোটকথা শিক্ষাঙ্গনের পুরো ব্যবস্থা নিয়ে রাজনীতি (?)। যখন যে রাজনৈতিক সরকার আসে, শিক্ষা ও পরিবেশের একই অবস্থা। শিক্ষা উগ্র দলাদলিতে রূপ নিয়েছে। বলা যায়, অবস্থা ক্রমশ খারাপই হচ্ছে। যে লঙ্কায় যায়, সেই রাবণ হয়। শিক্ষাঙ্গনের মুক্তি আর মেলে না। আবার দিনে দিনে অনেক শিক্ষক ও পদাশ্রিত বড় পদধারী শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষাপ্রীতি ভুলে রাজনীতিপ্রীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। রাজনীতির দলে শামিল হয়ে কে কোন বড় পদে যাবেন, চলছে তার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় আবার ধাক্কাধাক্কি আছে। শিক্ষাগুরুর মূল শিক্ষা সেখানে উপেক্ষিত। যারা বড় পদে আসীন, তারা যে যোগ্যতাসম্পন্ন নন, তা আমি বলছিনে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা, গবেষণা ও শিক্ষা-প্রশাসনের উন্নতি নিয়ে যাদের কাজ করার কথা, তারা কর্মউদাসী; প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির দলাদলি, নিজের রাজনৈতিক জীবন সামলাতেই মহাব্যস্ত। আমি বড় পদে অধিষ্ঠিত অনেক যোগ্য শিক্ষককে চিনি। তাদের পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক চাপ, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কোন্দল, বিবদমান স্বার্থান্বেষী গ্রুপ সামলাতেই গলদঘর্ম হতে হয়। রুটিন-ওয়ার্ক নিয়েই ব্যস্ত। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে কাজ করার সময় কোথায়! আমি বলছিনে যে, শিক্ষকরা উচ্চপদে যেতে পারবেন না, কিন্তু রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি ও চাটুকারিতা করে কেন? যাবেন শিক্ষা-প্রশাসন ও শিক্ষার পাণ্ডিত্য নিয়ে, উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে, ব্যক্তিত্ব নিয়ে, ক্ষুরধার নৈতিকতা নিয়ে, জ্ঞানের সারথি হয়ে, জাতির শিক্ষা-দিশারি হয়ে।

এদেশের মহামহিম রাজনীতিকরা সর্বসাধারণের সামনে পদাধিষ্ঠিত শিক্ষকদের বলেন, 'এই যে শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরুর দল! আপনাদেরকে আমাদের গৃহপালিত কিছু অকালপক্ক কুঁজো জীব দিলাম। এরা আমাদের কথামতো চলবে। কেমন পারেন

এদের চিৎ করে শোয়ান তো দেখি! এরা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের যত অঘটনঘটনপটীয়সী হবে। আপনাদের মুরোদ কতটুকু আমরা দেখতে চাই, আপনাদেরকে অনেক ট্যক্টফুল (?) হতে হবে।' পরক্ষণেই রাজনীতিকরা পদাধিষ্ঠিত শিক্ষকদের কানে কানে বলেন, "আর শুনুন, আপনাদের কিন্তু নিয়োগ দিয়েছি আমাদের গৃহপালিত এ জীবগুলোকে খাইয়ে-পরিয়ে দেখভাল করার জন্য। এটা আপনাদেরই দায়িত্ব। তাদের স্বার্থের একটু রাইরে গেলেই আমাদের বাইরে যাওয়া হবে। তারা তখন আপনাদের বিরুদ্ধে স্লোগান হাঁকবে। আমরা তখন আর আপনাদের থাকবো না। তখন আপনাদের গদি নড়ে যাবে। সময় থাকতে সাধু সাবধান। 'মোল্লার খাওয়ালে মুর্দায় পাবে'।" 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।'

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। আমার একসময়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। এদেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের বড় নেতা। আদর্শ ও নীতিতেও ছিলেন অনেক বড় মাপের মানুষ। আমাকে বলতেন, 'নেতা হতে গেলে দলের যে কেউ যত অন্যায় কাজই করুক না কেন, দলের স্বার্থে তাকে সমর্থন দিয়ে যেতে হয়। এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না! অন্যায়কে ন্যায় বলি কীভাবে!' তিনি বাধ্য হয়ে নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। নেতৃত্ব ধরে রাখতে না পারলে বড় পদে যাবার পথও রুদ্ধ। এই তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ। ভালো নীতিবান শিক্ষক অসংখ্য আছেন, পরিবেশ তাদের দলকানা হতে বাধ্য করছে। এ থেকে কি আমরা তাদেরকে মুক্তি দিতে পারি না?

প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত শিক্ষাগুরু আছেন, পরিকল্পনা মোতাবেক তাদের কাজ করতে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সুশিক্ষা ছড়িয়ে পড়তো। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসহ সামাজিক শিক্ষা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেত। মোটের উপর দেশ উপকৃত হতো। অথচ শিক্ষাঙ্গন দলবাজ, দুর্নীতিবাজ, দুষ্কৃতকারীদের খপ্পরে পড়ে উৎসন্নে যাচ্ছে। শিক্ষার আদর্শে গড়া নীতিবান শিক্ষকরা অসহায় হয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'তে পরিণত হয়েছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে আমরা যতই আত্মজাহির করিনা কেন, এদেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি, শিক্ষা আমাদের উন্নয়নের সহায়ক নয়। আমাদের অনুন্নতি, অব্যবস্থাপনার মূলে আছে মানসিক দেউলিয়াপনা ও বিকৃত চিন্তা-চেতনা। কোনো না কোনো গোষ্ঠীস্বার্থের পাপে পুরো দেশ পুড়ছে। বারবার বলতে ইচ্ছে করে, মুক্তিযুদ্ধ তো শেষ হয়েছে সে-ই বায়ান্ন বছর আগে; যুদ্ধ শেষ হলো, কিন্তু মুক্তি মিললো কই!

আমি চাষ কাজে দেখেছি। ধান আমাদের জীবন রক্ষাকারী ফসল। জমিতে ধানের চারা জন্মানোর সাথে সাথে আগাছা-জঞ্জালে ভরে যায়। জঞ্জাল ধানের কচি

চারাগুলোকে একেবারে শীর্ণকায় করে ফেলে। এসময় সার দিলে ধানগাছের তুলনায় আগাছাই বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অধিক পরিমাণে ধান ফলাতে গেলে আগে ধানগাছগুলোকে আগাছা ও জঞ্জালমুক্ত করতে হয়। তারপর সার প্রয়োগ করলে ধানগাছ তরতর করে অল্প সময়ে বেড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম। সরকারি কোষাগার থেকে তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। অথচ তাদের সক্ষমতা ও সামর্থকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছিনে। হয়তোবা বড় জোর চল্লিশ ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিটা পুরোনো জেলায় কমপক্ষে একটা করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এর নিজস্ব জেলার প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করা সম্ভব। শিক্ষকদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' অবস্থা। আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগাছা ও জঞ্জালমুক্ত করতে হবে। তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার মতো উচ্চতর আলাদা স্কেলে বেতন দিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে সকল অরাজকতা, দলবাজি, রাজনীতি থেকে আলাদা করতে হবে। নীতিবান, জ্ঞানপিপাসু শিক্ষাবিদদের শিক্ষাঙ্গন চালানোর দায়িত্বভার দিতে হবে। শিক্ষকদের তিনটি কাজের দায়িত্ব দিতে হবে: ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত শিক্ষাপ্রদান ও মেন্টর হিসেবে কাজ করা; বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন ও গবেষণা করা, ছাত্রছাত্রীদেরকে গবেষণায় শরিক করা; এবং নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কমিউনিটি সার্ভিস দেওয়া। শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সামাজিক সুশিক্ষা বিস্তারেও যথেষ্ঠ অবদান রাখবেন (বাস্তবে এখন চলছে উল্টোটা)। শিক্ষাঙ্গন সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়। দেশব্যাপী বিদ্যমান অরাজকতা, সীমাহীন দুর্নীতি, লাগামহীন অব্যবস্থাপনা মুক্ত করে স্থিতিশীল অবস্থায় আনতে পারলে শিক্ষকদের মাধ্যমে দেশের আরো অনেক কাজও করিয়ে নেওয়া সম্ভব। ছোটবেলায় একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের রুমের সামনে টাঙানো লেখা পড়েছিলাম, 'কোনো রোগই চিকিৎসার অযোগ্য নয়, প্রয়োজন রোগীর ধৈর্য ও চিকিৎসকের প্রজ্ঞা'।

(প্রকাশ: ১০ জুলাই ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

আমাদের রাজনীতি ও জনশিক্ষা

শিক্ষা বলতে আমি এখানে লেখাপড়াকে বোঝাতে চাইনে। এটুকু সবাই বুঝি যে, লেখা ও পড়ার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছুর শিক্ষা অর্জন করি, জীবন ও সমাজ পরিচালনা করতে শিখি। এর অর্থ এই নয় যে, লেখাপড়া মানেই শিক্ষা। অনেকেই আছেন, হয়তো-বা এমএ পাশ করতে গিয়ে অনেক লিখতে ও পড়তে হয়েছে, তার চিন্তাভাবনা ও কাজের মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু না থাকলে তাকে শিক্ষিত লোক বলবো কী করে! শিক্ষিত লোক হতে হলে তাদের মধ্যে জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মনুষ্যত্ববোধ-জাগানিয়া শিক্ষা থাকতে হবে।

একটা গাভী গরু সদ্য একটা বাছুর প্রসব করল। বাছুরটা কমপক্ষে একঘন্টা মাটিতে শুয়ে থেকে উঠে গাভীটার কাছে এসে গাভীর স্তন থেকে দুধ খাওয়া শুরু করে দিলো। বাছুরটাকে কে শিখিয়ে দিলো যে, ঐ স্তনের মধ্যে তার খাবার লুকিয়ে আছে? প্রকৃতিও প্রতিনিয়ত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে। প্রারম্ভ থেকে আমৃত্যু আমরা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিই। সমাজ ও পরিবেশ থেকে আমরা বেশি শিক্ষা নিই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেও আমরা শিক্ষা নিই। অনেক দিন থেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অনেক দর্নীতিবাজ, লেখাপড়া জানা চোর-ডাকাত, ধাপ্পাবাজ, প্রতারক বেরিয়ে আসছে। তারা এ সমাজেই চলাফেরা করছে। তাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এগুলো আমরা বিবেচনায় আনছিনে বলে নীতিহীন-রাজনীতির স্পর্শে এদেশে দুর্নীতি, প্রতারণা, মিথ্যাচার ও অমানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এদের গুরুর সংখ্যাও বেড়েছে। আমাদের বুঝতে হবে এই দুর্নীতি, প্রতারণা, সর্বৈব মিথাচার, ব্যাংকলুট, টাকাপাচারের উৎস কোথায়। একবাক্যে সবাই বলবেন– আমাদের রাজনীতি। এদেশে সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা দুটোই আমরা সমাজ ও পরিবেশ থেকে নিই। কারণ আমরা সমাজ ও পরিবেশের উপর নির্ভর করে জীবন পরিচালনা করি। সমাজ ও পরিবেশ আবার দেশের বিদ্যমান রাজনীতির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। রাজনীতির আচর-আচরণ ও শিক্ষা সমাজ ও পরিবেশের ভিত নির্মাণ করে। রাজনীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটা দেশের প্রতিটি বিষয়কে প্রভাবিত করে। আমি একটা দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে শুধু রাজনৈতিক দলরূপে দেখিনে; এগুলোও এক-একটি সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, এদেশে যত জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন– নির্বাচন কমিশন, দুদক, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ– এমন আরো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, সবই সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; যেখান থেকে এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত সেবা ও শিক্ষা নেয় এবং সেই শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করে। এরা

এদেশের মানুষকে সুশিক্ষা প্রদানে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে এটাই বিবেচ্য বিষয়। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এ জনগোষ্ঠীকে কেমন ও কী শিক্ষা দিচ্ছে আমরা কেউ কখনো একটু ভেবে দেখি কি? আরেকটা বিষয় হচ্ছে, একটা দেশের রাজনীতি যদি সুস্থ ও সুন্দর হয়, তাহলে অন্যান্য এজেন্সিও শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করে। সমাজে যখন ন্যায়বিচার, সততা, নীতিবোধ, মানবতার চর্চা হয়– তখন সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের ভূমিকাই-বা এদেশে কেমন? স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে, এদেশের যত দুর্নীতি, অবিচার, সন্ত্রাস, অনৈতিক কর্মকাণ্ড, আর্থিক লুটপাট, উদগ্র মিথ্যাচার, অসৎ ব্যবসা, জিব উলটানো– এসবের সুতিকাগার কোথায়? এগুলো করে আমরা সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী পেতে চাই, জাতির উন্নতি করতে চাই, সুন্দর দেশ গড়তে চাই– কীভাবে তা সম্ভব? এমন মুখের সুবচন কতক্ষণ আমরা মেনে নেবো? এ অসম সমীকরণ কোনোভাবেই মিলবে না।

দেশ পরিচালনায় যখন যে সরকারই আসুক, কেউই নিজেদের বাড়ি থেকে সম্পদ এনে দেশের উন্নতির জন্য খরচ করে না। এটা বাস্তবসম্মতও নয়। এদেশের জনগণের কাছ থেকে কর বা অন্যান্য উৎস থেকে সরকারি কোষাগারে যে অর্থ জমা হয়, তা-ই সরকার দেশের উন্নয়নে ব্যয় করে। কখনো প্রয়োজনে বাইরের কোনো উৎস থেকে সরকার ঋণও নিতে পারে। বিবেচনার বিষয়টা হচ্ছে, যেভাবে সরকারের আয় অর্জিত হওয়ার কথা, তা যথাযথভাবে অর্জিত হচ্ছে কি না, কিংবা একটা শ্রেণি সরকারি আয় ফাঁকি দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে কি না। অন্যদিকে সরকারি ব্যয়ের যথার্থতা আছে কি না। জনসেবার জন্য একশ টাকার জিনিষ পেতে পাঁচশ টাকা কোষাগার থেকে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে কি না। যদি অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে যায়, তাহলে জনসাধারণের টাকাই অপচয় হচ্ছে। টাকার এই জমা-খরচ ছাড়াও সরকারি দল ও অন্যান্য আরো দলের মূল কাজটা হলো জনগণের সেবা করা, বা কল্যাণ করা। যে দল জনগণকে যত সেবা করবে, জনগণ সে দলকে তত ভালো চোখে দেখবে, তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। এসবই আমার মতো সাধারণ মাস্টারের সাধারণ ও সহজ-সরল বুঝ।

সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, 'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে'। রাজনীতির অবস্থা তা-ই। এদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই মাস্টারসাহেবদের এই সাধারণ-সরল বুঝ নিয়ে এদেশের শক্তিধর 'মহান রাজনৈতিক দলগুলো' চলছে না। তাদের মাথায় ভিন্ন ও চতুর বুদ্ধি গজিয়েছে, পাখা উঠেছে। তারা চাতুরতা, কথার মারপ্যাচ ও জিব ঘুরিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে সুবিধাবাদী রাজনীতির পণ্য

মানুষকে গেলাতে চায়। প্রকারান্তরে ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থের জয়গান গায়। সাধারণ মানুষকে এই চতুর বুদ্ধি থেকে বের করে আনার জন্য ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার রাজনীতিতে বিভিন্ন উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাময়িক সময়ের জন্য রোগের কিছুটা উপশমও হয়েছিল, স্থায়ী সমাধান কেন জানি হচ্ছে না। আমার মনে হয়, আমরা কারণগুলোর মূল উৎপাটন করছিনে বলে রোগ যাচ্ছে না। অদূর ভবিষ্যতে হবে বলেও কোনো আশার আলো দেখছিনে। আমি কিন্তু এহেন সমস্যার সমাধান নেই, একথা মানতে নারাজ। এ বিষয়ে গ্যারান্টিও দেওয়া যায়। ছোট্ট একটা দেশের ম্যানেজমেন্ট করা, কী-বা এমন বিষয়! দরকার একদল সুশিক্ষিত উদ্যমী লোক সাথে নেওয়া, তাদের আত্মবিশ্বাস ও নির্ভেজাল সদিচ্ছা। একথা অনেকে অস্বীকার করবেন, আবার কেউবা আমার প্রতি রুষ্ঠ হবেন, তবুও আমার সত্য পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, এদেশের রাজনীতি দেশের শিক্ষা, সমাজ ও দেশ গঠনে একটা বিষবৃক্ষের মতো কাজ করছে। রাজনীতি হয়ে উঠেছে গোষ্ঠী-সুবিধাবাদী সংগঠন। এখান থেকে সাধারণ মানুষ, সমাজ ও দেশ বিষফল ছাড়া ভালো কিছু পাচ্ছে না। পশ্চিম-পাকিস্তানিদের শোষণের ঘানি টানতে গিয়ে তেইশ বছরে আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, মনেও বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। বায়ান্নটা বছর হলো সে নাগপাশ থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু 'কোথা থেকে কখন যে কি হয়ে গেল, সাজানো ফুলের বনে ঝড় বয়ে গেল'। ভাবতেই অবাক লাগে!

প্রতিষ্ঠানের ব্যালান্সশীট মেলানো আমার কাজ ও পেশা। মহান রাজনীতিকদের দেবতা জ্ঞানে চলাফেরা করি। কিন্তু এখন দেশের ব্যালান্সশীট মিলাতে গিয়ে হিসাব করে দেখতে পাচ্ছি, 'শোষণের দেবতা (শোষক) স্বয়ং নিজের ঘরে ঢুকে বসে আছেন।' এদেরকে তাড়াবো কোথায়? দেবতাকে তো গালিগালাজ করতে পারিনে, অদৃষ্টকে দোষারোপ করি, আর বলি, 'হায় হতোস্মি, এই কি ছিল তোর ভাগ্যের লিখন'! রাজনীতির উদ্দেশ্য পালটে গেছে, জনসেবা আর করতে চায় না, রাজনীতি জনসেবার মোড়কে দেশকে নানা ফন্দি-ফিকিরে শোষণ করতে চায়। আমরা কেউ কেউ একথা মুখে অস্বীকার করলেও বাস্তবে অস্বীকার করার জো নেই। স্বাধীনতার পর থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই-ই দেখে আসছি। দিন যত সামনে এগোচ্ছে শোষণের মাত্রা তত বাড়ছে, ধরন ও টেকনিক পালটাচ্ছে। যারা এখান থেকে উপকৃত হচ্ছে, তারা জয়ধ্বনী দিয়ে শোষণের এ ধরনকে সাপোর্ট করছে এবং এ ধরনের রাজনীতিকে টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করছে। সাধারণ মানুষের করণীয় তেমন কিছু নেই। এদেশের মানুষ বা গোষ্ঠীর এহেন সুবিধাবাদী বৈশিষ্ট্য যদি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও থাকতো, তাহলে মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে দেশ

স্বাধীন হতো কি না সন্দেহ। তখন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে গিয়ে সামষ্টিকভাবে দেশের স্বার্থে একজোট হয়েছিল। শতকরা আটানব্বই ভাগ মানুষকে পশ্চিম পাকিস্তানি শক্তি বিভিন্ন ব্যক্তি-সুবিধা দিয়ে কিনতে পারেনি, অথচ এখন কোনো কোনো রাজনৈতিক দল অর্থ কিংবা পদের সুবিধা দিয়ে জনগোষ্ঠীর একটা ক্ষমতাশালী শক্তিকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারছে। রাজনীতিতে টাকার খেলা শুরু হয়েছে। দেশের সামষ্টিক স্বার্থ এখন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে রূপ নিয়েছে। আমার এসব খাপছাড়া কথা শুনলে কারো কারো গাত্রদাহ হতে পারে, কিন্তু এগুলো নির্ভেজাল সত্য কথা।

বেশ কয়েকদিন আগে দক্ষিণবঙ্গ থেকে পদ্মাব্রিজ হয়ে ঢাকায় এলাম। বেশ ভালো লাগলো। বুকটা আনন্দে ভরে গেল। চারদিক তাকিয়ে দেখলাম, নদীর এককূল ভাঙছে, অন্যকূল গড়ছে। আমি ব্রিজটা মাথায় করে বাড়িতে নিয়ে আসিনি। তৈরিকৃত ব্রিজ থেকে সেবা নিয়েছি মাত্র। মানুষ সমাজে বেঁচে থেকে সেবা ও পণ্য ভোগ করে। অবকাঠামোগত এ উন্নয়নের মাধ্যমে এ সেবাই শুধু জীবনে বেঁচে থাকা, সুষ্ঠু সমাজ গঠন, জাতি গঠন, মানবসম্পদ গঠন নয়; আরো আরো শতেক সেবা ও পণ্য ভোগ মানুষকে করতে হয়, যার উন্নয়ন মানুষের ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। এদেশের রাজনীতিতে তো দুকূলই ভেঙে যাচ্ছে। সেখান থেকে মানুষ ও সমাজ সেবা পাবে কীভাবে? বছরের পর বছর সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছি, রাজনীতিকদের জনসেবা কথাটা রাজনীতির অভিধানে থাকলেও বাস্তবতা থেকে বেমালুম মুছে গেছে। গ্রামগঞ্জের কোথাও গিয়ে নেতা-কর্মীদের কাউকে আর জনসেবা করতে দেখিনে, সবাই নিজ সেবায় মত্ত। এক সময় দু-চার গ্রাম খুঁজে একজন সোস্যাল টাউট পাওয়া যেত। এখন যুগ পালটেছে। প্রতিটা গ্রামে-গঞ্জে অবস্থাভেদে দশ-বিশজন পলিটিক্যাল টাউট চোখে পড়ে। বিশ্বাস করুন, আমার এ দেখা ভুল নয়, আমি বেশি পাওয়ারের চশমা পরি। রাজনীতি দেশের যেদিকেই হাত বাড়াচ্ছে, সেদিকটাই দুর্নীতি-দুরাচারদের বিষের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। রাজনীতির বিষবাষ্প সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে গলা টিপে শেষ করে দিয়েছে। সত্যকথা বলা লোক সমাজে ক্রমেই কমছে। যেভাবেই হোক একটা নির্বাচন অনুষ্ঠান করাই এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ না। আমরা এই বায়ান্ন বছর ধরে দেখছি, বেশীরভাগ দুর্নীতিবাজ, অসৎ ব্যবসায়ী, সামাজিক দুরাচার, চিহ্নিত মাস্তান, পেশিশক্তির ধারক, চাটুকার সরকারি কর্মকর্তা সব সময় ক্ষমতাসীন দলের কাঁধে ভর করে। আমার বিশ্বাস, এটা রাজনীতিকরা বোঝেন না, তা নয়। রাজনীতিকদের স্বার্থ উদ্ধার করতে এসব লোকও দরকার হয়। তাই তারা জেগে ঘুমান। এদেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হবে, রাজনীতিকরা

জনসেবা করবে এবং সেটা আমি দেখে মরতে পারব– এটা আমার দুরাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের কিছু ভালো মানুষ যারা প্রকৃতপক্ষে দেশ ও সমাজসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতিতে ঢুকেছিলেন, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না বলেই রাজনীতিতে নামমাত্র অবস্থান নিয়ে টিকে থাকতে হচ্ছে। বর্তমানে কোনো সুশিক্ষিত ও নীতিবান লোক, দেশপ্রেমিক দেশসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছেন না, এটা আমরা খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছি। দিন যত সামনে এগোচ্ছে, রাজনীতি থেকে পচা-দুর্গন্ধের উৎকট মাত্রা ততই বেড়ে যাচ্ছে, যা সমাজ ও পরিবেশকে কলুষিত করে ছাড়ছে। সমাজসচেতন অনেক ব্যক্তি এসব কথা অকপটে বলতেও সাহস পাচ্ছেন না। আবার অনেক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী টকটকে লাল কিংবা গাঢ় হলুদ হাফশার্ট গায়ে জড়িয়ে দেশের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক ভালো ভালো আশাজাগানিয়া বাণী শুনিয়ে ফুলের মালা গলায় পরছে। এগুলো আসলে বাস্তবতা বিবর্জিত, আত্মপ্রবঞ্চনা। প্রশ্ন জাগে, আমাদের নতুন প্রজন্ম বিদ্যমান এ পরিবেশ, সমাজ ও রাজনীতি থেকে কী শিক্ষা নেবে বা তারা কেমন শিক্ষায় অভ্যস্ত হবে? আমি খুঁজে পাই এদেশের এ দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ ও অপরাজনীতির অতি দ্রুত আমূল পরিবর্তন। এজন্য যে কোনো বিবেকবান, সচেতন ও সুশিক্ষিত লোককে পরিবর্তনের নেশায় জাতি-গোষ্ঠী, দলমত নির্বিশেষে কায়েমি স্বার্থপর অন্যায়, অবিচার, নিত্যনতুন শোষণ, ও ধাপ্পাবাজির বিরুদ্ধে জেগে উঠতে হবে। আমরা সবাই জানি, স্বাধীনতা অর্জনের তুলনায় স্বাধীনতা রক্ষা করা অনেক কঠিন। এদেশের একজন সুনাগরিক হিসাবে এ দায়িত্ব আমাদেরই পালন করতে হবে।

(প্রকাশ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

আশা–নিরাশায় দোদুল্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

হালনাগাদ শহুরে ভাবধারার মানুষ হয়ে গেলেও আজন্ম আমি গ্রামীণ সমাজের লোক। গ্রামের পরিবেশ আমার জানাশোনা-চিরচেনা। গ্রামের চাষকাজে দেখেছি কিছু কিছু গরুর লোনা-মাটির প্রতি খুব ঝোঁক। একমাঠে নিয়ে গেছেন কাজ করার জন্য। একটু সুযোগ পেলেই দৌড়াতে দৌড়াতে অন্য মাঠের সেই লোনা-মাটির কাছে গিয়ে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অনবরত চাটতে থাকবে। 'যার নয়নে যারে লাগছে রে ভালো ভবে-এ'। এ অভ্যাস থেকে ফেরানো দায়। এই লোনা-মাটি চাটার ঝোঁক যদি সৃষ্টির সেরা জীবের, অর্থাৎ এদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কোনো শিক্ষা-ব্যবসায়ীর, পেয়ে বসে তখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে দেশের আইন ও পালের গোদারাও যদি জেগে ঘুমায়। শিক্ষা যখন এদেশে পণ্যের মতো বেচা-কেনা হয়, কিংবা শিক্ষা নিয়ে যখন বাণিজ্য হয়, তখন মনের অজান্তেই আমার দেখা সেই লোনা-মাটি চাটার কথা মনে পড়ে যায়। উদাহরণটাতে সংশ্লিষ্টমহল আমার প্রতি দারুণভাবে নাখোশ হবেন জানি, কিন্তু বাস্তবতা তুলে ধরতে গিয়ে আমি অনন্যোপায়। একজন ভুক্তভোগী শিক্ষক হওয়াতে অসহায়ত্ব তাই আরো বেশি।

শহুরে সমাজে নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু হলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণা। শুরুতে উদ্দেশ্য ভালোই ছিল– শিক্ষা ও জ্ঞানের চর্চা শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বেসরকারি পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া। এর আগে এদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী তখন শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী দেশে যাওয়া শুরু করলো। তারা সেখানে গিয়ে কতটুকু জ্ঞানসাধনা করছিল, সে ভিন্ন কথা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেশে প্রতিষ্ঠা হওয়াতে অন্তত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হতে থাকলো। ব্যবসায়ীদেরও টনক নড়লো। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন যে, এদেশের লেখাপড়ায় অনভ্যস্ত টিক চিহ্ন দিয়ে পাশ করা কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীই পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে সাধ্যমতো বিদ্যার্জন করে সার্টিফিকেট নিয়ে দেশে ফিরেছিল। বাকিরা কম্পিউটারের দোকান থেকে দামি কাগজে মনমতো পরীক্ষার ফল ছাপিয়ে এনে দেশে হাজির হয়েছিল। আমরা এত বছরেও সে অবস্থার সত্যাসত্য প্রমাণ করতে সহজে কেউ যাইনি। প্রকৃত তথ্য অনুৎঘাটিত রয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীরা তারুণ্যের বেপরোয়া উচ্ছাসে লেখাপড়ার অধ্যবসায়, নীতিমালা, শৃঙ্খলা, আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে সে-দেশে বদনাম কুড়িয়েছিল। এর কারণ একটাই– এদেশে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে সে-দেশে গিয়ে সে-দেশের ছাত্রছাত্রীদের সাথে তাল মিলিয়ে লেখাপড়ায় পেরে না ওঠা। তাদের লেখাপড়ার ভিত্তিমান অনেকটা মজবুত। দুর্বল ভিত নিয়ে সবলের সাথে তাল মিলিয়ে

কদিনইবা টিকে থাকা যায়। কিছুদিন পরেই খেই হারিয়ে ফেলে। অমনোযোগী হতে বাধ্য হয়। দিনে দিনে হতোদ্যম হয়ে যায়, তারুণ্যে লাগামহীন স্বাধীনতা অকাজ-কুকাজে প্রলুব্ধ করে। দেখার বিষয়, সে-দেশ কিন্তু এই দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করার জন্য অগতির গতি হয়ে শিক্ষার মান কমায়নি। এরাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। অনেকেই উপায়ান্তর না দেখে রাতদিন পরিশ্রম করে তাদের সমকক্ষ হয়ে যোগ্যতার সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশেও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের একই অবস্থা আমরা দেখছি। যাকে বলে, 'যোগ্যতরের সংগ্রাম করে টিকে থাকা।' ভাগ্য ভালো যে, আমরা নিজ দেশেই 'অগতির গতি' হিসেবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে 'কেউ ফেরে না খালি হাতে খাজা রে তোর দরবারে' ধ্বনি তুলে 'শিক্ষার বাজার' বসিয়েছি।

আমাদের দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল। শিক্ষার্জন নিয়ে অনেকটাই আশাবাদী হওয়া গেল। বছর পেরোতে পেরোতে দু-যুগ পেরিয়ে গেল। শিক্ষা নিয়ে কি অবস্থা চলছে, শিক্ষার গুণগত মানের অবস্থাই-বা কি– এদেশে বসবাসরত কারও অজানা নয়। দীর্ঘ পঁচিশ বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বেড়েছে, পাল্লা দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিগুণ বেড়েছে। কখনো কখনো রাজনৈতিক পুরস্কার হিসেবে কাউকে কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্স দিয়েছি। পুরোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া নতুন প্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মানও আশানুরূপ নয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট আসে সরকারের কাছ থেকে, তাই ভিতরে ভিতরে যা-ই হোক শিক্ষার মানের অবস্থা পারতপক্ষে বাইরে বের হয় না, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কথা, নিয়োগবাণিজ্যের কথা মাঝে মাঝে বের হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট আসে পুরোটাই ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। যত অসুবিধা এখানেই। টাকার বিনিময়ে তারা সার্টিফিকেট কিনতে চায়। কর্তৃপক্ষকে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে অনেক ক্ষেত্রে নামমাত্র বেতন দিয়ে পুষতে হয়, আবার লাভও ঘরে তুলতে হয়। তাই শিক্ষাটা পণ্যে পরিণত হয়েছে। শুধু মাসে মাসে নগদ টাকাটা দিতে পারলেই সময় শেষে ভালো গ্রেডের সার্টিফিকেট একটা হাতে এসে যায়। এটাকেই আমরা সার্টিফিকেট বিক্রি বলি। তাছাড়া সার্টিফিকেট তো আর ঝুড়িতে ভরে কেউ গুলিস্থানের মোড়ে বসে বিক্রি করে না। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দশ-পনেরো লাখ টাকা খরচ করে পাশ সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরির জন্য দোরে দোরে ঘোরে; মাসিক বেতন বারো হাজারেই রাজি। অথচ হাতে-কলমে টেকনিক্যাল শিক্ষা শিখলে এর থেকে অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে পারে। আমি নগণ্য একজন মাস্টাসাহেব হয়েছি বলে ছাত্রছাত্রীর পোশাক-

আশাক নয়, বিদ্যার দৌড় মাঝে মধ্যে যাচাই করে দেখি। অনেকেরই একই অবস্থা। শিক্ষা ও জ্ঞানের স্ফুরণ নেই, প্রবলেম সলভিং এ্যাবিলিটি নেই, এ্যানালাইটিক্যাল এ্যাবিলিটি নেই, ভাবনা-চিন্তার গভীরতা নেই, জীবনমুখী শিক্ষা নেই, কর্মমুখী শিক্ষা নেই, মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা নেই, লেখাও নেই, পড়াও নেই। একপৃষ্ঠা বাংলা লিখতে দিলে কমপক্ষে আটাশটা ভুল খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু মোবাইল ফোন চালনা, ইংরেজি অক্ষর ব্যবহার করে বাংলা লেখা, আর ফেস বুক পড়া। শিক্ষার দশার কথা আর বলবো কত! অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় চায় মান বিবেচনা না করে বেশি ছাত্র ভর্তি করতে। শিক্ষকরা চায় চাকরি বাঁচাতে। এসব ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় যাওয়া কি খুব বেশি দরকার ছিল? এদেশে টেকনিক্যাল শিক্ষায় হাতে-কলমে জানা লোকবলের খুবই অভাব চলছে। টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে আমরা নজর দিচ্ছি না কেন? সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অগণিত টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেখানেও হাতে-কলমে শিক্ষাব্যবস্থার ঘাটতি। সার্টিফিকেট আছে, কাজ করতে জানে না। তাই বেকারত্ব বাড়ে। শুধু শিক্ষা কেন, এদেশে কোনো কিছুরই মান আমরা ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের গতি সর্বদা নিম্নমুখী। সুযোগ পেলেই লোনা-মাটি চাটার চেষ্টা করি।

মূলত আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি, মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যের ধারক হতে বড্ড আপত্তি। লিখছি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে, মন পড়ে আছে অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের চিন্তায়। কোনোক্রমেই স্বাভাবিক হতে পারছি না। হয়তো এদেশের রাজনীতির নীতির প্রতি ঘৃণার কারণে কারো দলে যোগ দিইনি বটে, তবে রাজনৈতিক সচেতনতা তো আছে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে আজ পর্যন্ত শত চেষ্টায়ও দেশচিন্তা মন থেকে মুছতে পারিনি। আবার বায়ান্নটা বছর ধরে দেখছি। কতবারই যে আশায় বুক বাঁধলাম, আবার আশাহত হলাম– মনের জোয়ারভাটার শেষ নেই। এখন জীবনে ভাটার টান চলে এসেছে। ক্রমশই অসহায়ত্ব পেয়ে বসছে। আমি মনে করি, এদেশের শিক্ষামানের এহেন অবনতির জন্যও দেউলেপনা, বিকৃত রাজনৈতিক চিন্তাধারাই দায়ী। আমরা দেশের শিক্ষান্নোয়নের আগে দলবাজিকে বেশি গুরুত্ব দিই। আমরা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশের স্বার্থকে নিতে পারিনে, শিক্ষাকেও নিতে পারিনে, একথা ভাবতেও পারিনে। যতদিন রাজনীতিতে সুশিক্ষিত-বিবেকবান ও নীতিবান লোকের আনাগোনা শুরু না হবে, মিথ্যা ও কপটতার দাপট বন্ধ না হবে, এদেশের মুক্তি ততদিন অধরাই রয়ে যাবে। কারণও এই সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষামানের অভাব। আমরা সাধু সাজি, সাধু হই না। প্রতিটি পদে পদে সাধারণ মানুষ ঠকছে। এটা পুরো জাতি-গোষ্ঠীর মূল্যবোধের অবক্ষয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভালো-মন্দ শ্রেণিবিভাগ করা খুবই কঠিন। সবাই নিজেদেরটাকে এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বলে দাবি করে। প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমগুলো ফিটফাট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বড় বড় দালান-কোঠা। কেউবা গাড়ির গ্যারেজ বা রান্নাঘরের উপরে শিক্ষা প্রদানের দোকান খুলে বসেছে। যত কোচিং সেন্টার ছিল, সব দিনে দিনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিয়েছে। খারাপ বলবো কোন বিবেচনায়? ছোটবেলায় গ্রাম্য হাটে ক্যানভেচারের 'শান্তি মলম' বিক্রি দেখতে যেতাম। বারো-তেরো বছর বয়সী একটা ছেলের গান খুব ভালো লাগতো। 'মাকালের পল (ফল) দেখতে বালো (ভালো), উপরি লাল ভিতরি কালো' বলে তাল দিলে ঢুলী ঢোলে জোরে একটা চাটি মারতো। এদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বিশ্ববিদ্যালয়ই এক নম্বর বলে তাল দিয়ে জোরে একটা বিজ্ঞাপনের চাটি মারে। কিন্তু সে চাটি অন্তঃসারশূন্য। এটাই চেয়ে চেয়ে দেখি, বলার কিছুই থাকে না। শিক্ষকদের মাথার মধ্যে কোয়ালিটি নিয়ে যত চিন্তাভাবনাই থাক না কেন, ছাত্রছাত্রীরা না চাইলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করতে না দিলে কোয়ালিটি শিক্ষা দেবেন কাকে? ছাত্রছাত্রীরা বারো বছর ধরে না পড়ার অভ্যাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে জীবনটা এনজয় করার জন্য, আপনি তা থেকে নিবৃত্ত করার কে? প্রয়োজনে আপনার বেতন হবে না, বিরুদ্ধে শ্লোগান হবে, পরিশেষে চাকরিও থাকবে না। বেকার হওয়ার বড় জ্বালা! 'পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' এদেশের পুরো সামাজিক পরিবেশ শিক্ষা দিচ্ছে, কীভাবে কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হয়, এখানেইবা ব্যতিক্রম হবে কেন? ভালো ছাত্রছাত্রী যে এদেশে নেই, তা বলছি না। তারা সবাই কোনো না কোনো ভালো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেছে। অল্প কিছু ভালো ছাত্রছাত্রী এবং অধিকাংশ 'অচল নামমাত্র ছাত্রছাত্রী' অগতির গতি হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট নিতে এসেছে। প্রায় সব জায়গায় একটা জিনিষেরই ঘাটতি– সেটা সুশিক্ষা ও লেখাপড়া করার ইচ্ছা। আপনার ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে গেলে তাদেরকে আকর্ষণ করতে হবে। তাই শিক্ষামান নিয়ে কোনো কথা বলতে পারবেন না। কিছুসংখ্যক শিক্ষকও অতি উৎসাহী হয়ে কর্তৃপক্ষের শিক্ষাবাণিজ্যের তালে তাল দিচ্ছেন। লেখাপড়া হোক, না হোক টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আপনি যেমন করেই হোক ব্যবসা চালিয়ে যাবেন। ব্যবসাতে একটু ট্যাক্টফুল হতে হবে। বলারও কেউ নেই। দেশটার নাম বাংলাদেশ না! যেখানে যত অরাজকতাই হোক, মিথ্যার বেসাতি হোক, আইনহীনতাই হোক, অন্যায় হোক– যে হতভাগা এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, তারই কপালে বিপদ আছে!

একশ দশটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে শুনেছি। হাতে গুণে বড়জোর দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ৩০ থেকে ৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রী আছে যারা

পড়ালেখা করার জন্য ভর্তি হয়। বাকি ৬০ থেকে ৭০ ভাগ ছাত্রছাত্রী একাধারে ফেল করেই চলেছে। অবশিষ্ট একশটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'নামে তালপুকুর, ঘাটে ঘটি ডোবে না।' এখানে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে পাঁচ থেকে পনেরো শতাংশ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করার জন্য ভর্তি হয়। বাকিরা নামমাত্র ছাত্রছাত্রী, পড়ালেখার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত এরাই সার্টিফিকেট কিনতে এসেছে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বছরের পর বছর ফেল করে টিকে আছে। শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরিত করেছে। শিক্ষামানের এ অবনতির জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কম দায়ী করি। তারা শিক্ষা-ব্যবসা ধরেছে এটা সত্য। দায়ী প্রাইমারি, হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষা। বলা যায়, গোড়ায় গলদ। সেখানে শিক্ষার ভিত খুবই দুর্বল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে 'অনভ্যাসের ফোটা কপাল চচ্চড় করে'। আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়ের লেখাপড়া সিলেবাস মতো মানসম্মতভাবে পড়াতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, কিছু বোঝে না। আবার শেখার প্রতি আগ্রহও নেই, নেই জ্ঞানের তৃষ্ণা। বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবসায়ীরা ব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে শিক্ষার মান কমাতে কমাতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে এনে ফেলেছে, কিছুসংখ্যক নীতিহীন শিক্ষক আত্মমর্যাদা ভুলে সে তালে তাল দিচ্ছে। শিক্ষা-বিবাগী ছাত্রছাত্রীদের সাজিয়ে-গুছিয়ে কপালে সৌভাগ্যের কুলতিলক পরিয়ে 'যার গা-র গন্ধে ঘুম হয় না, তাকে আতর আলী নামে ডেকে নিজেকে তৃপ্ত করে'।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখভালের জন্য যাদেরকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারাও শতেক মূল্যবান কাজে মহাব্যস্ত। শুধু শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ততা নেই বললেই চলে। অন্যান্য অনেক দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত। আমাদের দেশে এখনো তা সম্ভব, বারান্তরে বলবো। এদেশে ভালো মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা এখনো রয়ে গেছে, যদি আমরা শিক্ষার ব্যবসা বন্ধ করে জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা সত্যিকারভাবে শিক্ষাঙ্গনে দিতে পারি।

(প্রকাশ: ৭ আগষ্ট ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

শিক্ষার মান বৃদ্ধির সবক কেমন হওয়া উচিত

বন্ধুরা প্রায়ই বলেন, স্বপ্নেই যদি খাবো আলুভর্তা-বেগুনভর্তা, ডাল কেন? –খাবো পোলাও-বিরিয়ানি, রাবড়ি-ক্ষীর, রাজভোগ ইত্যাদি, 'মনে যেমন চায় রে বন্ধু, দিলে যারে চায়'। বাস্তবে খেতে গেলে পকেটের দিকে, আবার কখনো ডাক্তারের পরামর্শের দিকেও তাকাতে হয়। যাকে আমরা বলি নিখাদ বাস্তবতা। 'কাট ইওর কোট একোরডিং টু ইওর ক্লোথ'। আমরা সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে দাঁড়িয়ে অনেক কথাই বলি। কল্পনা ও মুখ আছে, তাই কখনো আখড়া জেতার জন্যও বলি। স্বপ্নে খাওয়া আর আখড়া জেতার মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবানুগ, বাস্তবায়নযোগ্য, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চায়। নইলে 'যাহা পূর্বং' হয়েছে 'তাহাই পরং' হবে, এটাই স্বাভাবিক। পরিকল্পনা প্রণয়নে বিষয়টা মনে রাখা জরুরি। এদেশে জনশিক্ষার ও প্রশিক্ষণের নামে প্রজেক্টেরও অভাব নেই, আবার টাকা বণ্টনেরও ঘাটতি নেই। ঘাটতি পরিকল্পিত কাজের সাথে কাজ বাস্তবায়নের। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর থেকে দেশ গড়ার নামে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য তো আমরা কম কথা বলিনি, কম কাজও করিনি, বাজেট বরাদ্দও নেহায়েত কম ছিল না। তবে এ দশা হলো কেন? মান ক্রমশ নিম্নমুখী হলো কেন? আমার মনে হয়, আমরা কথা বলেই ক্ষান্ত হই না, মুখ দিয়ে ঠেলে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে চলে যায়, বাস্তবতা তোয়াক্কা করি না। হয়তো জাগ্রত বিবেকবোধ ও আত্মজিজ্ঞাসার কারণে সৃষ্ট কোনো অনুশোচনাই আমাদের মনে রেখাপাত করে না তাই। শিক্ষার মান বাড়াতে আমরা বাজেটের কথা বলি। বাজেট বরাদ্দ বাড়ালেই, পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করতে পারলেই কি শিক্ষার মান বাড়তো? যে সব প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ হয়েছে, তাদের মান কি বেড়েছে? অসুবিধাটা কোথায়! সাক্ষরতার হার বেড়েছে মানি, শিক্ষার হার ও মান কি বেড়েছে? সবে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলো। পাশের হার একটু কমে গেছে। আমরা কেউ কেউ এতে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। পাশের হারের সাথে শিক্ষার মানের কি সম্পর্ক বুঝলাম না। দশটা বছর ধরে লেখাপড়া করে শিক্ষার ভিত গড়ে না উঠলে শুধু এসএসসি পরীক্ষার সময় হঠাৎ মান আসবে কোত্থেকে? শিক্ষার মান কি কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় ভালোমতো উদ্‌গার করে একটা গ্রেড অর্জন করতে পারলেই বেড়ে যায়? আমরা সবকিছুতেই সর্টকাট পদ্ধতির আবিষ্কারক। শিক্ষার উন্নতিতে কোনো সর্টকাট পদ্ধতি বলতে কিছু নেই। মান বৃদ্ধি দু-এক বছরের বিষয়ও নয়। শিক্ষা বিষয়টা এমন যে, প্রথমেই শিক্ষার্থীর শেখার

আগ্রহ থাকতে হবে। শিক্ষণীয় বিষয় শিখতে হবে, তা নিয়ে ভাবতে হবে, অনুশীলন করতে হবে, অর্জন করতে হবে, বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। এ নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও পরিবেশের ভূমিকাই প্রধান। এদেশে কি শিক্ষার পরিবেশ আদৌ আছে?

চাবুক মেরে মজুরকে খাটিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়; ঠেলাগাড়ি হলে একটু ঠেলে জোর করে কিছুদূর এগিয়েও দেওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষা কেউ নিতে না চাইলে জোর করে দেওয়া যায় না। এটা একটা মানসিক ব্যাপার এবং মানসিক প্রস্তুতিরও ব্যাপার। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষক ও অভিভাবকের উচিৎ ছাত্রছাত্রীকে মানসিকভাবে উদ্বীপিত করা, উৎসাহিত করা, শিক্ষার আগ্রহ তৈরি করা, শিক্ষা নিতে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। বর্তমানে ক্লাসে তেমন একটা লেখাপড়া হয় না। শিক্ষকের গরজও কমে গেছে। 'তোমারে করেছি বড় এই গর্ব মোর' ইচ্ছা বিলীন হয়ে গেছে। অভিভাবকমহলের সক্রিয় সহযোগিতায় বাসায় বসিয়ে টিউটরের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করতে হয়। দিনে দিনে এটা অভ্যাস ও রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। এখান থেকে ফিরে আসার কোনো চেষ্টাও আমরা করিনে। শিক্ষার উন্নয়নে যত টাকা ব্যয় করে যত প্রজেক্টই হাতে নিই, শিক্ষার অবস্থা যে তিমিরাবগুণ্ঠিত হয়ে পড়ে পড়ে খাবি খাচ্ছে, সেখানেই পড়ে থাকে। শিক্ষার উন্নয়নে ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশাল অঙ্কের যে প্রজেক্ট নিই, তার ফলও অতি অল্প দিনের ব্যবধানে দিনের আলোতে পরিষ্কার হয়ে যায়। সবকিছুকেই আমি অদৃষ্টের উপর দোষ চাপিয়ে 'কপাল খারাপ', 'জন্মেছি এই দেশে' বলে চালিয়ে দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে শিখেছি। আবার পত্রিকায় কিছু 'অপ্রত্যাশিত কটু কথা' লেখালেখির সুবাদে আমার মতো মাস্টারসাহেবের লেখাপড়ার চর্চা বাড়ে। এটাইবা কম কী! জাতি হিসেবে তো আমরা বই পড়া ভুলতে চলেছি। কিন্তু পত্রিকায় লিখে আদপে সংশ্লিষ্ট কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় কি না, এ নিয়ে আমার সন্দেহ বেশুমার। বরং এতে অনেকের বিরাগভাজন হই। 'উচিত কথায় খালু বেজার' হয়।

আমার মাথায় ঘুরপাক খায়, এভাবেই কি শিক্ষা চলবে, না এর কোনো পরিবর্তনের ইচ্ছে আমাদের আদৌ আছে? এদেশের রাজনীতি নিয়ে আমরা এতই বিমোহিত হয়ে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছি যে, এদেশে রাজনীতি ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই। এটাই সবচে বড় সমস্যা। এ সমস্যার কাছে অন্য সবকিছুই কম গুরুত্বপূর্ণ। এটা সহসা নিবারণ হবার নয়! অথচ এই কুটিল রাজনীতির সমস্যারও এমন সমাধানের ব্যবস্থাও হাতে আছে যে, এদেশে আগামী একশ বছরেও আর কোনো

রাজনৈতিক সমস্যা হবে না। কিন্তু সমাধান নেওয়ার লোক তো নেই। এদেশে শিক্ষিত-জ্ঞানী ব্যক্তিরা, যাদের সমস্যা সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা আছে তারা উপেক্ষিত, লাঠিয়াল বাহিনীর কদর বেশি। এদেশের মহান ও চিরমহান রাজনীতিবিদরা এদেশকে একমাত্র তাদের দেশ মনে করেন। এদেশ শাসনে রাখা তাদের একছত্র অধিকার। অন্য কোনো নাগরিকদেরও যে এদেশে কথা বলা, দেশ নিয়ে ভাবার অধিকার, ভুল ধরিয়ে দেবার অধিকার আছে, এটা তারা মুখে স্বীকার করলেও কার্যত মন থেকে মানেন না।

শিক্ষার অবস্থা দেখার জন্য আমি এদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি। এই দেখার মধ্যে একটা সত্য বেরিয়ে এসেছে। আগেকার সময়ে গ্রামের পরিবেশে স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে অনেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে উঠে আসতো। দেশের বড় বড় পদেও যেত। এ সংখ্যা কিন্তু বর্তমানে যারপরনাই কমে গেছে। শহরের অভিভাবকরা হয়তো ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন বলেই তারা বর্তমানে ভালো করছে। পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু গ্রামে দেখলাম, অভিভাবকবৃন্দ শিক্ষাসচেতন, ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে। ড্রপ-আউটের সংখ্যা কম। আবার দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে দেখলাম, অনেক বাপ-মা শিক্ষাসচেতন নয়, শিক্ষার পরিবেশও ভালো নয়, বংশ পরম্পরায় লেখাপড়া শিখছে না। কোনো কোনো বাড়িতে হঠাৎ করে কেউ লেখাপড়ায় এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যরা একটু সামনে এগিয়েই ড্রপ-আউট কিংবা প্রথম থেকেই নিরক্ষর। আজকাল ফাইভ বা এইট পর্যন্ত পড়াকে পড়া বলা যায় না। স্কুলে নামেমাত্র আসা-যাওয়া করেছে। এমন যৎসামান্য শিক্ষাই শিখছে যে, কয়েক বছর চর্চা না থাকলেই ফাইভ-পাশ, এইট-পাশ বা আদৌ কিছু না-পাশ– সবারই একই অবস্থা। দৈনিক পত্রিকাটাও পড়ে না বা পড়তে পারে না। এসবের জন্য আমি আঞ্চলিকভাবে শিক্ষার পরিবেশ ও অভিভাবকদের শিক্ষা বিষয়ে চিন্তাধারাকে দায়ী করতে চাই।

মহান রাজনীতিবিদদের বর্তমান অনুসারীদেরকে এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নের ভার না দেওয়া ভালো। শিক্ষার কোনো কমিটিতে না রাখাও ভালো। তারা এখন এসব নিয়ে আদৌ ব্যস্ত নয়। এ নিয়ে তাদের মনে কোনো ভাবনাও নেই। তাদের ঝোঁক ক্ষমতাকে আকড়িয়ে ধরার দিকে, উন্নয়ন প্রজেক্টের দিকে, ক্ষমতাধর হওয়ার দিকে। এলাকার কোনো মেম্বর ও চেয়ারম্যানরাও যার যার বিভিন্ন ধান্দায় মহাব্যস্ত। এসব সত্য কথা বলে কারো মনে আঘাত দিতে চাইনে। এলাকার শিক্ষার উন্নয়ন করার তাদের সময় কোথায়! তারা যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে নির্বাচিত হয়েছেন, তার কমপক্ষে দশ গুণ টাকা উঠিয়ে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত।

তাছাড়া তাদের রাজনীতি (?) আছে না! শিক্ষার উন্নতি করতে গেলে সরকারের সহযোগিতা লাগবে কিন্তু তাদের গৃহপালিত গ্রামে-গঞ্জের মহান নেতা দিয়ে নয়। শিক্ষাঙ্গনে এসে তারা শুধু দুর্গন্ধ ছড়ায়। বরং দুধে গোচোনার ছিটেফোটা একটু পড়লেই পুরো দুধটা নষ্ট হয়ে যাবে। প্রাইমারি, হাইস্কুল ও কলেজকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে এলাকার জ্ঞানী-সুশিক্ষিত লোকদেরকে শিক্ষার উন্নয়নে এগিয়ে আনতে হবে, জনসেবায় সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদেরকে সমাজ উন্নয়নে জায়গা করে দিতে হবে। কোনো টাকা খরচের দরকার নেই। সম্মানটুকু দেখালেই চলবে। প্রতিটা স্কুলেই শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক– এই ত্রি-পক্ষীয় আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। পার্শ্ববর্তী কোনো কলেজের অধ্যক্ষ বা সিনিয়র কোনো শিক্ষককে দলপতি বানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই টীম সকলে মিলে কোনো স্কুলের সার্বক্ষণিক তদারক করবে। টীম প্রয়োজনে শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে, বাড়িতে কিভাবে ছেলেমেয়েকে সামলাবে তার প্রশিক্ষণ অভিভাবকদের দেবে। শিক্ষকদের নিয়ে নিয়মিত সভা করবে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নতি পরীক্ষা করবে। স্কুলে শিক্ষা না শেখার জন্য প্রথমেই শিক্ষককে জবাবদিহি করতে হবে, অতপর অভিভাবক জবাবদিহি করবে। পরিবেশটাকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে। থানা ও জেলা শিক্ষা অফিসার পুরো বিষয়টা কো-অর্ডিনেট করবে। জেলা প্রশাসনের কেউ বাধ্যতামূলকভাবে এটাকে তদারক করবে।

অধিকাংশ শিক্ষক নিজের বাড়িতে থেকে বাড়ির কাজে বেশি ব্যস্ত থাকে। এর ফাঁকে একবার স্কুলে হাজিরা দিয়ে আসে। বিষয়টা নিয়ে অনেক ভাবার অবকাশ আছে। গ্রামের লোক ঐ শিক্ষকের কাজে অমনোযোগিতার জন্য তেমন কিছু বলতেও চায় না। বিষয়টা শিক্ষার মান উন্নয়নে দারুণভাবে ভোগাচ্ছে। এর সাথে প্রাইভেট টিউশনির আপদও জড়িয়ে গেছে। এদেশে শিক্ষকদের বেতন কম, মর্যাদা কম, শিক্ষার মানও ক্রমশ কমছে– এগুলোর প্রতিকার দরকার, এ নিয়ে আমি একমত পোষণ করি। কিন্তু বেতন কমের অজুহাতে দায়িত্ব পালনে অনীহা, জবাবহীনতা, কর্মশৈথিল্য কোনোক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। যত কথা আমরা কেন্দ্র থেকে বলি না কেন, এসব তদারক করার লোক মাঠ পর্যায়ে কার্যত নেই। এটাই প্রধান সমস্যা।

শিক্ষার মান অর্জনে শৈথিল্য অর্থ জাতিকে ধীর গতিতে ধ্বংস করার শামিল। শিক্ষাকে আমরা গুরুত্ব না দিয়ে রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে শিখেছি বলেই আমাদের এত দুর্গতি। সরকার যতভাবেই প্রাইভেট টিউশনির আইন প্রণয়ন করুক না কেন,

কার্যত আইনের কোনো বাস্তবায়ন নেই। খলের ছলের অভাব হয় না। অধিকাংশ স্কুল-কলেজ এখন শিক্ষাঙ্গন নয়, হয়ে গেছে প্রাইভেট টিউশনি সংগ্রহ করার উৎকৃষ্ট মিলনকেন্দ্র। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, শিক্ষা বিভাগ ও প্রতিটি এলাকায় একটা করে সচেতন-সুশিক্ষিত টীম শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যথেষ্ঠ। দরকার উদ্দেশ্যভিত্তিক কাজ ও ইচ্ছার মধ্যে আন্তরিকতা। এরা কিভাবে কাজ করবে তারও একটা গাইডলাইন নিশ্চয়ই দেওয়া যায়, যা এত অল্প পরিসরে সম্ভব নয়। মূলত আমরা বাস্তবে যে রাজনৈতিক উপর-টপকা নীতি, আদর্শ ও সততায় বিশ্বাসী, তাতে দেশে শিক্ষামানের উন্নয়ন কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। হাড়ির ভাত একটা টিপলেই পুরো হাড়ির খবর পাওয়া যায়। যদিও কথাটা বললে কোনো না কোনো পক্ষ আমার দিকে তেড়ে আসতে পারে। সমাজে মানবতা, ন্যায়বিচার, সততা, নৈতিকতা, বিবেক না থাকলে শুধু বইয়ের পৃষ্ঠাতে এসব থাকলে শিক্ষায় মানবতা ও নৈতিকতা থাকে না। নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব ও ন্যায়বিচার বিবর্জিত শিক্ষা আদৌ কোনো শিক্ষা নয়, আমাদের দেশে এটাই চলছে। মানুষের মধ্যে 'মানবতা' আছে বলেই নাম 'মানুষ' হয়েছে। 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' বলাটা ভুল হবে; এটা দারুণ অন্যায়ও বটে। আমরা চিন্তা-চেতনা ও কর্মে অন্য কোনো প্রাণির মতো হবো, আবার নাম দেবো সৃষ্টিসেরা মানুষ, তা হয় না। শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষাঙ্গন নিয়ে দলবাজিও করবো, আবার শিক্ষার উন্নত মানও চাইবো, তা কীভাবে সম্ভব? তাহলে তা হবে 'সোনার পাথর বাটি'র মতো। আগে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এদেশে আদৌ আমরা শিক্ষার মান বাড়াতে চাই কি-না। চাইলে– খাতা-কলমে, বক্তৃতায়, না বাস্তবে? তারপর ইচ্ছার যথাযথ বাস্তবায়ন। বাস্তবায়নে আন্তরিক সদিচ্ছাই যথেষ্ঠ।

(প্রকাশ: ১২ আগস্ট ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

এভাবে তো শিক্ষার মান উন্নয়ন করা যাবে না

লালনের একটা গান এরকম: 'পাবে সামান্যে কি তার দেখা! বেদে নাই যার রূপরেখা ওরে, বেদে নাই যার...'। অনেক কাঠখড়ি পোড়ানোর পরই ধান খাবারের উপযুক্ত হয়। কোনো কিছুই সামান্যে পাওয়া যায় না। এদেশের শিক্ষার গুণগত মান যে কোনো মূল্যে বজায় রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা যে পর্যায়ে নেমে গেছে, এখান থেকে সব শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ন্যূনতম শিক্ষামানের ব্যবস্থা করে মোটামুটি সমপর্যায়ে আনার চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। একটা দশতলা বিল্ডিংকে ভেঙে বস্তির সমকক্ষ না বানিয়ে বস্তিটাকেই দশতলার কাছাকাছি উচ্চতায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে শিক্ষার এ পর্যায় থেকে অবস্থার পরিবর্তন করা অবশ্যম্ভাবী, এ বোধ আমাদের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ও করণীয় কিছু বিষয় নিয়ে দুটো নিবন্ধ কয়েকদিনের ব্যবধানে এ পত্রিকাতেই লিখেছি। সে-সাথে শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়েও আলাদাভাবে লিখেছি। জানিনা, বিষয়টা নিয়ে কেউ কিছু ভাবছেন কি না। লিখতে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে জায়গা সংকুলানের অভাবে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে কিছু 'বারান্তরে বলা'র ইচ্ছে পোষণ করি। আজ সেই 'বারান্তরে বলা' কথার কয়েকটা বলি।

অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে যে, তাদের শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞানটাও নেই, যা তাদের ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির লেখাপড়ার মধ্যে জানা উচিত ছিল। বেশ কিছু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও প্রায় তাই। শিক্ষার ভিত্তিমূল খুবই খারাপ। তাদেরকে যদি উন্নত দেশের সিলেবাসের সাথে তাল মিলিয়ে আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়ের শিক্ষা দিতে চেষ্টা করা হয়, মান বজায় রাখা নিশ্চিতভাবে কঠিন হয়। বাস্তবতা হলো: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ মালিক পক্ষ শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করতে চায়। তাই ভর্তি হতে আগ্রহী প্রত্যেককেই ভর্তি করে নেয়। শিক্ষকরাও নামমাত্র বেতনে কাজ করে 'কর্তা ইচ্ছে কর্ম' করে খেয়ে-পরে কায়ক্লেশে কোনোভাবে টিকে থাকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন বেশি– কথাটাও আদৌ ঠিক না। কোথাও কোথাও খেয়ে-পরে টিকে থাকার মতো। প্রায় জায়গাতেই বঞ্চনার শিকার হতে হয়। লেখাপড়াও মূলত হয় না, কারণ ছাত্রছাত্রীরাও লেখাপড়া করতে চায় না; করার যোগ্যতাও নেই, আগ্রহও নেই। হাতে গুনে ব্যতিক্রম কয়েকটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে জানি। ব্যতিক্রম দিয়ে মান যাচাই করা ঠিক নয়।

এ সংখ্যা মোট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা দশ ভাগেরও কম। সেখানে কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ভর্তি হয় এটা ঠিক। ইনফ্লেটেড গ্রেডিং করার পরেও অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের গ্রেড খুবই খারাপ; পাশ করেনি, পাশ করানো হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করতে চায় না বলে কিছু ভালো ছাত্রছাত্রীও লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়। এদেশের শিক্ষকদের বাধ্য হয়ে শিক্ষা প্রদানে আপোষ করতে হয়। তারপরেও বার বার ফেল করে। অবশেষে শিক্ষক কোনো গত্যন্তর না দেখে পাশ করিয়ে দেওয়ার মওকা খোঁজেন। এ পরিস্থিতিতে মান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভাবার প্রশ্ন অবান্তর। শিক্ষাদানের তুলনায় ছাত্রছাত্রী পাশ করলো, না ফেল করলো, আমরা এ বিষয়টাকেই বড় করে দেখি। কেন শিক্ষায় অনীহ হয়, কেন ফল খারাপ করে, এটা তলিয়ে দেখিনে। গত লেখাতে লিখেছিলাম, ‘অনভ্যাসের ফোটা কপাল চচ্চড় করে’। এদেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের সংস্কৃতি নেই, সামাজিক শিক্ষা নেই। আমরা মুখ-সর্বস্ব বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতায় বিশ্বাসী। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট না হয়েও কষ্টদায়ক সত্য কথাটা এই যে, নীতি-নৈতিকতাহীন চাটুকার ও লেফাফাদুরস্ত অবগুণ্ঠিত দুরাচার, মিথ্যাচার ও স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত অধঃপতিত, অপকৃষ্ট রাজনৈতিক ধারা আমাদের দেশকে ক্রমশই সর্বশান্ত ও দেউলিয়া করে ছাড়ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরি। আমরা সত্য প্রকাশে দারুণ অনীহ। বড্ড আত্মমুখী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছি। আমরা ও আমাদের অস্তিত্ব বিলীনের পথে চলে যাচ্ছি। এই আত্মচিন্তাও আমাদের নেই। এতে মুখোশধারী কপটাচাররাই সার্থক হচ্ছে। প্রতিদিনের পত্রিকাটা পড়লেই বোঝা যায়, উন্নতির প্রতিটা সেক্টরে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। এর মধ্যে শিক্ষা সেক্টরটা অন্যতম। কারণ কোনো জাতি ধ্বংস হতে গেলে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, বেহায়াপনা, আইনহীনতা, অবিচার, নিকৃষ্টতা ও দুর্নীতি তার মূলে থাকে। শিক্ষা সেক্টর দিয়েই তা শুরু হয়। অল্প কয়েকটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একটা নির্দিষ্ট মান মেনে চলে। সে মানেরও উন্নতির যথেষ্ঠ সুযোগ আছে। আবার একই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের লেখাপড়ার মান সমান না। সেখানেও রকমফের আছে। মান মেনে চলা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি নগণ্য।

কোনো ছাত্রছাত্রীর আন্ডাগ্রাজুয়েট পর্যায়ে পড়ার যোগ্যতা আছে কিনা, কখনোই বিবেচনা করে দেখি না। ইনপুট ভালো না হলে প্রসেস ডেভেলপমেন্ট যতই করা হোক না কেন, আউটপুট ভালো পাওয়া সম্ভব নয়। শুধু প্রসেস ডেভেলপমেন্ট দিয়ে সব ইনপুট ভালো আউটপুটে পরিণত করাও যায় না। ‘গারবেজ ইন, গারবেজ আউট’ কথাটা তো এমনি হয়নি। আবার প্রসেস ডেভেলপমেন্ট নিয়েও অনেক

সমস্যা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রসেসেরও ভূতে ধরেছে। তাহলে ভালো আউটপুট আসবে কোত্থেকে? বিষয়টা কর্তৃপক্ষ আদৌ বিবেচনায় আনতে চান না। বাজারে বিভিন্ন জেলাতে বিগত এক যুগের একটু বেশি সময় ধরে অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, লেখাপড়ার মান সেখানেও বেশ খারাপ। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা নেওয়া পরিস্থিতিকে আরোও নাজুক, জটিল ও ঘোলাটে করে ফেলেছে। অসুবিধা হচ্ছে, এদেশে সব কুঁজোই টাকার জোরে চিত হয়ে শুতে চায়। এক্ষেত্রে অনেক অভিভাবকও নাছোড়বান্দা। সন্তানকে এমএ পাশ করাতে চায়। কারিগরি শিক্ষায় অনেকেই যেতে চায় না। সেখানে গেলেও না-শিখে পাশ সার্টিফিকেট। হাতেকলমে-ব্যবহারিক শিক্ষা নেই। পানি যখন নদীতে বাড়ে, খাল-বিলেও বাড়ে। একই দশা সর্বত্র।

আমার নিজস্ব একটা বুঝ এরকম: একজন চাষী চাষ কাজে উন্নতি করতে হলে তার লাঙ্গল ও এক জোড়া গরু অন্তত মজবুত থাকতে হবে। একজন রিক্সাচালকের ক্ষেত্রেও তাই, নামমাত্র ভাঙা রিক্সা হলে দুর্গতির শেষ থাকে না। একজন যোদ্ধার হাতিয়ারটা অন্তত মজবুত থাকতে হবে। একজন মানুষ উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিদ্যা খাটিয়ে জীবন নির্বাহ করতে গেলে তার লেখাপড়ায় ধার যেমন থাকতে হবে, তেমনি জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলিকেন্দ্রিক শিক্ষা থাকতেই হবে। বানু মোল্লা শায়েরি লিখেছিলেন, 'গড়িবার কালে যার ইস্পাত হলো চুরি, বালি দিলে ধার আসে না খালি লোহার ছুরি'। আমরা বর্তমানে সে অবস্থায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমরা এইট পাশের যোগ্যতাই অর্জন করি না, অথচ কোনো বিষয়ে অনার্স পড়তে চাই। দুঃখ এখানে যে, আমার মতো হাজার হাজার শিক্ষক তাদের পড়ায়। পাশ নম্বর দিতে হয়। মাঝে-মধ্যে শিক্ষকদেরকে সেমিনার-ওয়ার্কশপ করে ছাত্রছাত্রী পড়ানোর মহামূল্যবান প্রশিক্ষণ নিতে হয়। অথচ ছাত্রছাত্রীদের মনে শিক্ষার আগ্রহ ও ইচ্ছা জন্মানোর জন্য কোনো প্রশিক্ষণ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিংবা ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধিকল্পে কোনো হোমিও ওষুধ দু-এক ডোজ খাইয়েছেন কি না, তাও জানা নেই। শুধু এটুকু জানা আছে যে, প্রতিটা ছাত্রছাত্রী মোবাইল ফোনের যত অপব্যবহার আছে, সবটাই রপ্ত করেছে। একজন ছাত্রছাত্রী ক্লাসে না এলে, বই না পড়লে, শেখার প্রতি আগ্রহী না হলে শিক্ষকের অসহায় হওয়া ছাড়া আর কী করার থাকে? বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক। অথচ ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, 'ঘরে-বাইরে এক মন, তবেই কর কেষ্ট ভজন' (শ্রীকৃষ্ণকে কেষ্ট নামে ডাকা হয়)। আমরা ছাত্রছাত্রীদের মন-মানসিকতাকে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কথা, পরিবেশকে শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলার কথা একবারও ভাবিনে।

শিক্ষা একটা অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক চলমান প্রক্রিয়া। আমরা এটা ভুলে যাই। আমরা যোগ-বিয়োগ না শিখে গুণ-ভাগ করা শেখাতে চাই। বিদ্যুতের ভোল্টেজ যত বেশিই থাক না কেন, মাঝপথে তারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বাটন যত ভালোভাবেই টিপাটিপি করি না কেন, বাতি জ্বালানো কোনোক্রমেই সম্ভবপর হয় না। অথচ এদেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে আমরা তা বারবার করি। আমারা মাথা ছেঁটে টুপিতে লাগায়, মাথার জন্য উপযুক্ত করে টুপি তৈরি করি না। অন্য আরেকটা অসুবিধাও আমাদের আছে। এটা আমাদের জাতীয় ব্যামো। আমরা কঠিন রোগের প্রতিকারে এন্টিবায়টিক ব্যবহারের অবশ্যম্ভাবিতা জেনেও, তা ব্যবহার না করে উপর-উপর মলমের প্রলেপ দিয়ে রোগ নিরাময়ের বৃথা চেষ্টা করি। ফলে ফলপ্রসূ তেমন কিছু হয় না। এভাবে দিন পার হয়ে যায়, বছর পার হতে হতে বর্তমান এ দশা দাঁড়িয়েছে।

মোটামুটি তেতাল্লিশ বছর ধরে এ পেশাতে আছি। আমি কোনো কিছুকে নিছক তাকিয়ে দেখি না। মন দিয়ে উপলব্ধি করি, কখনোবা পর্যবেক্ষণ করি; এটা আমার স্বভাব ও প্রকৃতিও বলা যায়। অন্য কোনো কোনো দেশেও লেখাপড়া ও পড়ানোর সুযোগ আমি পেয়েছি। সে দেশের ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, পর্যবেক্ষণ করেছি। তুলনা করলে আমাদের দেশের গড় ছাত্রছাত্রীদের মেধা অনেক ভালো। আমরা সে মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছি না। তাদেরকে সুস্থ ধারায় পরিচালিত করতে পারছি না। তাদেরকে খারাপ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে, কখনো পথভ্রষ্ট-গুরুমন্ত্রে দীক্ষা ও সবক দিয়ে বিপথগামী করছি; শিক্ষাহারা, বেকার, বিকৃত চিন্তা ও নীতিহীন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তুলছি। তাদেরকে শোষণ করছি। এসব অসংখ্য বিষয়েরও আমি চাক্ষুস সাক্ষী। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সবচে বড় অসুবিধা হলো: বয়সের তুলনায় তারা অপরিপক্ক ও হালকা স্বভাবের। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ভালো পোশাক পরে একটা দামি মোবাইল সেট হাতে নিয়ে নিজেকে ও চেহারাকে সাজাতে চায়, ঘর সাজাতে চায়; নিজের জীবনকে সাজানোর কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবে না। সময়ের কাজ সময়ে করে না। মূল্যবান সময়কে বিফলে নষ্ট করে। লালন গেয়েছেন, 'অসময়ে কৃষি করে, মিছামিছি খেটে মরে, গাছ যদিও হয় বীজের জোরে, ফল ধরে না, তাতে ফল ধরে না'।

এ লেখার শেষে একটা নোক্তা যোগ করি। ইউজিসি বিষয়টা বিবেচনা করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য কতরকম ভর্তি পদ্ধতিই তো আমরা দেখলাম। শেষে গুচ্ছ পদ্ধতিতে এসে থেমেছে। ইউজিসিও

আবার অন্যরকম গুচ্ছ পদ্ধতির কথা ভাবছে বলেও শুনেছি। অন্য দেশে জিএমএটি, জিআরই, টোফেল, আইইএলটিএস কতকিছুরই প্রয়োজন হয়। তারা অনেকদিন ধরে বাজারে এসব পরীক্ষার একটা মানও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইউজিসি এমন একটা উদ্যোগ নিতে পারে না কেন! দফায় দফায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বার বার ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে এইসএসসি পরীক্ষার পর বিজ্ঞান বিভাগ, ব্যবসায় বিভাগ ও মানবিক বিভাগের জন্য আলাদাভাবে তিনটি পরীক্ষা ইউজিসির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষাটা ব্যাপক ও মানসম্মত হবে। প্রয়োজনে চার ঘণ্টাব্যাপীও হতে পারে। এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ এদেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনা দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য হবে। একবার একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিলে সে রেজাল্ট পর পর দুবছর ব্যবহার করতে পারবে। এ রেজাল্টের ভিত্তিতে সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব জায়গায় ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তি হবে। জিপিএ-তে একটা কাট-অফ পয়েন্ট থাকবে। তার নীচে কেউ অর্জন করলে কোনো সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মেডিকেলে ভর্তির অযোগ্য হবে। সব ছাত্রছাত্রীকে টাকার জোরে উচ্চশিক্ষায় যাবার প্রয়োজন নেই। 'দেবে আর নেবে মিলিবে মিলাবে যাবে না ফিরে' এই তত্ত্ব বাদ দেবার সময় চলে এসেছে। যে কোনো জিপিএ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হতে পারবে। উদ্যোগটা ইউজিসিকেই নিতে হবে, মানও বজায় রাখতে হবে। শিক্ষার মান বাড়ানো ও নিয়ন্ত্রণের আরো কিছু পথও আছে। তাছাড়া শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার বিষয় নিয়েও কিছু পরামর্শ আছে। বারান্তরে বলার আশা রাখি।

(প্রকাশ: ২১ আগষ্ট ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

পিএইচডি কি বিক্রয়যোগ্য কোনো পণ্য?

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় থাকতে গেলে শুধু শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নয় পদোন্নতি পাওয়ার জন্যও পিএইচডি ডিগ্রির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। আর এই পদোন্নতি বা শিক্ষার কথাইবা বলি কেন, উচ্চশিক্ষার যে কোনো পর্যায়ে গবেষণাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। অন্য যে কোনো সেক্টরে কাজ করে গবেষণা করার ইচ্ছে অনেকেরই থাকতে পারে। পিএইচডি ডিগ্রি মূলত গবেষণার স্বীকৃতি। আবার দেশের যে কোনো সেক্টরের যে কোনো কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এদেশে রাজনীতিতে গবেষণার গুরুত্ব কম। তাদের ভাষা, 'আমি যা বুঝি এটাই শেষ কথা', 'লাঠিয়াল বাহিনীর প্রাধান্য যথাতথা'। আসলে লাঠিয়াল বাহিনী লাঠির কসরত ভালো বোঝে। তারা দেশের শিক্ষা ও গবেষণা বোঝার কথা না। দেশব্যাপী রাজনীতির সুবিধাবাদী নীতি ছড়িয়ে পড়াতে প্রকৃত গবেষণার আওতা ও ফল পাখা গুটিয়ে দেশ ও জীবনের বাস্তবতা থেকে বিদায় নিয়েছে। ফলে শিক্ষা ক্রমশই তার মান হারাচ্ছে। জাতি হিসেবে আমরাই ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছি। যে কোনো ক্লাসে যে কোনো কিছু শিখে বিষয়টা নিয়ে নিজের মতো করে একটু ভাবা ও বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দেখাও এক ধরণের গবেষণা। যে কোনো পর্যায়ের গবেষণাহীন লেখাপড়া দুর্গন্ধভরা স্রোতহীন হাজামজা বদ্ধ জলাশয়ের সমান। তাই জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আপত্তি তখনই আসে যখন এদেশ গবেষণাকে কাজে লাগায় না বা গবেষণা সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবে দেখি: আমরা কখনো শখের বশবর্তী হয়ে নামটা দীর্ঘ করার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি নিই, কিংবা নামের আগে 'ড.' শব্দটা লিখতে পারলে নামটা একটু যুৎসই ও ভারী ভারী লাগে এমন বাসনায় তাড়িত হয়ে পিএইচডি ডিগ্রির খোঁজ করি। আজকাল এমএ পাশ করা কেউ কেউ পিএইচডি ডিগ্রি গবেষণার মাধ্যমে অর্জন করতে না পেরে টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট কিনেছেন বা কেনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 'লাভের মাল ভূতে যোগায়।' নামের আগে 'ড.' শব্দটা বসাতে পারলে নামের আভিজাত্য বাড়ে তাই। এদেশে এটা পরীক্ষা করার তেমন কোনো পক্ষ নেই, তাই এমনটি নিত্য ঘটে চলেছে। দেশে হাজার হাজার ভুয়া পিএইচডি সার্টিফিকেটধারী রয়েছেন। কেউবা সমাজে নিছক 'আঁতেল' ভাব প্রকাশ করার জন্য বিদেশ থেকে অনেক টাকা ব্যয় করে পিএইচডি ডিগ্রির সার্টিফিকেট কেনেন। আমি কিন্তু এদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে চিনি। এসব কথা কিন্তু আমার কল্পনার জগৎ থেকে বলছিনে, জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই

বলছি। কার খোঁজ কে রাখে! এদেশের কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি কেনার তেমন একটা সুযোগ নেই; দেশটা ছোট, সহজে তথ্য যাচাইয়ে ধরা পড়ার ভয়ও আছে। অসুবিধা অন্য, এদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-সব পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে তার অধিকাংশেরই মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। অনেক কমসংখ্যক পিএইচডি থিসিস পাবেন যার ভিত্তিতে গবেষক এক বা একাধিক রিসার্চ আর্টিক্যাল কোনো ভালো গ্রেডের রেফার্ড গবেষণা জার্নালে প্রকাশ করতে পেরেছেন। এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একক হাতে ডিগ্রি দেওয়া ছেড়ে দিলে দেশী সার্টিফিকেট বিক্রি শুরু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বর্তমানে বিদেশী অখ্যাত বা কৃত্রিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে এ ধরণের ভুয়া কাজ-কারবার বেশি চলছে। আবার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে সাদা, কালো, নীল, লাল রঙের গ্রুপের তো অভাব নেই। একরঙা পাখাওয়ালা পাখিগুলো যেভাবে একসাথে জোটবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে ও জীবনকর্ম চালিয়ে যায়। পাশাপাশি বসে একটা পাখি ঠোঁট দিয়ে অন্যটাকে পিঠ চুলকিয়ে দিতে সাহায্য করে। সেভাবে এখানে রঙে রঙে একরঙা হয়ে দলীয় বিবেচনায় নামমাত্র একটা কিছু ইন্টার্ণশীপ রিপোর্টের মতো লিখে পিএইচডি সার্টিফিকেট প্রাপ্তি প্রায়ই ঘটে চলেছে, যাকে মূলত কোনো গবেষণাই বলা যায় না। আমার এ কথা শুনে কেউ আপত্তি তুললেও নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। এ পোড়া চোখজোড়া তো শুধু এদেশের বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় ভরা সৌন্দর্যই দেখে না, পঙ্কিল দলবাজ রাজনীতির কদর্যে ভরা স্বার্থান্বেষী মহলের সুবিধাবাদী অপকর্মও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তাই এসব আমাদের জানা। এদেশের ‘গমও উদা, যাতাও ঢিলা’ হওয়াতে দলীয় যোগসাজসে অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুধু বর্ণনামূলক তথ্য দিয়েই রচনা লেখার মতো থিসিস লিখতে আমি অনেককেই দেখেছি। অন্তত এদেশের অনেক কনফারেন্সের চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়েও অনেক থিসিস প্রেজেন্টেশনে তা দেখেছি। মানসম্মত হয়নি বলে সমালোচনাও করেছি, কিন্তু ডিগ্রি পাওয়া বন্ধ করতে পেরেছি কি? অনেক ক্ষেত্রে থিসিস পরীক্ষা করতে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু মনমতো না হওয়াতে (লাল-সাদা, নীল-সবুজ সংকেত বুঝিনে বলে) অপারগতা জানিয়ে ফেরত পাঠিয়েছি। তাদেরও পরে ডিগ্রি পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। হয়তো আমার মতো বেরসিক শিক্ষক বাদে অন্য কোনো যোগ্য সমমনা-সমরঙা শিক্ষক মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি একথা বলছিনে যে, এদেশের সব থিসিসেরই অবস্থা খারাপ। এটা সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের যোগ্যতা ও নৈতিকতার উপর নির্ভর করে। এদেশে বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ভালো গবেষণা ও

ভালো মানের সুপারভাইজারও আছেন। এরা এদেশের গর্ব, যদিও বর্তমানে তাদের বাজার মন্দা। অনেক সুপারভাইজার থিসিসের মানের ক্ষেত্রে আপস করেন না বিধায় তাদের কাছে ছদ্মবেশী গবেষকরা বা ছাত্রছাত্রীরা তেমন একটা আসতে চায় না। এ ধরনের নীতিবান মানসম্মত সুপারভাইজারদের অনেককেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, অনেককে দূর থেকে জানি। সঙ্গত কারণেই (জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা মূল্য হারানোর কারণেই) তাদের চলতি বাজারে কদর কম। কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন না বলে বা আধুনিক (?) মূল্যবোধের সাথে তাল মেলাতে পারেন না বলে তাদের নামে কৃত্রিম দুর্নামও বাজারে আছে। এদেশে এদের সংখ্যা ক্ষীয়মাণ। মোট কথা হচ্ছে, সরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই পিএইচডি গবেষণা হচ্ছে কিন্তু অধিকাংশেরই মান আশানুরূপ নয়। আবার একথা খোলামেলা বলতে গেলেই 'উচিত কথায় খালু বেজার হয়'। উচিত কথা শুনতে আমরা তো কেউ প্রস্তুত নই। এদেশে বাস করে কত রকমের পিএইচডির ব্যবহারই যে দেখলাম, সব কথা লিখিত আকারে বলতে গেলে অনেকেই আমাকে ছিদ্রানুসন্ধানী বলতে দ্বিধাবোধ করবেন না। অর্থাৎ পিএইচডি ডিগ্রী সার্টিফিকেটের উদ্দেশ্য এবং এর অপব্যবহার ও ফাঁকিবাজি চলমান বাজারে অনেক দেখছি। এদেশে সার্টিফিকেটের সত্যতা যাচাই হয় না, মান যাচাইও হয় না। ইউজিসি-ই একমাত্র পারেন সত্যতা যাচাইয়ের দায়িত্ব নিতে। মান যাচাই করতে হয় ঐ গবেষণার থিসিস কোন মানের ও কোন গ্রেডের গবেষণা জার্নালে গবেষক প্রকাশ করেছেন, তা দিয়ে। মনের এই খেদে পড়ে অনেক বছর নামের আগে 'ড.' ডিগ্রি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিভিন্ন না-বলা কারণে শেষ রক্ষা করতে পারিনি।

বিষয়টা হচ্ছে পিএইচডি ডিগ্রি থাকলেই তিনি মহাজ্ঞানী, বর্তমান যুগে একথা ভাবার আর কোনো অবকাশ নেই। পিএইচডি ডিগ্রি থাক আর না থাক, অন্তত স্কোপাস ইনডেক্সড কিউ-১ ও কিউ-২ জার্নালে এদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নেওয়া ব্যক্তিরা যদি দেশের জন্য বর্তমান প্রয়োজনীয় টপিকের উপর গবেষণা প্রকাশ করতে পারেন, এটা কিন্তু কম অর্জন নয়। তাদের মূল্যায়ন করা উচিত। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক এবং এদেশের অনেক গবেষক এভাবে গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজটা কিন্তু রাজনৈতিক জোগসাজসে সস্তা সার্টিফিকেট অর্জন করার তুলনায় অনেক ভালো। মানসম্মত গবেষণা আর্টিক্যাল ছাড়া ভালো র‍্যাংকড জার্নালে প্রকাশ করা কঠিন। আমরা এধরণের গবেষণা প্রকাশনার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছি না কেন! এদের গবেষণা কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করি না কেন! অন্তত এই ঘুর্ণায়মান ও চলমান মেকি পৃথিবীতে, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের অবস্থা যে দেশে খুবই নাজুক, সে দেশের

গবেষণা অন্তত কষ্টি পাথরে যাচাই করা অনেক ভালো। আমরা ব্যক্তিস্বার্থে, কখনো জীবন বাঁচাতে, কখনো ঝামেলা এড়াতে 'ডাহা মিথ্যা, মতলববাজ কথাবার্তা' বুঝেও চেপে যাই। 'ঠেলার নাম বাবাজী', তাই।

আজ পিএইচডি প্রসঙ্গে লেখার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। ঈদানীং পত্রিকায় দেখছি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে লেখালেখি চলছে। 'একেতো নাচুনে বুড়ি, তাতে পড়েছে ঢোলের বাড়ি'– তাই এত বেমানান কথার অবতারণা। ২৩ জুলাই ২০২৩ 'প্রথম আলো' পত্রিকায় খবরের শিরোনাম দেখলাম, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার বন্ধ দুয়ার খুলে দেওয়া দরকার'। সে আলোচনা সভায় অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিরাই কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অনেকে আলোচনায় এমন ভাব দেখিয়েছেন যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সুযোগ দিলে এদেশ গবেষণা ও জ্ঞান-গরিমায় ভরে যাবে। অথচ মানসম্মত শিক্ষা ও এদেশে শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে কথা পত্রিকায় আসেনি। আমরা সার্টিফিকেটধারী হতে চাই, না শিক্ষামানের উন্নতি চাই? কোনটা আগে দরকার? 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে পিএইচডি ডিগ্রির অনুমতি দিতে বিধিমালা হচ্ছে' শিরোনামে খবরটি 'বাংলা ট্রিবিউন'-এ প্রকাশিত হয় গত ২৬ জুলাই। এ থেকে জানা যায়, 'দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়ার সুযোগ দিতে বিধিমালা তৈরির প্রস্তুতি নিয়েছে ইউজিসি।' আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ঠ কারণ রয়েছে যে, এতে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ চলে আসবে, অনেক ক্ষেত্রেই অপাত্রে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে, সার্টিফিকেট নিয়ে ব্যবসা শুরু হবে এবং আয়েসের সাথে নামমাত্র ইর্ন্টার্ণশীপ রিপোর্ট দেখিয়েই সার্টিফিকেট প্রাপ্তি হবে। আবার অনেক ভালো মানের পিএইচডি সুপারভাইজার মধ্যম মানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়ে গেছেন, তারা সুযোগ বঞ্চিত হবেন। আবার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিএইচডি-র মানের যে অবনতি রাজনৈতিক ও অনৈতিক যোগসাজশে হচ্ছে, তারও কোনো উন্নতি আর হবে না। আমি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি দেওয়ার সুযোগের বিরোধীতা করি না। তবে সরকারি-বেসরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই একটা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার মধ্যে আনার পরামর্শ দিই। এটাকে অতি সংক্ষিপ্ত নীতিমালা বলা যায়।

দেশে পিএইচডির জন্য ইউজিসি নিজের নিয়ন্ত্রণে একটা কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সেখানে আগ্রহী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত (সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেও আপত্তি নেই) সুপারভাইজারদের সিভি নিয়ে নাম

তালিকাভুক্ত করতে পারে। সুপারভাইজারদের যোগ্যতা দেখা যেতে পারে। পিএইচডি-র জন্য গবেষণায় আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখস্ত আহ্বান করতে পারে। মনোনীত গবেষকদের তালিকা যেখানে প্রকাশ করবে। একটা গবেষণায় প্রথম ও দ্বিতীয় সুপারভাইজারের ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। গবেষকদের মাসিক বৃত্তি দিতে হবে। সুপারভাইজারদেরও মাসিক সম্মানী প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন। তারা প্রথমেই কমপক্ষে চারটি বিষয়ে নিয়মিত ক্লাসে কোর্স-ওয়ার্ক করবেন। পরীক্ষায় কমপক্ষে মানসম্মত গ্রেড পেয়ে পাশ করবেন। এরপর সুপারভাইজারের সাথে নিয়ে গবেষণা টপিক ও গবেষণা প্রপোজাল তৈরি করবেন। ইউজিসি নিয়ন্ত্রিত কনসোর্টিয়াম অফিসে এক্সটারন্যালদের উপস্থিতিতে গবেষক প্রপোজাল ডিফেন্সে অংশ নেবেন এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন সাপেক্ষে গবেষণা প্রপোজাল চূড়ান্ত করবেন। গবেষণার কাজও শুরু হবে। মাঝপথে প্রতিজন গবেষক কনসোটিয়াম কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে নিজের গবেষণা কাজের অগ্রগতি তুলে ধরবেন; প্রয়োজনীয় সাজেশন নেবেন। নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হলে চূড়ান্ত গবেষণা রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে গবেষক ও তার সুপারভাইজারের যৌথ নামে কিউ-১ বা কিউ-২ স্কোপাস ইনডেক্সড গবেষণা জার্নালে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুটি গবেষণা আর্টিক্যাল প্রকাশিত হতে হবে। সে-দুটো প্রকাশিত আর্টিক্যাল থিসিসের সাথে জমা দিতে হবে। থিসিস ইন্টারন্যাল ও এক্সটারন্যাল পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হবে। অতপর মূল্যায়ন শেষে গবেষককে থিসিস ডিফেন্সের জন্য ডাকা হবে। ইন্টারন্যাল ও এক্সটারন্যাল থিসিস ডিফেন্সে উপস্থিত থাকবেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে এবং চূড়ান্ত থিসিস গ্রহণ করে কনসোর্টিয়াম অফিস সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য অনুরোধ করবে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ইউজিসি এসব নিয়মের অনেকটাই প্রয়োগ করতে পারে। এতে দেশে শিক্ষা ও গবেষণার মান বাড়বে, দেশ উপকৃত হবে। আবার অনেক টাকা-ব্যয়ে কেনা বা দলবাজির মাধ্যমে সংগৃহীত পিএইচডি প্রাপ্তির বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বহুলাংশে কমে যাবে।

(প্রকাশ: ২৮ আগষ্ট ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

শিক্ষাব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের বিকাশ কোথায়?

(প্রকাশিত শিরোনাম: 'মনুষ্যত্ব ছাড়া মানুষ হয় নাকি?')

একজন শিক্ষক হওয়াতে আমি সবকিছুর মধ্যে শিক্ষা খুঁজে বেড়াই, এটা আমার স্বভাব। এদেশের মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা খোঁজা কতটা যৌক্তিক ও সে নিরপেক্ষতা আমি বজায় রাখতে পারি কিনা, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। অনেকে হয়তো ভ্রু কুঁচকে বলতে পারেন, "মনুষ্যত্ব শুধু পুরোনো অভিধান এবং পুরোনো অভিধান-পড়া ন্যুব্জপ্রায় মাস্টারসাহেবদের মাথায় দানা বেঁধে আছে। সমাজের কোথাও তো এসব আর নেই, পুরোনো এ ভূত তাড়াতে হবে। আমরা আধুনিক বস্তুবাদ ও ভোগবাদের স্বর্ণযুগে আবার সেই ক্ষয়ে-যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া 'মনুষ্যত্বের বিকাশ' কথার অবতারণা করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করছি কিংবা পত্রিকায় জায়গা দখল করছি"। এ বিষয়গুলো নিয়ে আত্মবিস্মৃত অতি-আধুনিক এই সমাজে তর্ক করার সৎসাহস বলুন আর দুঃসাহস বলুন– তা আমার নেই। আমার শুধু একটাই বিশ্বাস যে, এই নীতিহীন ধ্বংসোন্মুখ সামাজিক অবক্ষয়ের মূলে সমাজে বসবাসরত মানুষ নামের শ্রেষ্ট প্রাণির মধ্যে মনুষ্যত্বের অভাবই দায়ি। মানবিক গুণাবলির উজ্জীবন ও বিকাশ ছাড়া মানবজাতি এ সমাজে টিকতে পারবে না, মাথা উচু করে দাঁড়াতেও পারবে না। সুতরাং শিক্ষায় মনুষ্যত্ববোধের উজ্জীবন ও সঞ্চালন যে কোনো মূল্যে ঘটাতে হবে। মানুষকে ক্রমেই আরো সভ্য বানাতে হবে। সৃষ্টির সেরা জীব তৈরির উদ্দেশ্যকে সফল করতে হবে।

শিক্ষার সাথে বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্ক নিয়ে অনেক নিবন্ধ আমি এ কলামে লিখি। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষার তিনটি উপাদান একটা শিক্ষাব্যবস্থায় থাকতেই হবে, নইলে শিক্ষা অপূর্ণ রয়ে যায়। উপাদান তিনটিও বারবার লিখি: ১. জীবনমুখী শিক্ষা; ২. মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা; এবং ৩. কর্মমুখী শিক্ষা। তিনটি উপাদানের পুরোটা এক নিবন্ধে লেখা সম্ভব নয়। সেজন্য আজ মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা নিয়ে দুকথা বলার আশা রাখি। আগেই বলে রাখা ভালো যে, কোনো কোনো বিষয় আছে তিনটি উপাদানের মধ্যে পারস্পরিকভাবে একটির সাথে আরেকটি জড়িয়ে যেতে পারে। তবে তিনটির একটিকেও বাদ দিলে শিক্ষার কার্যকারিতা থাকে না বা শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন হয় না। আবার শিক্ষা ছাড়া সমাজ বন-জঙ্গলে রূপ নেয়।

আমাদের সমাজ গতিশীল, নিয়মিত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনটা নিম্নমুখী, না ঊর্ধ্বমুখী, এটা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে, যদিও এদেশে গোষ্ঠীস্বার্থ-সর্বস্ব

রাজনীতি চর্চা করতে গিয়ে মনুষ্যত্ববোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। মানুষের জন্যই সমাজ। সমাজে মানুষ বাস করে। সমাজের নিম্নমুখী পরিবর্তন হতে হতে ক্রমেই বুনো আবহে রূপ নিক, এটা নিশ্চয়ই আমরা কেউ চাই না। অথচ তা-ই হয়ে চলেছে। সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে, মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে। মানুষ মনুষ্যত্ব হারালে কী হয়? উত্তর একটাই– মানুষ পশুর সমতুল্য হয়ে যায়। মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য তখন থাকে না। পার্থক্য একটা থাকে: মানুষ দু-পায়ে হাঁটে আর পশু চার পায়ে হাঁটে। এটা দেখে যখন মানুষ না পশু চিনতে হয়, স্বভাবে চেনা যায় না, তখন মানুষের শ্রেষ্টত্ব আর থাকে না, সমাজ বসবাসের উপযুক্ততা হারায়। মনুষ্যত্ব আছে বলেই বিধাতা সৃষ্ট সকল প্রাণির মধ্যে এ প্রজাতির প্রাণিকে শ্রেষ্টত্ব দিয়েছে এবং মানুষ নামে অভিহিত করেছে। মনুষ্যত্বই যদি না থাকে, এ প্রাণিটা মানুষ নাম ধারণ করে কী করে! আমাদের সমাজে আমরা 'আত্মজিজ্ঞাসা' শব্দটা ভুলতে বসেছি। শুধু এক দিনের দৈনিক পত্রিকাটা পড়ে দেখুন। নিশ্চয়ই চোখে ধরা পড়বে, আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ আছে, কি নেই বা কি মাত্রায় আমরা এটাকে ক্রমেই হারাচ্ছি। আমি তো বাস্তব জীবনে ঘরে দরজা দিয়ে বসে থাকি না, এ সমাজেই ঘুরছি-ফিরছি, কাজ করছি, সমাজকে পর্যবেক্ষণ করছি। সমাজ ও রাষ্ট্রের যেখানেই সমস্যা দেখি, সেখানেই মনুষ্যত্বের অভাব চোখে পড়ে। সমাজের মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের মাত্রা যে কি পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, ভাবলে অবাক লাগে, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে; বিধাতার তৈরি সৃষ্টি-সেরা খলিফা (প্রতিনিধি)– মানব জাতির এহেন দশা দেখে ঘৃণায় মনটা রি রি করে। অনেক মানুষের চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে অন্য কোনো প্রাণি থেকে তাদেরকে আলাদা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এদেশ ও সমাজ পরিচালকদের চোখে এগুলো ধরা পড়ে না, শুধু আমার মতো কতিপয় মাস্টারসাহেবদের চোখেই ধরা পড়ে– এমনটি ভেবে আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করার দরকার নেই। একবার ভেবে দেখুন– আমরা কোথায় চলেছি! সমাজ ও দেশ-চালকদের শুধু অনুরোধ করে বলি, 'ভিক্ষার দরকার নেই মা, তোমার কুকুর ঠেকাও'। অনেকের সাথেই এ বিষয়ে কথা বলেছি। সমাজের আরো যাদের চোখে এসব ধরা পড়ে, তারা সমাজ-বিতাড়িত হয়ে ঘরে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত হয়েছে। তাদের চলমান এই সমাজে কিছু দেওয়ারও মনে হয় পরিবেশ নেই। এ সমাজে তারা ব্যাক-ডেটেড ও বোকা বনে গেছে।

'মনুষ্যত্ব' একটা শব্দ, কিন্তু অনেক গুণের সমাবেশ, যেমন– সততা, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ-হিতৈষণা, দেশপ্রেম, জাগ্রত বিবেক, ধর্ম-কর্ম, অহিংস মন-মানসিকতা, প্রতিটা জীবের প্রতি সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা ইত্যাদি। একটু ভেবে দেখি তো, এগুলো আমাদের সমাজে কতটুকু বিদ্যমান?

তাহলে সমাজ ও দেশ ভালোভাবে চলবে কীভাবে? এগুলো মানুষ একদিনে বা এক মাসের মধ্যে ইচ্ছে করলেই অর্জন করতে পারে না। উন্নত জাতি গড়তে গেলে এসব কাল-পরম্পরায় বসবাসরত মানুষের মধ্যে আসতে হয়। আদর্শ সমাজে এ গুণগুলো থাকতে হয়। এসব সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম শেখে ও চর্চা করে। আমাদের দেশে এসব না আছে সামাজিক শিক্ষার মধ্যে, না আছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে। মনুষ্যত্বের গুণই আমাদের মধ্যে না থাকলে, আমাদের কিসের এত বড়াই! কীসের এত বড় বড় লেফাফাদুরস্ত বক্তৃতা!

জন্মানোর পর থেকে মানুষ প্রকৃতি-প্রদত্ত কিছু শিক্ষা লাভ করে। সে শিক্ষা মানুষকে মানুষের মতো মানুষ তৈরি করে না। খিদে পেলে খাবারের কথা ভাবতে শেখায়। শীত লাগলে তা নিবারণের জন্য কোনো গরম জায়গার আশ্রয় খোঁজে ইত্যাদি। কিন্তু মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে গেলে, মানুষের মতো ভাবনা-চিন্তা করতে গেলে এবং সভ্য সমাজের একজন সদস্য বলে দাবি করতে গেলে মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। অথচ ক্লাসে পঠিত কোনো বইতে এগুলো আনতে ও শেখাতে আমরা খুবই গড়িমসি করি। এসব গুণাবলিকে পাশ কাটিয়ে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মহামানব তৈরি করার তালিম দিই। 'আকাশে শান্তির নীড়' রচনায় প্রবৃত্ত ও প্রবুদ্ধ হই। বিষয়টা কতটুকু বাস্তবসম্মত? একথা আমি জানি যে, ছেলেমেয়েদের একটা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে– প্রথম থেকে বড়জোর হাইস্কুলের শেষ পর্যায় পর্যন্ত মনুষ্যত্বের বীজ মনের গহীনে বুনে দিতে না পারলে পরবর্তী সময়ে মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য তাদের মনে, চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে আর ধারণ করে না; যাকে বলে, 'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস'। দুধ একবার ঘোলে রূপান্তর হয়ে গেলে সেখান থেকে মাখন পাওয়ার চেষ্টা দুরাশা। বানু মোল্লা তার সায়েরিতে লিখেছিলেন, 'পয়দাসের কালে যার ইস্পাত হলো চুরি, বালি দিলে ধার আসেনা খালি লোহার ছুরি'। আমি নিজেও দেখেছি, আন্ডারগ্রাজুয়েট ও গ্রাজুয়েট লেভেলে যতই 'প্রফেশনাল এথিক্স', 'বিজনেস এথিক্স' পড়িয়ে 'এ' গ্রেড অর্জন করুক না কেন, কর্মজীবনে গিয়ে অনেকেই দুর্নীতি কিংবা যে কোনো অসদুপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা করে না। মূলত প্রাথমিক পর্যায় থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত মনুষ্যত্বের বীজ মনের গভীরে বপন করে দিতে না পারলে আজীবন আর মনুষত্বের চর্চা হয়ে ওঠে না। এ বিষয়ে প্রত্যেকের পরিবার একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এটা বাস্তবে দেখেছি। বর্তমানে যেহেতু সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের চর্চা নেই বললেই চলে, এদেশের সমাজে যে মনুষ্যত্বের চর্চা যতটুকুই চলছে– তা নিজ নিজ পারিবারিক শিক্ষারই অবদান। আবার কখনো 'গোবরেও পদ্মফুল ফোটে'– একথাও সত্য, তবে ব্যতিক্রম।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। আমি আর ব্যাপক পরিবর্তনের কথা বলি না, শুধু এ সম্পর্কীত কতকগুলো দফা বা বিষয় (আইটেম) সিলেবাসে ঢুকাতে বলি। এর জন্য সদিচ্ছাই যথেষ্ঠ। বিবর্তনবাদের ধারায় 'মানুষ থেকে বানর পয়দা হয়েছে', না কি 'বানর মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে'– এ তর্কে যাবার আমার আদৌ কোনো ইচ্ছা আজ নেই। তবে এটা সত্য যে, কোনো কোনো মানুষ বানরে রূপান্তরিত হয়েছে। যা-ই হোক, আমি বর্তমান সমাজের মানুষকে মানবতার বৈশিষ্ট্যসংবলিত সত্যিকারের মানুষরূপে চিন্তা-চেতনা ও কর্ম করতে দেখতে চাই, যাদেরকে আমি এদেশের মানবসম্পদ বলে গণ্য করতে চাই। নইলে আমরা চিৎকার করে বড় বড় যত আপ্তবাক্য মুখ দিয়ে উদ্‌গিরণ করি না কেন, 'সকলি গরল ভেল'। মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের চেষ্টা অধরাই রয়ে যাবে। এজন্য শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে শিক্ষার্থীর মনুষ্যত্ব জাগ্রত করতে পারে এমন শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষায় 'ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষাপদ্ধতি'র প্রচলন করতে হবে। এসব করতে সরকারের বেশি টাকা খরচ হবে না। 'মনুষ্যত্ববোধ-জাগরণ কত প্রকার ও কি কি' ইত্যাদি মুখস্ত করিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানো যাবে না। তাদেরকে ব্যবহারিকভাবে এ শিক্ষার তালিম দিতে হবে, শিক্ষায় মানবিক গুণাবলির প্রয়োগ করতে হবে, চর্চা করাতে হবে। সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এ গুণের বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষক ও সমাজ-পরিচালকদের আচার-আচরণ, চিন্তাধারা ও কাজের মান ছাত্রছাত্রী ও সমাজের জন্য অনুকরণীয় হতে হবে।

এদেশ থেকে দেশীয় মূল্যবোধ, মানবতাবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা, বিবেকবোধ ইত্যাদি হঠাৎ করে চলতি পথে হারিয়ে গেছে কি না, তার কোনো দিনক্ষণ ঠিক নেই, এটা নিয়ে তর্কে নামারও প্রয়োজন নেই। তবে এ গুণগুলো ফিরিয়ে আনা কোনোক্রমেই সহজসাধ্য কোনো বিষয় নয়। নানা লিমিটিং ফ্যাক্টর একে প্রভাবিত করবে। ফিরিয়ে আনা আবার কঠিন বিষয়ও কিছু নয়। তবে এক মাস বা এক বছরের বিষয়ও এটা না। গঙ্গামুখো পা দিয়ে বসে থাকলে চলবে না, আগে আমাদের ইচ্ছা থাকতে হবে। মানবিক গুণের শিক্ষা ও চর্চা শুরু করতে হবে। একবার ঘটা করে শুরু না করলে এগুলো সমাজে কখনোই স্বেচ্ছায় ফিরে আসবে না। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের লেখা কবিতা সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণিতে পড়েছিলাম, 'যে চাষা আলস্যভরে, বীজ না বপন করে, পক্ক শস্য পাবে সে কোথায়?' এখন বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষামূলক সাহিত্য প্রায় উঠে গেছে। সুকর্ম নেই, চর্চাও নেই, দূরদর্শী সমাজ-পরিচালক নেই, জাত শিক্ষকেরও অভাব। আমাদের টাকা-পয়সা, ঐশ্বর্য, শান-শওকত, আভিজাত্য, চটকদার কথার কোনো অভাব নেই; অভাব মানুষের

মতো মানুষের, অভাব আদর্শবান মানুষের, অভাব সমাজে ভালো কথা বলা লোকের। ছাত্রছাত্রীরা শিখবে কোত্থেকে! কয়েক বছর আগে দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য কলামে একটা কবিতার অংশ চোখে পড়লো, 'আমার হৃদয় মাঝে কই মাছ খলখল করে'। চোখটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিলাম। আমরা আমাদের অপরিপক্ব ছাত্রছাত্রীদের কোমল হৃদয়ে কই মাছ ও অশ্লিল ছবিতে ভরা মোবাইল ফোন ঢুকিয়ে দিয়ে যতই খলখলাতে চেষ্টা করি, আমাদের বোঝা ও ভাবা প্রয়োজন, তার মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ ঘটছে কি না। তারা তো এ সমাজেরই ভবিষ্যত নাগরিক। আবার সেই বানু মোল্লার সায়েরি থেকেই সার-কথা বলতে হয়: আমরা ইস্পাত চুরি করে খালি লোহার ছুরিতে ধার আনতে চেষ্টা করছি কেন?

আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষক ও সমাজ-পরিচালকদের অপরিণামদর্শী না হয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন এই সম্ভাবনাময় শিশু-কিশোরদের হৃদয় মাঝে' কোনো অপশক্তি কই মাছ ঢুকিয়ে খলখলাতে না পারে। প্রতিটা ছাত্রছাত্রীকে দেখলেই যেন চেনা যায় যে, তারা এ দেশের মানবকুলে জন্ম নিয়ে 'মানুষের মতো মানুষ' হয়েছে এবং তাদের হৃদয়ে মনুষ্যত্বের বীজ পুরোপুরি রোপিত হয়েছে, যা অন্য জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার সম্মিলনে একদিন ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে এদেশকে সুশোভিত করবে। এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

(প্রকাশ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

রাজনীতির চোরাবালি ও আমাদের শিক্ষা

সকালের পত্রিকায়ই পড়লাম নির্বাচনে ভোটপ্রার্থীদের কর্মীদের মধ্যে অনেক জায়গায় মারামারি শুরু হয়ে গেছে, রীতিমতো কোপাকুপি। আমরা এদেশে জন-মানসিকতাকে দু-ভাগে ভাগ করতে পারি– ১. স্বাভাবিক মানসিকতা; ও ২. রাজনৈতিক বিকৃত মানসিকতা। যারা আমজনতা, কারো সাতে-পাঁচে নেই, 'অন্ন চিন্তা চমৎকার'– তাদের স্বাভাবিক মানসিকতার ধারক বলে মেনে নেওয়া যায়। রাজনৈতিক মানসিকতার ধারকদের কাণ্ডজ্ঞান ও ঐচিত্যবোধ বলতে কিছুই থাকে না। রাজনৈতিক সভায় চেয়ারে বসা নিয়েই যেখানে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যায়, সত্য-মিথ্যার বাচবিচার না করে যে কোনো কথা বলে দিতে পারে, আত্মজিজ্ঞাসার অভাব। এমনই হাজারো অব্যবস্থাপনা ও জিঘাংসা যেখানে নিত্য ঘটে– এসবই রাজনৈতিক বিকৃত মানসিকতা। আমরা জানি আগামী মাসে নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছে। দেখছি নির্বাচন প্রতিযোগিতা, আসন ভাগাভাগি ইতোমধ্যেই শেষ। যিনি বরের মা, তিনিই তো কনেরও মা। তবে কেন আবার এ নিয়ে মারামারি? এত রিহার্সল? তবে কেন এ প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ?

অনুসন্ধিৎসু পাঠকমহল আমাকে জানেন, আমি এদেশের রাজনৈতিক দলের এহেন মানসিকতাকে ভালো চোখে কোনোদিনই দেখিনে। এগুলোকে ভালো চোখে দেখতে গেলে আগে আমার পেশা বদল করতে হবে। এসবের জন্য আমি রাজনীতিকে দায়ী করি না, দায়ী করি 'মহান রাজনীতিক'দের মানসিকতাকে। এ ধরণের রাজনৈতিক মানসিকতার লোকে পুরো দেশটা ছেয়ে গেছে। জীবনের প্রতিটা পর্যায়ে 'মুখে এক, অন্তরে আরেক' কিসিমের লোকের সমারোহ। রাজনীতি ও নির্বাচন যে পথে গেছে, এদেশের সমাজ, সামাজিক শিক্ষাও সেই পথে গেছে। সমাজ ও সামাজিক শিক্ষার পিছু পিছু চলেছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। শিক্ষা নিয়ে আজ কিছু লিখতে চেয়েছিলাম। অনেকেই পত্রিকায় তাদের বিভিন্ন মতামত এ নিয়ে প্রকাশ করে চলেছেন। আমারও সে-ইচ্ছে। এতক্ষণে যা লিখছি তা মূলত গৌরচন্দ্রিকা।

রাজনীতির ধরন-ধারণ, সমাজ ও সামাজিক শিক্ষার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সরাসরি সহগামী সম্পর্ক আছে। রাজনীতি ও সামাজিক শিক্ষা যত নীচে নামবে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গতিও সেদিকে যাবে। রাজনৈতিক বিকৃত মানসিকতার অস্তিত্ব এদেশে অবস্থান করলে শিক্ষার মান কোনো দিনই বাড়বে না, একথা নির্ভেজাল সত্য। বিকৃত মানসিকতার চর্চা যতদিন থাকবে– শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, টাকার বিনিময়ে অযোগ্য দলীয় লোকের নিয়োগ-বাণিজ্য, স্বজনপ্রীতি ততদিন

থাকবে। আইনের শাসন যতদিন এদেশে ফিরে না আসবে, শিক্ষা ভালো পথে ফিরে আসতে পারে না, তা আমরা যত হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেই শিক্ষানীতি তৈরি করি না কেন। আমি এসব কথা বলে পরিবেশকে বোঝাতে চাচ্ছি। সুস্থ পরিবেশের সাথে শিক্ষার উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমি সব সময় জীবনের বাস্তবতা দিয়ে উদাহরণ দেই। একজন শিক্ষক হয়ে যত জায়গায়ই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা সমাজকর্মে সুনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছি, দুর্নীতিবাজরাই দুর্নীতি করে আমাকে আবার পাল্টা দুর্নীতিবাজ বলে পিছু হটিয়েছে। বর্তমানেও এমনই একটা সমাজ কর্ম করতে গিয়ে মান-সম্মান ও নীতি নিয়ে সরে আসা দায় হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা সর্বত্র। সমাজে বসবাসরত অধিকাংশ মানুষ লা-জবাবি হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে। প্রতিবাদে এগিয়ে আসে না। অথচ ভালো ফল পেতে চায়। যে সমাজে জাগ্রত বিবেকবোধের দংশন নেই, দেশ জুড়ে অন্যায়-অবিচারের দৌরাত্ম্য, রাজনৈতিক বিকৃত পরিবেশ থেকে অন্যায়-অবিচার সমাজের লোকজন প্রকাশ্য শিখছে। সেখানে ন্যায় ও সুশিক্ষা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন? দিন যত যাচ্ছে, সামাজিক সুশিক্ষার পরিবেশ, সুস্থ চিন্তার বিকাশ তত উচ্ছন্নে যাচ্ছে। আমরা নিজের জাগ্রত বিবেককে বিসর্জন দিয়ে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ বা রাজনীতির ধামাধরা হয়ে বসে আছি। সকল অন্যায়-অপরাধ ওপেন-সিক্রেট হয়ে গেছে। আত্মবিশ্লেষণ অশিক্ষা-কুশিক্ষার শুঁড়ি-পোকার দৌরাত্ম্যে নিজের অজান্তেই বিলীন হয়ে গেছে। আমরা বুলিসর্বস্ব আদম সন্তানে পরিণত হয়ে গেছি। মুখে এক কথা বলছি, অন্তরে ভিন্নটা। ইসলামি লিটারেচারে যাকে 'মোনাফেক' বলে জানি। আমি অনেক লোকের মধ্যে মোনাফেকি আচরণ দেখছি, কিন্তু তাকে বলার পরিবেশ নেই। সে-ই বরং আমাকে মোনাফেক, কখনো-বা দুর্নীতিবাজ আখ্যায়িত করে স্বদম্ভে সমাজে বুক ফুলিয়ে চলছে। এ অবস্থা দেখে আমি যে এই শেষ জীবনে বড্ড ক্লান্ত ও শ্রান্ত বোধ করছি! শুধু ভাবছি, এ থেকে আর কতদিনে এদেশের সাধারণ মানুষ নিস্তার পাবে! আমি শুধু রাজনীতির পরিবেশের কথাই বলছি না, সমাজের প্রতিটা পর্যায়ে, রন্দ্রে রন্দ্রে এ অশুভ বিলয়-চক্র প্রবল আকার ধারণ করেছে, অপকর্ম নিত্য-নির্নিমেষ বিদ্যমান। এ শোচনীয় অবস্থা রাজনীতির তখত-তাউস (ফারসি তখত + আরবি ত্বাউস) থেকে গরু-মোষের হাট পর্যন্ত বিসারিত।

পল্লিকবি জসিম উদ্দিনের কবিতায় পড়েছিলাম, 'সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমনই আছে, কি জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গেছে'। সোনামুখ, গোলগাল হাত থেকে কী লাভ! মা-ই যদি চলে যায়! কবর তখন অনিবার্য

হয়ে দাঁড়ায়। আমরা কি 'মা' চলে যাওয়া ঠেকাতে পারি না? মনুষ্যত্বই যদি না থাকে তবে মানুষ থাকে কি করে? স্কুল-কলেজের বড় বড় বিল্ডিং, লাখ লাখ শিক্ষক, সবুজ খেলার মাঠ, শিক্ষা অফিসার, শিক্ষার জন্য মন্ত্রণালয়, হাজার হাজার কোটি টাকার বাজেট– কী হবে এসব করে, শিক্ষাই যদি না থাকে? সামাজিক শিক্ষাই যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়? পড়া আর না-পড়া যদি একাকার হয়ে যায়? শিক্ষিত লোক আর অশিক্ষিত লোকের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়ার মতো যদি কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকে? আমি তো অনেক শিক্ষক– এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকের মধ্যেও শিক্ষা খুঁজে পায় না। একটা কেস-স্ট্যাডি গল্প আকারে বলছি। শিক্ষার দশা নিয়ে আলোচনা করছি বলেই বলছি। কয়েকদিন আগে একটা সামাজিক কাজে অনেকবার মিটিংয়ে বসতে হয়েছিল। সবাই উচ্চপদস্থ সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, ভদ্র-মার্জিত রুচির লোক। এক অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে সেখানে পেলাম– তার ভাষাজ্ঞান ও পরিবেশজ্ঞান জঘণ্য, মন-মানসিকতা খুবই নিম্নমানের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিষদের মিটিংয়ে বিরোধী গ্রুপের সাথে যা করে অভ্যস্ত, সেমতো এখানেও কথায় কথায় জামার হাতা গুটিয়ে ভদ্রলোকদের দিকে তেড়ে আসছেন, চুগলখোরি করেন। মিটিং শেষে মিটিংয়ের তথ্য ডক্যুমেন্টসহ পাচার করেন। নিজেকে খুব উঁচু ভাবেন। আমিও শিক্ষক হওয়ায় নিজেকে লজ্জিত বোধ করলাম। তার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিলাম। সেখানে আমার অসংখ্য ছাত্র বর্তমানে প্রফেসর। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি ছাত্র-রাজনীতির ক্যাডার ছিলেন। নব্বইয়ের দশকে রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে শিক্ষক হয়েছিলেন। তিনি সমাজকে ও ছাত্রদের কী শিক্ষা দেবেন! এই তো আমাদের দেশীয় শিক্ষানীতি! কতিপয় এমন দলবাজ, বিকৃতমনা ও দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের দৌরাত্ম্যে আমাদের সকল পর্যায়ের শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে।

আমরা শুধু সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও রাজনৈতিক আনুগত্যের দিকে ঝুঁকছি বলেই দেশ ও জীবনের সব ক্ষেত্রে এ উড়নচণ্ডী দশা। এ দশা দেশের প্রশাসন, ভোটের মাঠ ও শোবারঘর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এ অজ্ঞতা ও মূর্খতা এ সমাজের মানুষের মনুষ্যত্বের ওপর হানা দিয়েছে। মানুষকে অমানুষ ও নির্লজ্জ বানিয়েছে। যে জাতি যত শিক্ষিত, বিশ্বের মানচিত্রে সে জাতির মর্যাদা ও অবস্থান তত সুসংহত ও সুসমৃদ্ধ। শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি, তা-ই তো আমরা পরিষ্কার করে বলি না। এ পত্রিকায়ই অনেকবার লিখেছি, শিক্ষা হতে হবে তিনটি উপাদানের সম্মিলন– জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা এবং কর্মমুখী শিক্ষা। সে প্রচেষ্টা কোথায়? সে-কথা কি কোনো পক্ষ কানে তুলেছেন? শিক্ষা নিয়েও দলবাজি, স্বজনপ্রীতি, মতলববাজি, মনের কোণে লুকিয়ে রাখা পরিত্যক্ত মতবাদ। এগুলোই

বাঙালি জাতির স্বকীয় সত্তা ধ্বংসের পূর্ববার্তা। কেউবা আমাদের বাঙালিকে লেখাপড়া শিখিয়ে ইংরেজ বানাতে চায়, কেউবা চায় জাপানি বানাতে, কেউবা চায় আমেরিকান বানাতে। যে দেশ যখন ভ্রমণ করে আসে, সে-দেশের কালচার, শিক্ষাব্যবস্থা, সিলেবাসসহ কপি করে নিয়ে আসে। এখানে এসে শুধু পেস্ট করে দেয়। বাঙালির সমাজবোধ, রীতিনীতি, চৈতন্যবোধ, সামাজিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক বুনন, দেশীয় সংস্কৃতি ও পারিবারিক কাঠামো যে ভিন্ন ধরনের– সেসব বেমালুম ভুলে যায়। আমরা নিজেদের জাতিগত স্বকীয় অস্তিত্বকে বজায় রেখে শিক্ষিত হতে চাইনে, চাই অন্য জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে। আমাদের চিন্তার এ দীনতা ও হীনতা পাঠক্রমের মধ্যে প্রকাশ পায়। জাতিগত সত্তা গঠনে প্রায়ই প্রকাশ পায় না। একটা সজীব ও চলমান জাতি তো কোনো একচোখা বুদ্ধিজীবীর নিগড়ে বন্দী হতে পারে না। তাতে জাতি পথ হারায়, অন্য জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। সে জন্য কোনো শিক্ষানীতি বা পাঠক্রম দলনিরপেক্ষ সুশিক্ষিত একদল লোকের হাতে করানোই উচিত। আমি তো একথা প্রায়ই বলি, লেখা ও পড়া অনেক ভালো জানলেই তাকে সুশিক্ষিত লোকের খাতায় নাম লেখানো যায় না। রাজনীতিকদেরও আমি এ বিষয়টা ভেবে দেখতে বলি। রাজনীতির মারপ্যাচ আর শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি এক বিষয় নয়।

সদ্য প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নানাজন নানাভাবে সমালোচনা করছেন। অনেক ক্ষেত্রেই আমি দ্বিমত পোষণ করি। এ শিক্ষাব্যবস্থার সবটুকুই খারাপ নয়। এর অনেক ভালো দিকও আছে। এদেশের প্রায় প্রতিটা পরিকল্পনারই তো বাস্তবায়ন সমস্যা। এ শিক্ষাব্যবস্থারও বাস্তবায়ন সমস্যা রয়ে গেছে, যা অল্প দু-এক বছরেই বোঝা যাবে। অব্যবহিত আগের শিক্ষাব্যবস্থারও বাস্তবায়ন সমস্যা ছিল। যে একটি দোষে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকেই আমরা 'খুব খারাপ','খুব খারাপ' বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ওস্তাদ যদি দাঁড়িয়ে কীর্তন গায়, শিষ্যরা আবার পাক দিয়ে নাচে, ওস্তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। আমরা নতুন শিক্ষা-প্রজেক্ট নামে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছি। এতে অনেক পক্ষেরই পকেট ভারী হয়েছে। এদেশে সরকারি টাকা বরাদ্দ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে তো আমরা বেশ উদার। 'নাচতে জানি না, উঠান বাঁকা' বলে কৃতিত্ব জাহির করি। অথচ অব্যবহিত আগের পাঠক্রমের বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো, দুর্বলতাগুলো কিছু টাকা খরচ করে দূর করে নিলেই ভালোভাবে চলতো। বিশ্বের অনেক দেশে ঐ 'ব্লুমস্ ট্যাক্সোনমি' দিয়েই তো এখনোও চলছে। সাথে এখন যোগ করেছে 'আউটকাম বেইজড এডুকেশন'। মূলত দুটো পদ্ধতি বেশ কাছাকাছি। আমাদের দেশে 'সৃজনশীল পদ্ধতি'ও ছিল 'ব্লুমস্ ট্যাক্সোনমি'র একটা প্রায়োগিক অংশ, নতুন কিছু নয়। আমরা সেটা

বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। আমাদের ব্যর্থতার দায় পাঠক্রমের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। বাস্তবায়ন হয় না দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কারণে; দোষ গিয়ে পড়ে পাঠক্রমের ওপর। বর্তমান পাঠক্রমের মূল্যায়ন পদ্ধতিসহ বেশ কিছু পরিবর্তন জরুরি, এটা মানি। কিন্তু ছুঁড়ে ফেলার মতো নয়। সিলেবাস পরিবর্তন একটা চলমান প্রক্রিয়া। এটাতে হাত দিলেই হয়। এর জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ লাগে না। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা উঠিয়ে দিতে চাইলেও তেমন একটা খরচের প্রয়োজন হয় না। আগে দেশের রাজনীতি ও সমাজ থেকে মিথ্যাচার, অনাচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দুরাচারবৃত্তি, অবৈধ টাকার খেলা দূর করা অবশ্যম্ভাবী, তাহলেই শিক্ষাব্যবস্থা ভালো হয়ে যাবে। আমারা শিক্ষার প্রতিটা পর্যায়ে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি করে অসংখ্য অযোগ্য, দলবাজ, বিকৃত-মানসিকতার জনবল ইতোমধ্যে নিয়োগ দিয়ে ফেলেছি। এর প্রভাব তো আগে আমাদেরই ভোগ করতে হবে। জমিতে বপন করবো পোকায় খাওয়া নিম্ন জাতের গম আর ফসল ঘরে তুলবো উন্নত ফলনশীল মোটা-দানার গম, তা কী করে হয়?

নতুন সিলেবাসে কোনো কোনো শ্রেণিতে আমরা ছাত্রছাত্রীদের রান্নাবান্নার কাজ শেখাতে চাই। এর জন্য বাড়ি থেকে রান্না করে স্কুলে আনতে বললে রান্না শেখার কি দশা হবে আমরা সবাই জানি। বাজার করবেন বাবা, রান্না করবেন মা। স্কুলে আনার পর পেট পুরে ভোজন করবেন শিক্ষাগুরুরা। রান্না শেখা ঐ পর্যন্তই। কোনো কাজের ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার আগে বাঙালির সামাজিক চরিত্র ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন। আমরা আগে ভাবিনে। পোস্ট-মর্টেম করার পরে টের পাই। ততক্ষণে রোগীর কর্ম কাবার। এমনটিই হবে সিলেবাসভুক্ত আরো অনেক কিছু শেখার অবস্থা। এত অল্প পরিসরে সব বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সবকিছু করতেই দেশীয় পরিবেশ বিবেচনার দাবি রাখে, যেটা আমরা সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। ফল যা হওয়ার তা-ই হয়।

(প্রকাশ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা- সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

চাই জীবনমুখী, মানবিক ও কর্মমুখী শিক্ষা

এ কলামে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে লিখে চলেছি। এর আগের কয়েকটা নিবন্ধে শিক্ষার ভিত্তিমূল ও উপকরণ বিষয়ে লিখেছিলাম। শিক্ষা, পরিবেশ, সমাজের বর্তমান অবস্থান, আমাদের অবস্থা, শিক্ষার গুরুত্ব, দেশের উন্নয়নে মানবসম্পদের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়েও লিখেছি। ফল কতটুকু পেয়েছি এ নিয়ে আমি সন্দিহান। কারণ এদেশের মানুষ শিক্ষামুখী নয়, বরং রাজনীতিমুখী। যুব সমাজের বৃহদংশ শিক্ষাবিমুখ এবং সময় কাটানোর জন্য ফেসবুকমুখী। মানুষ রাজনীতির পরিবর্তন ও ঘটনা নিয়ে যতটা না অবহিত, শঙ্কিত ও বিজড়িত থাকে, বলা যায় তার একশ ভাগের দশভাগও শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। অবশ্য রাজনীতির পরিবেশের ওপর শিক্ষামানের উন্নতি-অবনতি বহুলাংশে নির্ভরশীল, একথা সত্য। তাই কেউ যদি কাউকে প্রশ্ন করে, 'আপনাদের দেশে শিক্ষার দশা কেমন? এক কথায় এর উত্তর আসবে 'রাজনীতির দশা যেমন, তেমন'। দেশে শিক্ষামানের যদি অধঃপতন ও মানহীনতা হয়ে থাকে তার জন্য এদেশের রাজনৈতিক পরিবেশের অধঃপতনকেই সরাসরি দায়ী করা যায়। একমাত্র অভিভাবকরাই এজন্য উদ্বিগ্ন ও দিশেহারা। 'কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।' পরিবেশের কারণে যাদের ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে এবং এখনও নষ্ট হতে চলেছে– তাদের অনুশোচনা ও ছটফটানি অন্য কেউ বুঝতে সমর্থ হবে না বা বুঝতে চাইবেও না। আমরা অর্থাৎ মাস্টারসাহেবদের অনেকেই তা সচোক্ষে দেখছি বলেই বলছি। বলছি, শিক্ষার উন্নয়ন মানেই সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়ন। একথা অস্বীকার করার জো নেই।

যাহোক, এর আগে শিক্ষার ভিত্তিমূল নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 'শিক্ষায় সাত-আর' (Seven Rs in Education)-এর কথা বলেছিলাম। সেগুলো হলোঃ পড়া (Reading); লেখা (WRiting); অঙ্ক (ARithmetic); ধর্ম (Religion); গবেষণা/পর্যবেক্ষণ (Research); জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধ (Roused-conscience and Values); এবং ন্যায়নিষ্ঠা (Righteousness)। এছাড়াও শিক্ষার উপকরণ নিয়ে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করেছিলাম, যেগুলো হলোঃ শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, পরিবেশ, শিক্ষা-উপকরণ ও শিক্ষাপদ্ধতি এবং পাঠ্যক্রম। এ বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার দাবি রাখে। আজ শিক্ষার অভিমুখিতা নিয়ে অল্প পরিসরে কিছু বলবো।

আমার বিশ্লেষণে প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষার অভিমুখিতা হবে তিনটিঃ ১. জীবনমুখী শিক্ষা; ২. মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা; এবং ৩. কর্মমুখী শিক্ষা। এ কলামেই বিষয়গুলো অন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অনেকবারই তুলে ধরেছি, যদিও

ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব হয়নি। সকল শিক্ষাই মূলত জীবনমুখী শিক্ষা বা জীবনের জন্য শিক্ষা। তবুও প্রত্যেক মানুষের সাবলীল ও সাধারণ জীবন নির্বাহ বা অতিবাহিত করার জন্য সাধারণভাবে বাস্তবকেন্দ্রিক কিছু শিক্ষা প্রতিনিয়ত কাজে লাগে, তা সে যে পেশাতেই থাকুক না কেন, এখানে জীবনমুখী শিক্ষা বলতে সেগুলোকেই বুঝাতে চাচ্ছি; এগুলোকে 'লাইফ স্কিলস'ও বলতে পারি। জীবনের প্রারম্ভেই স্কুল এবং বাড়িতে এগুলো ব্যবহারিকভাবে শেখা ও চর্চা করা প্রয়োজন। যেমন– যেখানে-সেখানে থুথু না ফেলা, টয়লেট ব্যবহার শেখা, মানুষের সাথে কথা বলা (আদবকেতা) শেখা, ভালো কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন, সাধারণ রান্না, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রাস্তা পার হতে শেখা, যানবাহনে আরোহণ, শরীর চর্চা, সাঁতার শেখা, বাংলা শুদ্ধ উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি, ট্রাফিক রুলস, দুর্যোগকালীন করণীয়, ভালো সুনাগরিক হতে শেখা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা (ঘরবাড়ি ও প্রাঙ্গণ), বিভিন্ন রকম গিরা (Knot) শেখা, মিথ্যা কথা না বলা, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতে শেখা, নেশার ক্ষতিকর দিক ও পরিণতি, সেলাই করা-বোতাম-হুক লাগানো শেখা, কাপড় ধোয়া, ই-মেইল ম্যানার্স, টেলিফোন ম্যানার্স, টেবিল ম্যানার্স, সামাজিক দায়িত্ববোধ শেখা, নিজের ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ শেখা, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শেখার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা, সময়জ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞান শেখা, হাতের কাজ (পুরোনো জিনিস থেকে নতুন জিনিস তৈরি), সর্বজনীন পরমত সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বজায়, প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা/স্বাস্থ্য সচেতনতা, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার রোধ, প্রতিদিনের পত্রিকা পড়া, ক্লাসের বইয়ের বাইরেও বই পড়া, কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহার শেখা, অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি ও থিংকিং, প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি ইত্যাদি। সব শ্রেণির জন্য সব শেখা উপযোগী নয়। এগুলো কোনো একটা ক্লাসে একবার শেখালে চলবে না। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির মধ্যে ভাগ করে কোনো কোনোটা একাধিকবারও শেখাতে হবে।

মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা: সেই আদিকাল থেকে মানবজাতিকে এ ভূ-পৃষ্ঠে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম মানুষের কাজ-কর্ম, চিন্তা চেতনায় সুষ্ঠু মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করার সুবিধা দিয়ে আসছে। এমন কোনো ধর্ম নেই, যার মূলমন্ত্র ও অবস্থান বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবতার বিরুদ্ধে। মনুষ্যত্ব আছে বলেই আমরা মানুষ। ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও শিক্ষা আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ বপন করে। ধর্ম স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য পালন ছাড়া আর কিছুই না। শিক্ষায় ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষাকে ধর্মবিচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। শিক্ষায় সেক্যিউলারিজম এনে শিক্ষাকে

ধ্বংস ও মানবজাতিকে লক্ষ্যচ্যুত করা হয়েছে। আমরা ভোগবাদে আসক্ত হয়েছি। সেক্যুিউলারিজম হলো: 'নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়– এই মতবাদ'। আলো না থাকলে আঁধার থাকাটাই স্বাভাবিক, তেমনি মানুষের মনের মনিকোঠায় ধর্ম ও নৈতিকতা না থাকলে অধর্ম ও দুর্নীতি থাকাটাই অনস্বীকার্য। মানুষের মন থেকে মনুষ্যত্ব যত দূরে সরে যাবে, মানুষ তত স্বার্থবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, ভোগবাদ ও বন্যপ্রাণি-সাদৃশ হয়ে উঠবে। যে শিক্ষায় সততা, আদর্শ ও মনুষ্যত্ব নেই, নৈতিকতা নেই– সে শিক্ষা মূল্যহীন ও অচল। একমাত্র মনুষ্যত্বই পারে এ ভূ-পৃষ্ঠে মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখতে।

বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রতিটি দেশের শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে সিএসআর, কোড অব কর্পোরেট এথিক্স, কোড অব প্রফেশনাল এথিক্স, বিজনেস এথিক্স ইত্যাদি নামে অনেক কোর্সই পড়ানো হচ্ছে। এগুলো ধর্মের আংশিক প্রতিস্থাপন। ধার্মিকতা শব্দটা এড়িয়ে গিয়ে বা ধর্মকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে আইন ও নিয়ম আকারে ভিন্ন নামে এগুলোকে চালু করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু জীবনের প্রারম্ভ থেকে মনের গভীরে মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণের বীজ ভালোমতো প্রথিত না-হয়ে থাকার কারণে এথিক্সের সব মুখস্তবিদ্যা কাগুজে বাঘ হয়ে দেখা দিচ্ছে। এতে সমাজে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে মনুষ্যত্বহীন শিক্ষা ফলপ্রসূ হচ্ছে ও কোনো ভালো কিছু করতে পারছে কী-না আমরা সকলেই তা অবহিত। এ জন্য ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই মনুষ্যত্বের বীজ বপন করাটাই যুক্তিযুক্ত। মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা বলতে মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলে এমন শিক্ষা বলা যায়। শিক্ষিত মানুষ জাগ্রত-শাণিত বিবেকের অধিকারী হতে হবে। বিবেকহীনতা ও মনুষ্যত্বহীনতা থেকে সব অন্যায় ও অবিচারের জন্ম। মানুষের মনের অন্ধকার ও অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে তার মধ্যে সুবিচারের ক্ষমতা ও বোধশক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে, যাতে মানুষ নিজেই নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। আত্মশুদ্ধি মানেই বিবেক বৃদ্ধি– জাগ্রত বিবেকের সৃষ্টি। ধর্মগ্রন্থে এসেছে, 'নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে– যে নিজের নফস বা আত্মাকে কলুষতা থেকে মুক্ত করেছে। আর সে অকৃতকার্য হয়েছে, যে নফসকে কলুষিত করেছে'।

ন্যায়নিষ্ঠা, মানবসেবার মনোভাব, দেশপ্রেম, নৈতিকতা, সততা, চারিত্রিক অখণ্ডতা (ইন্টিগ্রিটি), বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, স্বচ্ছতা, সৎকর্মপরায়ণতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, প্রতিহিংসা-মুক্ততা, অকৃত্রিমতা, সত্যের প্রতি আনুগত্য, জেনেশুনে সত্য গোপন না করা, শঠতা-চৌর্যবৃত্তিহীনতা প্রভৃতি সবই মনুষ্যত্বের

গুণ। এ গুণগুলো মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে মহিমান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। মানুষের মধ্যে এসব গুণের অনুপস্থিতি এদেশকে ভোগাচ্ছে। এসব গুণ যত বেশি ছাত্রছাত্রী ও মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যাবে, ততই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে। দেশের প্রতিটা পর্যায়ে মানুষ আইনের শাসন, সুনীতি ও ন্যায়বিচার পাবে। রাজনৈতিক উৎপীড়ন, লুটপাট ও নৈরাজ্য থেকে দেশ রক্ষা পাবে। এভাবেই আদর্শ মানুষ কর্তৃক আদর্শ-জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এসব গুণকে ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে বাস্তব ট্রেইনিং আকারে বার বার গেঁথে দিতে হবে এবং প্রাকটিস করাতে হবে।

কর্মমুখী শিক্ষা: শিক্ষা মানুষকে কোনো না কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অনেকেই একধরনের কাজ করলে সেটা একটা পেশাতে পরিণত হয়। প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো পেশা থাকতে হবে, যেখান থেকে উপার্জিত অর্থ বা রোজগার দিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করবে। অন্য কোনো প্রাণি প্রকৃতি থেকে খাবার সংগ্রহ করে খেয়ে বেঁচে থাকে। মানুষকে প্রয়োজনানুযায়ী মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনসামগ্রী সংগ্রহ করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হয়। সেজন্য প্রত্যেক মানুষের এমন কিছু শেখার প্রয়োজন, যে শিক্ষা ব্যবহার করে জীবিকার্জন করা সম্ভব। এজন্য কাউকে মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে কোনো টেকনিক্যাল কিংবা ভকেশনাল শিক্ষায় ট্রেইনিং নিয়ে পেশা বেছে নিতে হবে। কেউবা উচ্চশিক্ষা অর্জন করে উচ্চ কোনো পেশায় যাবে। সার্টিফিকেটসর্বস্ব কোনো উচ্চশিক্ষা অর্জন করে বেকারত্বের গ্লানি ভোগ করার চেয়ে টেকনিক্যাল শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে কোনো পেশাদারী হওয়া কিংবা ব্যবসা করা অনেক ভালো। অনেক টেকনিক্যাল বিদ্যাধারীকে আমি ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে অন্য কর্ম-অন্বেষিদেরকে সাথে নিয়ে ভালোভাবে ব্যবসা করতে দেখেছি। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়ে তাকে মনমতো পেশার দিকে আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে। এ দায়িত্ব তার শিক্ষকের। এদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে লাখ লাখ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। অসুবিধা হচ্ছে সেখানে হাতে-কলমে কাজ শেখানো হয় না। সার্টিফিকেট বিলি করা হয়। এ অবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শক্ত কোনো ধাক্কা না দেওয়া পর্যন্ত অবস্থার কোনো পরিবর্তন আশা করা যায় না। প্রাইমারি, হাইস্কুলসহ কলেজেরও একই অবস্থা। এটাও একটা দুষ্টচক্র (ভিশাস সার্কেল)। এই দুষ্টচক্রের কারণে দেশে জাত শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম। এভাবেও শিক্ষা-পরিবেশের ক্রমাবনতি ঘটছে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, মানুষ যেটাতে একবার অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেখান থেকে বেরিয়ে সহজে নতুনকে গ্রহণ করতে চায় না, এমন সংখ্যা শতকরা আশি ভাগের উপরে।

উচ্চশিক্ষার অবস্থাও বেশ খারাপ। এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়ার ভিত গড়ে না উঠলে হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা আয়ত্ব করা কঠিন হয়। ফলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার স্বার্থে মান কমাতে বাধ্য হয়। হাতে-গোনা কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়েও ইন্ডাস্ট্রী-কোল্যাবরেশন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সেখানে যারা ভর্তি হয়, অধিকাংশই নিজ কিংবা পারিবারিক চেষ্টায় স্কুল-কলেজে ভালো লেখাপড়া শিখে আসে। বাকিরা মাতৃভাষা বাংলাটাও ভালোমতো পড়তে ও লিখতে পারে না। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব নেই। সেখানকার মানের কথা বললে ইঁদুরও ফিক করে হেসে গর্তে লুকাবে।

যাহোক, এদেশে শিক্ষা মানের উন্নতি এতটা সহজ নয়। পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস যেমনই হোক, বাস্তবায়ন পর্যায়ে ব্যপক পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায় নতুনত্ব আনতে হবে। শ্রুতিকটু হলেও সত্য যে, স্কুল পর্যায়ে এমন অগণিত শিক্ষক আছে যারা ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা, 'শিক্ষকদের জন্য প্রণীত ম্যানুয়াল'টাও পড়ে ঠিকমতো বুঝতে অপারগ। তাদের ট্রেইনিং দেওয়া না-দেওয়া একই কথা। যে দুধ ঘোলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, 'হাজার কষেতে ঘোল না হয় মাখন'। প্রয়োজনে টাকা বেশি দিয়ে হলেও সুশিক্ষিত জাত শিক্ষকের সন্ধান করতে হবে। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ যে কোনো মূল্যে বজায় রাখতে হবে। জীবন বাঁচাতে শরীরের কোনো বিশেষ অঙ্গচ্ছেদ করা লাগতে পারে, সেটাকেও মেনে নিতে হবে। নইলে ভয়াবহ পরিণতি আসবেই। তা আমরা পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি যতই পরিবর্তন করি না কেন। আমরা সবাই অবহিত যে, এ অবস্থা আমরা দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক চাটুকারিতা, সস্তা জনপ্রিয়তা পেতে উদারতা দেখিয়ে ও অব্যবস্থাপনা দিয়ে অর্জন করেছি।

(প্রকাশ: ১৬ জানুয়ারি '২৪ দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

শিক্ষায় দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ

১৬ জানুয়ারির পর কোনো কলাম আর লিখিনি। কোনোক্রমেই লেখায় মন বসাতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম, লিখে যদি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি না করতে পারি, সংশ্লিষ্ট পক্ষ যদি লেখাগুলো আমলে না নেয়, কারো ভাবনার উদ্রেক যদি না করে, লিখে কী লাভ! এদেশে আমরাই-বা কে! আমাদের তো একচোখা হয়ে তোয়াজ করে কোনো দলভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা নেই, জানি। আজকের পত্রিকার পাতা আগামীকালের ঝালমুড়ি-চানাচুর বিক্রির ঠোঙ্গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমার পরিশ্রম ও ভাবনা নিত্য ডাস্টবিনে গড়াগড়ি খায় ভেবে লিখতে অনিচ্ছুক ছিলাম। এর মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে। তাই মনকে আবার প্রবোধ দিয়ে আজ কলম ধরেছি। গত লেখার শিরোনাম ছিল 'চাই জীবনমুখী, মানবিক ও কর্মমুখী শিক্ষা' (যুগান্তর, ১৬.০১.'২৪)। এ বিষয় নিয়ে নাতিদীর্ঘ কথা বলেছিলাম। এছাড়া অনেকদিন ধরে এদেশের উপযোগী শিক্ষা বিষয়ে 'শিক্ষার ভিত্তিমূল কি হওয়া উচিত', 'শিক্ষার উপকরণ'সহ সামাজিক শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে অনেক কথাই লিখেছি। এসব লেখা সংশ্লিষ্ট মহলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে কি-না, তা আমার অজানা। আমার ধারণা, এদেশের বাঙালিদের ইংরেজ, আমেরিকান, ভারতীয়, চীনা কিংবা অন্য কোনো ভিনদেশি না বানানো পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না। এতে আমাদের জাতীয় গর্ব ও অস্তিত্ব ক্রমশই বিলীন হতে বাধ্য। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, এ মহাদেশের বেশ কিছু জাতি কালপরিক্রমায় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কিছু জাতি অসহায় ও এতিমের মতো নিঃসাড় হয়ে নিঃসীম ভবিষ্যতের অতল গর্ভে হারিয়ে যেতে বসেছে। পড়ে পড়ে ধুঁকছে। আমরা একটু চোখ তুলে তাকালেই সব দেখতে পাব। এর সাথে 'যোগ্যতমের টিকে থাকা' কথাটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এখানেই আমরা ভুল করি। অতপর অদৃষ্টের উপর দোষ চাপিয়ে হা-হুতাশ করে সামনের দিনগুলো পার করি, যদিও এসবই প্রকৃতির প্রতিশোধ। এসব চিন্তাভাবনা রাষ্ট্রনায়ক ও দেশ-পরিচালকদের সবসময় করা প্রয়োজন। এ সবকিছুই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। শিক্ষা আবার নির্ভর করে দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবেশের উপর। যে জাতি যত শিক্ষিত ও উন্নত, বিশ্বসভায় তার মর্যাদা তত উচ্চ ও টেকসই।

আমাদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। আছে আলাদা মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা, সামাজিক বুনন– যা এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকেও স্বতন্ত্র। এসব কিছু ভুলে গেলে কিংবা এড়িয়ে গেলে আমরা অন্য কোনো সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সমাজ-

স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবোধের সাথে কালক্রমে মিশে যাব। এর থেকে দুঃসংবাদের কথা আর কী থাকতে পারে! আমরা বিশ্বের দরবারে স্বকীয় সত্তায় পরিচিত হতে চাই, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই, নিজস্ব শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পারঙ্গমতায় ও সক্ষমতায় টিকে থাকতে চাই।

গত দুদিন ধরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১' বইখানা মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। আমার কাছে এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও শিক্ষাক্রমের অ্যাপ্রোচ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ভিত্তিও যথাযথ বলে মনে হলো। দার্শনিক ভিত্তি আলোচনায় এসে দেখলাম, 'শিক্ষার্থীর শিখন হতে হবে আন্তঃবিষয়ক, সমন্বিত এবং প্রক্রিয়া হবে মিথস্ক্রিয়ামূলক'– এগুলো ভালো ভিত্তি। উল্লেখ করা হয়েছে, 'শিক্ষাবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হলো– গঠনবাদ ও পুনর্গঠনবাদ। গঠনবাদ অনুযায়ী শিখনের মূল উদ্দেশ্য হলো পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে অভিযোজনের জন্য অভিজ্ঞতা অর্জন করা। আর পুনর্গঠনবাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার্থী অভিযোজনের জন্য সামাজিক শিখন পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত মিথস্ক্রিয়া ঘটায় এবং এর ফলে শিক্ষার্থী ও শিখন পরিবেশের উভয়ের মাঝেই পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনের এই অভিজ্ঞতাই শিক্ষাথীর শিখনের ভিত্তি তৈরি করে।'– বেশ গ্রহণযোগ্য কথা। তবে আমাদের দেশে কি 'সামাজিক শিখন' আছে? 'প্রগতিবাদ ও পুনর্গঠনবাদকে মূল দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখার কাঠামো ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।' এই বর্ণনায় 'প্রগতিবাদ' শব্দটার ব্যবহারের সাথে সম্পূর্ণ একমত হতে পারলাম না। 'প্রগতিবাদ' শব্দটা বিভিন্ন দেশে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। 'প্রগতিশীল' শব্দটাও ভালো। কে না চায় প্রগতিশীল হতে!

বিশ্বে নতুন নতুন মতবাদের আভাব নেই। সব মতবাদ এদেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সামাজিক মননশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নয় সামাজিক মূল্যবোধের অনুগামী। পশ্চিমা বিশ্ব প্রগতিবাদকে এক চোখে দেখে; এদেশের সুশিক্ষিত সমাজ কিন্তু প্রগতিবাদ শব্দটাকে ভিন্ন চোখে দেখে। আমি পশ্চিমা বেশ কয়েকটা দেশে ঘুরেছি। লেখাপড়ার জন্য সেখানে থাকতেও হয়েছে। তাদের অনেক কিছুই আমার চোখে ভালো লেগেছে। আবার তাদের অনেক কিছু আমার চোখে বিশ্রী ও বিকৃত রুচিবোধ বলে মনে হয়েছে। আমরা পোশাক পরি শরীরকে আবৃত করার জন্য। ঐসব দেশে বাজারে কাপড়ের অভাব নেই, কিন্তু শরীর ঢাকতে কাপড়ের বড্ড অভাব। উলঙ্গতা ও বিকৃত যৌনাচারের মধ্যে কী সভ্যতা লুকিয়ে আছে আমি

অনেক গবেষণা করেও তা খুঁজে পায়নি। এজন্য আমাকে ব্যাকডেটেড বা প্রগতিবিরোধী বলতে পারেন, কিন্তু আমি অর্ধোলঙ্গ হয়ে প্রগতিশীল হতে চাইনে। ঐসব দেশের বাসে, ট্রেনে, মেট্রোতে চড়তে গিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে জনসমক্ষে বিকৃত যৌনাচারের রিহার্সল দেখেছি, কিন্তু একবার দৃষ্টিগোচর হলেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মনে মনে অন্য কোনো চতুষ্পদের সাথে তুলনা করেছি। এগুলো দেখলেই আমার বিকৃত রুচির কথা মনে পড়ে এবং মনে হয় মানবসভ্যতা কোনো কোনো দিক দিয়ে আদিমতা ও অসভ্যের যুগে ফিরে যাচ্ছে। আমরা কর্ম ও ভাবনা দিয়ে মানব সভ্যতাকে ভূলুণ্ঠিত করছি। পশ্চিমা সব মতবাদ সব দেশের জন্য পালনীয় নয়। চলতি ফ্যশনের মতো। নিত্যনতুন অনেক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, মানবসভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কোনো মতবাদ টিকে আছে, আবার অনেক বিকৃত মতবাদ কালের আবর্তে সময়ের পরিক্রমায় হারিয়ে গেছে। সামাজিক মতবাদ ছাড়াও অনেক রাজনৈতিক মতবাদেরও একই দশা। সেজন্য আমরা এদেশে কুহেলিকার পেছনে ছুটে সময় নষ্ট করতে চাইনে; প্রগতিবাদের মোড়কে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিকৃত মানবিকতা, প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্মপদ্ধতি ও জীবনাচার দেশে প্রবর্তন করতে চাইনে। নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন হতে দিতেও চাইনে। এদেশীয় অকৃত্রিম বাঙালির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে আমাদের স্বকীয় সক্ষমতাকে জানান দিতে চাই। এর মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও মঙ্গল নিহীত আছে। এদেশের অনেক ব্যক্তি উচ্চশিক্ষার নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লেখাপড়া করেছেন। তারা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেশীয় স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমা ধাচের বাঙালি বানাতে চান, এখানেই তাদের সাথে আমার বিরোধ।

একটা ছোট্ট স্মৃতিচারণ না করে পারছি না। ছোটবেলা থেকেই কবিতা আমার খুব ভালো লাগতো। আমার এক চাচা কবিতার সমঝদার ছিলেন। একদিন একটা কবিতা লিখে তাঁকে দেখাতে নিয়ে গেলাম। তিনি ভালোভাবে পড়লেন, প্রশংসা করলেন। বললেন, ‘তোমার কবিতার ধারা এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অন্য কেউ কবিতাটা পড়লে রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা ভাববেন। তুমি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা, সুকান্তের কবিতা, জসিমউদ্দীনের কবিতা, জীবনানন্দ দাসের কবিতা ভালো করে পড়বে। দেখবে প্রত্যেকের কবিতারই একটা স্বকীয় ধারা বিদ্যমান। তুমি যা লিখছো তাতে সবাই তোমাকে রবীন্দ্রনাথের সার্থক অনুকারক বলবে। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গেলে তোমার নিজস্ব একটা ধারাকে বেছে নিতে হবে।’ আমি আমার জীবনে কবিতায় নিজস্ব ধারা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছি। তাই আজীবন অন্যের কবিতা পড়েছি, কিন্তু

নিজে কবিতা লেখা সেদিন থেকে ছেড়েছি। নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে অন্যের অস্তিত্বকে আকড়িয়ে ধরে পৃথিবীতে টিকে থাকা অনর্থক। পশ্চিমা সভ্যতা কিংবা কোনো মতবাদের ভালো দিকগুলোকে আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের গণ্ডির মধ্যে এনে এদেশের উপযোগী করে গ্রহণ করতে পারি। হুবহু কাট অ্যান্ড পেস্ট করতে আমার আপত্তি। শিক্ষা নিয়ে আমার আরেকটি কথা আজ বলতে চাই।

বাস্তবতা হলো, এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী কারো পক্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রতিটা বই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে দেখা ও রূপকল্প তৈরি করা সম্ভব নয়, যদিও সব কর্মের দায়দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে এসে বর্তায়। শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরির জন্য যাদের ওপর দায়িত্ব বর্তায়, তাদের মধ্যে কারো কারো মাথা মোটা ও বিকৃত বাতিল চিন্তা-চেতনা ও মতবাদে মদদপুষ্ট ও পক্ষপাতদুষ্ট। তারা তাদের নিজস্ব বাতিল ধ্যানধারণাকে এদেশের পুরো জনগোষ্ঠীর ওপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনীনভাবে চাপিয়ে দিতে চায়। গলদটা এখানেই; 'কাজ করে বেহদ্দ, মার খায় গোষ্ঠীসুদ্ধ'। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরিতে এদেশের সংস্কৃতি, সামাজিক চেতনা, মূল্যবোধ ও সামাজিক বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে পদ্ধতি ও বিষয় নির্বাচন করলেই কোনো ঝামেলা থাকে না ও বিতর্কও তৈরি হয় না।

ট্রান্সজেন্ডার ও থার্ড-জেন্ডার নিয়ে যে বিতর্ক দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, আমার দৃষ্টিতে এটা একটা পক্ষসৃষ্ট। একটা পক্ষ এর বিরোধিতা করছে, আরেকটা পক্ষ বিভিন্ন সংগঠনের ছায়াতলে এর মধ্যেও মৌলবাদের গন্ধ আবিষ্কার করে মৌলবাদ পতনের জয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে। এসবের আদৌ কি দরকার ছিল? আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে অপরিণামদর্শী হয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে জাতিকে বিভক্ত করে ফেলেছি। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের থার্ড-জেন্ডারদের সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া শেখানো খারাপ কিছু নয়। এক্ষেত্রে এ সামাজিক সমস্যার সমাধানও তাদের শেখানো যেতে পারে। কিন্তু ঐ বয়সের ছেলেমেয়েকে ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে ধারণা দেওয়া কি যৌক্তিক ও সময়োপযোগী? আবার ট্রান্সজেন্ডার শব্দটাকে থার্ড-জেন্ডার বলে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা কি সংগত? এ নিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টারই-বা কী আছে? কোনো বিষয়ে তর্ক করে জয়ী হওয়াটা বড় জয় নয়, আত্মজিজ্ঞাসায় জয়ী হওয়াটাই প্রকৃত বিজয়। আমাদের দেশের কিছু জ্ঞানবিধ্বস্ত বুদ্ধিজীবীর বাতিল মতবাদ ও দলবাজি মনোভাবের পরিবর্তে মনে প্রকৃত দেশাত্ববোধের জন্ম নিলেই দেশের অনেক উপকার হতো বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বারবার এ কলামে লিখছি, পাঠ্যসূচি নিয়ে আমাদের খুব একটা সমস্যা নেই। পাঠ্যসূচির পরিবর্তন একটা চলমান প্রক্রিয়া। এটা ব্যয়বহুলও নয়। এদেশের মানুষকে সুশিক্ষিত করার জন্যই আমরা হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে এ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরি করেছি। চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কি কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন সেটা আমরা বিবেচনায় আনতে পারি। জেদাজেদি না করে গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারি। আমি জানি মূল সমস্যা শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। ভিজা-স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জন্মানো কচুর ডাটা রান্না করতে গেলে সহজে সিদ্ধ হবে না, আবার মুখ চুলকাবে। কচুর ডাটা কেনার সময় এটা ভাবা দরকার ছিল। কাজ করার সময় আমরা ভবিষ্যতকে নিয়ে আদৌ ভাবি না, পরে কম পড়লে টের পাই। শিক্ষক গোষ্ঠীর অধিকাংশই শিক্ষায় দুর্বল। ভালো ছাত্রছাত্রী প্রাইমারি, হাইস্কুল ও কলেজ শিক্ষার শিক্ষকতা পেশায় আসেননি। নিয়োগ ব্যবস্থায়ও গলদ আছে। শিক্ষা-প্রশাসনেরও ঢালাওভাবে রাজনীতিকরণ হয়ে গেছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের দারুণ ঘাটতি। তাছাড়া ভালো শিক্ষক ছাড়া পরিকল্পনামতো ও ভালোমতো শিক্ষা দেবেন কীভাবে? প্রায় স্কুল ও কলেজ কমিটিতেই পোকায়-খাওয়া রাজনৈতিক আধিপত্য বিরাজমান। রাজনৈতিক পাতি-নেতাদের অন্যায্য অত্যাচারে শিক্ষাঙ্গন, হেডমাস্টার ও অধ্যক্ষরা অতিষ্ঠ। শত শত হেডমাস্টার ও অধ্যক্ষের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি। স্বজাতি বলেই হয়তো তাঁরা মনের কথাটা আমাকে বলেন। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা খুব কঠিন সময় পার করছি। আমরা শিক্ষার মানোন্নয়ন চাই; কিন্তু বাস্তবতা বিরূপ। তবে হতাশা আমাকে বেশিক্ষণ আচ্ছন্ন করতে পারে না। এ থেকে বেরিয়ে আসার পথও আমরা খুঁজে পেয়েছি, মান বাড়ানোরও কৌশল আছে। প্রয়োজন সরকারের আন্তরিকতা, সদিচ্ছা এবং আমাদের সুচিন্তিত ব্যবস্থা ও কৌশলকে কাজে লাগানো।

(প্রকাশ: ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

আসুন আমরা শিক্ষা ও সেবার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি

পবিত্র রমজান মাস চলছে। প্রত্যেক মুসলমান যার যার সাধ্যমতো পরকালের কল্যাণে ব্যস্ত। রোজা রাখা, তারাবির নামাজ পড়া, দোয়া-দরুদ পড়া, খারাপ কাজ ও কুচিন্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা, সবই পরকালের কল্যাণের জন্য। এছাড়া সাধ্যমতো দান-খয়রাত করা, ফিতরা দেওয়া, জাকাত দেওয়া, গরিব-মিসকিনের খাবারের ব্যবস্থা করা– এসবও পরকালের জন্য ইবাদত তো বটেই; উপরন্তু এ ধরনের ইবাদতে সমাজের সুবিধা-বঞ্চিত গরিব-মিসকিন ইহকালেই আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

ইসলাম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় সময়ের কল্যাণকে সুনিশ্চিত করতে চায়। সেমতো পবিত্র কুরআনের আয়াত ব্যবহার করে আমরা প্রতিনিয়ত মোনাজাত করি, 'হে আমার প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো, আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও' (সুরা বাকারা: ২০১)। আমরা প্রতিবার মোনাজাতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চাচ্ছি কেন? নিশ্চয়ই জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য। দুনিয়াতেও তো কখনো কখনো আমরা জাহান্নামের আংশিক কষ্ট ভোগ করি। প্রশ্ন আসে, আখেরাতের কল্যাণের আগে দুনিয়ার কল্যাণই-বা চাচ্ছি কেন? দুনিয়ার কল্যাণ অর্জন না করতে পারলে আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের প্রশ্নই আসে না। দুনিয়া আছে বলেই আখেরাত আছে। দুনিয়ায় কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা-উর্ত্তীর্ণ ছাড়া আখেরাতের ভালো কর্মফল দুঃসাধ্য। দুনিয়ার সময় অল্প, কিন্তু অতি মূল্যবান। দুনিয়ার কর্মজীবন যদি এত তুচ্ছ ভাববো, আখেরাতে ভালো কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র। দুনিয়ার কল্যাণের মধ্যেই আখেরাতের কল্যাণ নিহীত।

স্রষ্টা মানুষকে ইবাদত করার জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ইবাদত বলতে আমরা কি বুঝি? ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা শব্দটা ব্যবহার করলেও ইবাদত শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। তাই আমাদের ইবাদতটাও গোলমেলে হয়ে গেছে। দুনিয়াদারির সব কাজই ইবাদত, শুধু সমাজ ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু খারাপ কাজ বাদে। আমরা দুনিয়ায় ভালো কাজ করবো না, আবার পরকালে ভালো ফল-প্রতাশী হবো, তা কি হয়?। এ থেকেই চালাক-চতুর মানুষের মনে জন্ম নিয়েছে, অল্প কর্মে অধিক লাভের প্রবণতা। যত পারো অন্যায়, মিথ্যা, অকাম-কুকাম করো, মানুষকে ফাঁকি দিয়ে টাকার প্রাসাদ গড়ো; সব শেষে বার বার হজ ও ওমরাহ করে পাপমোচন করে নাও– এই মনোভাব। এর ভালো-মন্দ নিয়ে প্রত্যেক মানুষের বিবেকই সঠিক

উত্তরটা দিতে পারে। মূলত দুনিয়ায় কল্যাণ অর্জন এত সহজ নয়, আবার ইসলামের মূল নীতিমালা মেনে চললে খুবই ‘সহজ-সরল পথ’। সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আল্লাহর কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ। মোটামুটি বুদ্ধিজ্ঞান হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুচিন্তা ও সুকর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পরকালের কল্যাণ লাভ। পরকালে পুরো কর্মজীবনের হিসেব দিতে হবে। এ জন্য দুনিয়ায় দুটো শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে: একটা শ্রেণি দুনিয়ার অন্য কোনো ভালো কাজ না করে শুধু নামাজ-রোজা করে জীবন কাটিয়ে দিয়ে বেহেশত পাবার চেষ্টা করে; অন্য শ্রেণি, দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরে নিষিদ্ধ-অন্যায় কাজগুলো করে ইহকালের সুখ-সাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে, সম্পদের পাহাড় গড়ার চেষ্টা করে। শেষ বয়সে পরকালের জন্য বেশি নামাজ-রোজা, মসজিদ-মাদ্রাসা তৈরিতে দানের কাজে কিছু অর্থ ব্যয় করে আয়েসের সাথে বেহেশত যাবার প্রচেষ্টা চালায়।

স্রষ্টা দুনিয়ার কাজ-কর্মে স্বচ্ছতা রাখার জন্য এবং খারপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য ‘জীবন বিধান’ পাঠিয়েছেন। সেই মতো তাঁর দেখানো পথে চলতে হবে। দুনিয়াদারিতে অংশ নিতে হবে। এই দুনিয়াদারির মাধ্যমেই খোদার ইবাদত। কোনো রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ করে একজনের অপকর্মের সাজা প্রদান করার ক্ষমতা রাখে। সৃষ্টিকর্তা শুধু কর্ম-অপকর্মেরই হিসাব রাখেন না, প্রত্যেক মানুষের প্রতিটা মুহূর্তের চিন্তা-চেতনারও হিসাব রাখেন। তারপর পরকালে তার চিন্তা ও কাজের বিচারের কথা বলেন। কর্ম এবং চিন্তা-চেতনার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বলেন। দুনিয়াদারির জন্য কর্ম; কর্মের মাধ্যমে ধর্ম পালন। পরকালে কোনো ধর্ম নেই। ধর্মের দুটো অংশ: পরকালের জন্য কয়েকটা বিষয়ের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং ইহকালের জন্য প্রকৃতি ও ভালোভাবে বাঁচার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক নিয়মের সহগামী কাজকর্ম। প্রকৃতির প্রতিটা নিয়মই বিজ্ঞান। প্রতিটা সৃষ্টি বেঁচে আছে, কর্ম করছে, আহার সংগ্রহ করছে, নড়াচড়া করছে, ভাবছে, প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করছে– পদে পদে বিজ্ঞান। মহাশক্তির এ খেলার সমীকরণ মেলানো অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী, যাকে আমরা মানুষ বলি, তার পক্ষে পুরোটাই অসম্ভব।

রোজার মাসে এসব কথা প্রাসঙ্গিক হবে বলেই সবার উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি। মানুষ হিসেবে এ বিশ্বে সুখ-শান্তিতে, মানুষের মতো বেঁচে থাকা, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং পরকালের মুক্তি মাত্র দুটো জিনিস দিয়ে সম্ভব, যা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ও চিন্তা-চেতনায় অবহেলিত। এ দুটোকে একসাথে বেছে নিয়েছে এমন সম্প্রদায় বা জাতির সংখ্যা এ বিশ্বে নগণ্য। অনেকেই যে কোনো একটাকে বেছে নিয়েছে। তাই তারা একদিকে সফলকাম হচ্ছে। এ দুটোকে একসাথে বেছে

নিতে হলে প্রথমেই পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ, সংঘাত, বিভাজন, ব্যক্তি স্বার্থপরতাকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। অন্যদিকে ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম শিক্ষাকে সৃষ্টিসেরা মানুষের জন্য, জীবনের উন্নতির জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেইসব বধির ও বোবা যারা কমন-সেন্স (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান বা বোধশক্তি)-কে কাজে লাগায় না' (সূরা আন ফাল, ৮:২২)। বলা হয়েছে, 'পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' (সূরা আল আ'লাক, ৯৬:১)। এখানে পড়া বলতে শুধু আরবি অক্ষর চিনে শব্দ উচ্চারণ করা নয়। পড়া মানে বিষয়টা বুঝতে পারা, জানা, হৃদয়ঙ্গম করা ও ভাবা, আমরা যাকে বলি জ্ঞানার্জন করা। কী পড়তে হবে? কুরআন। কুরআনে কী লেখা আছে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, মানুষ ও জীবজন্তুর সৃষ্টি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, অস্ত্রচিকিৎসা, ভূ-তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স), স্রষ্টার পরিচয় ইত্যাদি– বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং মানুষ সৃষ্টি ও এর পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য যা দরকার সে-সব বিষয়। উল্লিখিত এসব বিষয়ের জ্ঞানকে বাদ দিলে কুরআন পড়া হয় কীভাবে? দুনিয়াই-বা চলে কীভাবে? অথচ আমরা কুরআনে উল্লিখিত বিষয়ের প্রায়োগিক জ্ঞানকে দুনিয়াদারির কাজে লাগাতে অনিচ্ছুক। এসব বিষয়ে জ্ঞানী (আলেম) ব্যক্তিদের জন্য চিন্তার অবকাশ রয়ে গেছে। শিক্ষা অর্জন ও মানুষকে শিক্ষাদান, শিক্ষায় সহায়তা করা, শিখতে উপদেশ দেওয়া শ্রেষ্ঠ ইবাদতের একটি। তেমনিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে দুনিয়াদারি করার জন্য সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে সেবা করাও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত, যার নাম মানবসেবা।

এদেশের জনসংখ্যার শতকরা নব্বই ভাগই মুসলমান। উপরে বলা এসব কথা আমরা সবাই কম-বেশি জানি। কিন্তু পালন করতেই যত গাফিলতি ও উদাসীনতা। আমরা কী এক অজানা অন্ধস্রোতে গা ভাসিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে সামনে ধেয়ে চলেছি! আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। গ্রামে-গঞ্জের অধিকাংশ মানুষ কর্মজীবী। হাতে গোনা নির্দিষ্ট একটা অংশ জটিল-কুটিল রাজনীতিতে অংশ নিয়ে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যবিচ্যুত করে ছাড়ছে। আবার রাজনীতিতে ভালো মানুষ যে একেবারেই নেই, তাও নয়। বলা যায়, দলে তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। অথচ দেশটা গড়া খুবই একটা সহজ কাজ। সহজ একটা পথ আছে। রাজনীতিকদের সাহায্য-সহযোগিতা পেলে ভালো; না পেলেও ক্ষতির কোনো কারণ নেই। দরকার মানসিকতার উৎকর্ষ। শিক্ষা এবং মানবসেবার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ এগিয়ে

এলেই সবকিছুর সমাধান হয়ে যায়। যত অন্যায়-অশান্তি দূরীভূত হয়ে যায়। সমাজ উন্নত হয়, অভাব-দুর্দশা দূর হয়, মানসিক পেরেশানি, অন্ধ প্রতিযোগিতা দূরে পালায়, সমাজ বাসযোগ্য হয়; পরিণামে কাজের মাধ্যমে স্রষ্টার ইবাদত হয় এবং পরকালের কল্যাণ সাধিত হয়। বুঝতে হবে ইসলামে সর্টকাট রাস্তায় বেহেশত পাবার কোনো পথ নেই, যা পেতে আমরা অনেক বুদ্ধি ও টাকা খরচ করি। ইসলামি জীবনব্যবস্থা একটা পথ, কর্মের মাধ্যমে উপাসনা বা ইবাদত একটা পাথেয়। অন্য অনেক ধর্মের মানুষও ভালো কর্মে ও পরকালকে বিশ্বাস করে। তারাও ভালো কর্মের আশ্রয় নিতে পারেন। আমরা প্রতিহিংসা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, 'মুখে মধু পেটে বিষ' মানসিকতা, স্বার্থের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনাকে বাদ দিতে পারি। ভালো গঠনমূলক কিছু করার জন্য মানুষের ইচ্ছেশক্তিই যথেষ্ঠ। এর জন্য কোনো টাকা-পয়সা খরচ করাও লাগে না। নিজের বিবেককে পরিশুদ্ধ করলেই হয়। বার বার রমজান আসছে, রোজা পালন করছি; কিন্তু রোজা থেকে আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণটা দূরে ঠেলে দিচ্ছি। আমাদের ধর্মপালন অনেকটা লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। আমরা ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান, অথচ মুসলমানের বৈশিষ্ট্য ও কর্মে ক্রমেই উদাসীন ও নীতিবিরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করলেই সত্য বেরিয়ে আসে।

এ বিষয়ে আজ একটা কর্মপন্থার পরামর্শ দিতে পারি। এদেশের প্রতিটা জনপদে বা গ্রামে অনেক সুশিক্ষিত নামাজি ব্যক্তি আছেন। তারা সমমনা বিবেচনা করে প্রতিটা জনপদে বা গ্রামে একটা করে স্বেচ্ছাসেবী টিম তৈরি করতে পারেন। তাদের প্রত্যেকের কাজই হবে মানুষকে সুশিক্ষিত করার ব্যবস্থা করা, সাধ্যমতো অন্যান্য জনসেবা করা। টিম তৈরি নিয়ে, লীডার হওয়া নিয়ে দলাদলি করার প্রয়োজন নেই। আপনি তো নেতা হওয়ার জন্য কাজ করছেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছেন। মানুষকে সুশিক্ষিত করা ও মানুষের সেবা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের কোনো রাজনীতি, কুটিল-জটিল যে কোনো চিন্তা এড়িয়ে যেতে হবে। মানুষ সারাদিন বড়জোর আট থেকে দশ ঘণ্টা কাজ করে। বাকি সময় ইচ্ছে করলেই সমাজের অনেক সেবার কাজ করা সম্ভব। জানবেন, সমাজের যে কোনো ভালো কাজেই মুক্তি; ইহকালের ইবাদত ও মুক্তি এবং পরকালের কল্যাণ। একা একা সমাজের কোনো কাজ না করে 'টিম-ওয়ার্ক' করতে হবে। ক্রমেই টিমে সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে। হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করতে হবে। ইসলামে এমন অনেক কিছুকেই না করা হয়েছে। নিশ্চয়ই হিংসা-বিদ্বেষের ক্ষতিকর কোনো দিক আছে। সমাজে শিক্ষক ও অভিভাবকদের ডেকে শিক্ষার উন্নতির কথা বলে শিক্ষা-সচেতন করে তুলতে হবে, আবার তাদের পরামর্শও নিতে হবে। সমাজের সাধারণ

মানুষকে মাঝে-মধ্যেই সমাজ-উন্নয়নমূলক ও স্বাস্থ্য-সচেতনমূলক কাজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সন্ধ্যার অবসর সময়ে বাংলা পড়িয়ে দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত পড়ার অভ্যাস করানো যায়। এতে তাদের সমাজ-সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে শিখবে। সমাজে ভালো কাজের অভাব নেই। এভাবে বেশ কিছুদিন চললে সামাজিক ভালো পরিবেশ ও সামাজিক শান্তি ফিরে আসবে। আমাদের বুঝতে হবে, ভোগের আনন্দ সাময়িক, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ অনাবিল ও দীর্ঘস্থায়ী। ইবাদতের আনন্দও দীর্ঘস্থায়ী। এই মানুষের মধ্যেই মানুষ রত্ন লুকিয়ে আছে। তাকে সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ দিয়ে তা বের করে আনতে হবে। সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে।

শিক্ষা এমনই একটা বিষয় যে, সুশিক্ষিত মানুষ গড়তে পারলেই সমাজে এর ভালো প্রভাব পড়ে। দেশের উন্নতি হয়। খারাপ মানুষ প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে না, শিক্ষা মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটায়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে। স্বেচ্ছাসেবীরা সমাজের উন্নতিতে আনন্দিত হয়ে ওঠে, ভালো মানুষের দোয়া পায়। মানুষের আর্থিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য করা যে কোনো কাজই ইবাদত।

আমার কয়েকজন সহকর্মী তারা একটা টিম গড়ে তুলেছেন। নিজেদের জাকাতের টাকা ছাড়াও পকেট থেকে আরো কিছু টাকা দিয়ে এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করে গরিব-অসহায়দের মধ্যে কাউকে বকনা গরু, কাউকে ছাগল, কোনো কর্মহীন মহিলাকে সেলাই মেশিন, কাউকে-বা রিক্সাভ্যান, ইজি বাইক কিনে দেন। এভাবে তাদের উপার্জন-সক্ষম করে তোলেন। উদ্যোগটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত অসহায় কোনো ব্যক্তির চিকিৎসা খরচের দায়িত্ব নেওয়াটাও এক ধরনের সমাজসেবা। আসুন, আমরা সমাজে সুশিক্ষা প্রদান করি ও সমাজসেবায় এগিয়ে আসি।

(প্রকাশ: ১৯ মার্চ ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘চলার শেষ কোন সাগরে তার ঠিকানা তো জানা নাই’

জীবন সায়াহ্নে এসে যতই কবরের দিকে ধেয়ে চলেছি, শুধু অতীতের গান বারবার মনে ভেসে ওঠে। অন্যায় কিছু দেখলেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। লেখার ভাষাও কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। বিষয়টা সাইকোলজিক্যাল। এতে আমার কিছুই করার থাকে না। শিল্পীর গাওয়া গান আমি জীবনের গান হিসেবে নিয়েছি। গানের তাল-লয় থাকে। তেপ্পান্ন বছর ধরে এদেশ চলতে দেখছি, কোনো তাল-লয় তো কোনোদিনই খুঁজে পেলাম না। এমন অনপেক্ষ-অনভিপ্রেত কথা বলার জন্য আমি দুঃখিত। যে গানের কথা মনে ভাসছে তা হচ্ছেঃ ‘আমি ছন্দহারা এক নদীর মতো ভেসে যাই, আমার চলার শেষ কোন সাগরে তার ঠিকানা তো জানা নাই..’।

গানের কথায় আছে আমাদের অবস্থার প্রতিফলন। অনেক লেখায় আমি প্রায়শই একটা কথা লিখি যে, শিক্ষা নিয়ে বাজেটের কোনো সমস্যা নেই, এ অবস্থায় বাজেট যতই বাড়ানো হোক না কেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে কোনো লাভ হবে না। আধুনিক কারিকুলামেরও কোনো সমস্যা নেই; টেক্সট-এর বেশ কিছু সমস্যা আছে, তা অল্প দিনেই পরিবর্তন করা সম্ভব। সমস্যা অন্য জায়গায়– বাস্তবায়ন সমস্যা। বাস্তবায়ন সমস্যার মধ্যে পরিবেশগত সমস্যাই প্রকট। সেটাই বারবার বাস্তবে দেখছি। অর্থাৎ পরিকল্পনা যতই ভালো হোক, নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সুন্দর, পরিবেশ উপযোগী ও সঠিক না হলে সবকিছুই অরণ্যে রোদন হতে বাধ্য। হচ্ছেও আসলে তাই। শিক্ষা খাতে দুহাত দিয়ে টাকা ঢেলে দিলেই যে শিক্ষার উন্নতি হবে, অনেকেই এমন কথা বলবে; কথাটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিবেচনাযোগ্যও নয়। অন্তত আমি এ মতের ঘোর বিরোধী। শিক্ষাঙ্গনে ভালো বেতন দিয়ে ভালো শিক্ষক আনতে হবে, এটা সত্য। পরিবেশ ভালো না হলে ভালো শিক্ষক নিয়োগেও সমস্যা হবে। বর্তমানে তো শুধু শিক্ষক নিয়োগ নিয়েই নয়, শিক্ষার্থী নিয়ে, শিক্ষক নিয়ে, শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে, শিক্ষাঙ্গন নিয়ে দেশব্যাপী জাতিবিধ্বংসী অপরাজনীতি চলছে। চলছে বিভিন্ন প্রজেক্টের নামে টাকা লুটপাট। সবকিছু তো পত্রিকাতেই দৈনিক পড়তে পড়তে গা-সওয়া হয়ে গেছে। এ ঠেলা কে সামলাবে? এর একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব শিক্ষামানের উপর আছে। গায়ের জোরে ও মুখের জোরে কোনো কিছুকে অস্বীকার করা, আর নিরেট বাস্তবতা এক কথা নয়। ভাবার অবকাশ নেই যে, আমি কোনো একক রাজনৈতিক দলকে দোষারোপ করছি। আমি আজ তেঁতাল্লিশ বছর ধরে শিক্ষকতা জীবনে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করছি। প্রতিনিয়ত প্রাথমিক শ্রেণি থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছি। বিভিন্ন দেশের সামাজিক অবস্থার সাথে

এদেশের মানুষ ও সমাজকে প্রতিনিয়ত মেলাচ্ছি। এটাই আমার পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা।

পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সব বিভাগের লেখাপড়া যে সমান, তা বলা যাবে না, এখানেও মান উন্নয়নের যথেষ্ঠ সুযোগ আছে। আবার যেসব ছাত্রছাত্রী সেখানে ভর্তি হচ্ছে তাদের সবার ভিত্তিমান যে ভালো এটা বলা যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলও তো আমরা দেখলাম। ১২/১৩ শতাংশ পাশ, বাকিরা সবাই ফেল। ভর্তির সুযোগ পাওয়া আর ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করা কিন্তু এক কথা নয়। আমি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষকতা করি, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামানের কথা নাইবা বললাম। কোনো ক্লাসে দশ শতাংশ ছেলেমেয়ের ভিত ভালো, এটা আমি বিবেচনায় আনতে প্রস্তুত নই। মাশাআল্লাহ, একশত আটটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারও বসে নেই, প্রতি জেলায় কমপক্ষে একটা করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে অঙ্গিকারাবদ্ধ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় যত্রতত্র সরকারি-বেসরকারি কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স পড়ার সুব্যবস্থার তো কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। সবাই মিলে জ্ঞানের আলো বিতরণ করছে, দেশ শিক্ষাশূন্য জ্ঞানের রাজ্যে ভাসছে। শুনতেই ভালো লাগে। ওপরে বলা গানের আরেকাংশ এ-রকম: 'সীমাহারা দূর-দিগন্ত পারে, জানি না কোথা ভেসে যায়, কোন সে অভিসারে, যারে খুঁজে ফিরি আমি, তারে কি পাব না আর ...'। আমি তো শিক্ষা ও শিক্ষিত লোক খুঁজে ফিরছি, যাদের ওপর নির্ভর করে দেশ টিকে থাকবে। অনেকের মধ্যে লেখা ও পড়া কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সন্ধান সুদূর পরাহত। এরাই তো লেখাপড়া শেষে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে এরা খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। এরাই এদেশের সম্পদ (?)। কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যবসায় নামছে, কেউ ছদ্মবেকার, কেউবা পুরো বেকার। সার্টিফিকেটের অভাব নেই, অভাব সুশিক্ষার, যে ভিতের ওপর দেশ দাঁড়িয়ে থাকবে। জনগোষ্ঠী বিশাল, জনসম্পদ অত্যল্প। লেখা ও পড়া জানা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের কাছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিরাপদ নয়। সার্থক আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা! দেশচালকরা তো রথসারথি। এ নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। 'জন্ম আমার ধন্য হলো মা গো, অমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো-ও-ও'। অধিকাংশ ক্ষেত্রে না আছে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষা, না আছে মানবতাবোধ-জাগরুক শিক্ষা, না আছে কর্মমুখী শিক্ষা। ভরা সাগরে নৌকা বেয়ে চলেছি, যেদিকে তাকায় পানি আর পানি;

এক ঢোক পানিও খাবার উপযুক্ত নয়। সমাজের মানুষ গেছে দূষিত হয়ে। আমার আরো আপত্তি অন্য কোথাও। বাঙালি ছেলেমেয়েদের মেধা তো অন্য কোনো জাতি-গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আমি তা দেখেছি। কিন্তু এমন হলো কেন? গলদটা কোথায়? রাতে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবি, সমীকরণ মিলাতে পারি না। কখনো সমীকরণ মেলাতে পারলেও করার কিছু থাকে না। 'পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে'। 'উপায় নেই গোলাম হোসেন!' দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে করার তেমন কিছু থাকে না। দূষিত মানুষ যদি নিজের বিপদ নিজেই তৈরি করে, জনগোষ্ঠী যদি জন-আপদে রূপ নেয়, সে বিপদের জন্য কান্নাকাটি করে কী লাভ!

এক বিপদ তৈরি করেছি স্থানীয় সরকারে রাজনীতির প্রার্থী মনোনয়নে। প্রতিটা ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ দেশ শোষণ ও মানুষ শোষণের আঁখড়া হয়ে উঠেছে। 'তুমি তাই, তুমি তাই গো, আমার পরাণ যাহা চাই'। কলুষিত রাজনীতি এখন গ্রামে-গঞ্জে, রান্নাঘরের দরজায়, বিয়ের আসরে, বাসর ঘরে, গরুর হাট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আরেক বিপদ তৈরি করছি বা করেছি প্রতি জেলাতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাসনায়। প্রতিষ্ঠাতাদের মনে কোনো পবিত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আমি নির্বোধ মাস্টারসাহেব। আমার চোখে ধরা পড়ে শুধু জঘন্য রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পদে দলীয় লোকজন পোস্টিং দেওয়ার হিড়িক। যত বিশ্ববিদ্যালয় বৃদ্ধি, তত চাটুকার পোষার ব্যবস্থা, চাটুকার পোস্টিং। শিক্ষার মানোন্নয়নে তারা নেই, তারা চাটাচাটিতে মহাব্যস্ত। তাদের দিয়ে দলবাজি ও চেতনার ব্যবসা করার উদগ্র বাসনা। দলীয় কন্টাক্টরদের কিছু কামাই-রোজগারের পথ সৃষ্টি, আবার ছাত্র রাজনীতির দোহায় দিয়ে নিজস্ব চামচাদের 'গামছা' কেনার অর্থ-সংস্থান। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে ভবিষ্যৎ মানবতাহারা নেতা-নেত্রী আবাদের উৎকৃষ্ট খামার। কেননা 'উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়'। পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার অভাব সব অঘটনের মূলে থাকে। সরকারের নতুন তৈরি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে। কৈশোর পেরিয়ে গেছে এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েও বারবার যেতে হয়। সত্য বলতে কি, সেখানকার পড়ার মান ও রাজনৈতিক বন্দনা আমাকে আশাহত করেছে। কয়েকটা নিরেট ইটের বিল্ডিং দেখেছি, শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশ দেখিনি। তা ছেলেমেয়েরা শিক্ষা অর্জন করবে কোত্থেকে! এর ওপর আবার প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ভিত খুবই দুর্বল। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পড়া ও তা নিয়ে গবেষণা করতে দিলে সেটা তাদের মাথার ওপর দিয়ে পিছলে চলে যায়। এ নিয়ে নিত্য বসবাস। আমার এ চাঁচাছোলা কথায় অনেকে আমার প্রতি রুষ্ঠ হবেন জানি, কিন্তু এছাড়া

ভালো ভাষা এক্ষেত্রে আমার নেই। দেখবো কানা ছেলে, তাকে 'পদ্মলোচন' বলা তো শিক্ষকতা পেশায় চলে না। এ শিক্ষার ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর এবং এ ব্যাধি নিতান্তই দুরপনেয়।

এত কথা মনে আসছে বেশ কয়েকটা দিন ধরে বুয়েটে আবার ছাত্র রাজনীতি ঢোকানোর খায়েশ দেখে। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা চান না সেখানে আবার 'যমদূত ঘরে ঢুকুক'। কেউ কেউ বলছে, রাজনীতি করা না-কি তাদের সাংবিধানিক অধিকার। যে-সব ছাত্রছাত্রী জীবনে মানুষ হওয়ার জন্য বুয়েটে ভর্তি হয়েছে, সাধারণ ও শান্তিপূর্ণ লেখাপড়ার পরিবেশে থেকে, রাজনীতি না করাও তো তাদের নাগরিক অধিকার। রাজনীতি যে কেউ করুক তাতে কারো বাধা নেই। কিন্তু হিংসুটে গুরুভক্তি করতে গিয়ে সহপাঠির মাথায় আঘাত, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট, অন্যের ক্ষতির কারণ হওয়া, হলে হলে 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' তৈরি করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন-নিষ্পেষণ চালানো, পার্শ্ববর্তী এলাকায় চাঁদাবাজির ব্যবসা করা, 'ধর্মের ষাঁড়' হয়ে যা-খুশি-তাই করা সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকবৃন্দ মানবে কেন? প্রত্যেক ছেলেমেয়ে অভিভাবকদের এক টুকরো আশার আলো। তারা তো বুয়েটে তাদের ছেলেমেয়েদের রাজনীতি শিখতে পাঠায়নি। এ ছাড়াও দেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্ম পরিবেশ নষ্ট হয় এমন চাটাচাটির রাজনীতি করার জন্য 'যমদূত' পুষতে তাদের গুরুরা ছাড়া সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন কেউ সম্মত কি-না আমার বিশ্বাস হয় না। কারো এতই যদি রাজনীতি করার ইচ্ছে হয়, বৃহত্তর সমাজে গিয়ে রাজনীতি করলে কেউ তো বাধা দিচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ সকল প্রতিষ্ঠানে কেন? আমাদের দেশ-চালকদের একজনকে সেদিন বলতে শুনলাম, শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হোক তা তিনি চান না। আমার বলতে ইচ্ছে করে, দেশচালকরা জঙ্গিবাদ নির্মূলের জন্য বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব 'ধর্মের ষাড়' পুষছেন, তারাই বা জঙ্গিবাদের তুলনায় কম কীসে? শুধু নামেই পার্থক্য। পেশাব দিয়ে তো আর টয়লেট পরিষ্কার করে পূত-পবিত্র করা যায় না। জঙ্গিবাদ না থাক, এটা আমিও চাই। কিন্তু তা দমন করার জন্য তো আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ রয়েছে। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেই তো যথেষ্ট। গুরুদের আশির্বাদপুষ্ট 'ধর্মের ষাড়' পোষা ও প্রতিপালনের প্রয়োজন আছে কি? আমাদের দেশের সব অনিয়ম, অব্যবস্থা, অশান্তি, দুঃশাসনের মূলে তো আমাদের এই গুরুদের বিকৃত চিন্তাই দায়ী।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির কথা উঠলেই অনেকে '৫২ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জল সময়ের কথা তুলে ধরে বর্তমান 'যমদূত মার্কা

ধর্মের ষাড়'-এর মতো রাজনীতির ক্ষমতায় ক্ষমতাধর হয়ে বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়ার লালসায় পুষ্ট ছাত্র-রাজনীতির বৈধতা দিতে চান। এরাও মতলববাজ। 'দাদার আমলে খেয়েছি দই, সেকথা আজো কই'। এসবই রাজনৈতিক ব্যবসা ও লুটপাট টিকিয়ে রাখার নির্লজ্জ ফন্দি। যে কোনো দেশপ্রেমী সুশিক্ষিত লোক এসব ভালই বোঝেন। শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা আমিও সমর্থন করি, কিন্তু এইডস দম্পতি এইডসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সন্তান উৎপাদন বন্ধ রাখাই সমীচীন। দেশের রাজনীতি সুস্থ ধারায় এলে তখন ভেবে দেখা যাবে। নইলে এইডস দম্পতির সন্তানও এইডস রোগে আক্রান্ত হতে বাধ্য। এভাবে তো দেশ এইডস রোগে ভরে যাবে।

এদেশ 'চাটার দল'মুক্ত করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। হয়তো কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের মৌন সাপোর্টার, কিন্তু নীতি-নৈতিকতা ও সুশিক্ষা আছে, যারা দেশের সম্পদ ও দেশ পরিচালনার দক্ষতা আছে– এমন অসংখ্য লোককে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আমার অজানাও অনেকে আছেন। এদেশেই তাদের বসবাস। পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় তারা দেয়ালের কোনো কোণায় কোটরের পেঁচার মতো মুখ লুকিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে। এরাও দেশপ্রেমী এবং এদেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। এদের বাইরে বের করে এনে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলেই কেবল এদেশের মুক্তি নিশ্চিত হবে।

(প্রকাশ: ২০ এপ্রিল ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা- সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন হোক দূরদৃষ্টির আলোকে

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই বেশ কয়েকবার পাঠ্যক্রম পরিবর্তন হতে দেখলাম। আবারও পরিবর্তন শুরু হয়েছে শুনছি। পাঠ্যক্রম যখন তৈরি হয়, প্রণেতারা অনেক ভালো ভালো কথা বলেন; শুনতে বেশ ভালই লাগে। যেন গাছে-পাকা হালকা-লাল রঙের টসটসে আম উদ্দাম বাতাসের দোলায় দোল খাচ্ছে; মনে হয়, এই বুঝি পড়লো! কুড়িয়ে পাওয়ামাত্র রসনা তৃপ্ত করবো। কিন্তু কপালের ফের, বাতাসে 'নড়ে বড়োসড়ো, বোঁটা শক্ত বড়ো'। রসনা তৃপ্ত আর হয় না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। কখনো আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। শিক্ষা-উন্নয়ন প্রজেক্টের নামে সরকারের বাজেট বড়; বরাদ্দকৃত সব টাকাই বারবার শেষ হয়ে যায়। বাস্তবে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা এ জনমে আর হয়ে জুটলো না। এখন আমার এক পা কবরে। দেশের জন্য উপযোগী শিক্ষা কাঠামো, সিলেবাস তৈরি, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি, উপযুক্ত বাস্তবায়ন, শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান দেখে মরার সৌভাগ্য আর হলো না! রবি ঠাকুরের কোনো এক ছোটগল্পে 'পাগলা মেহের' নামে একটা চরিত্র ছিল। কথায় কথায় সে বলতো, 'বিলকুল ঝুট হ্যায়, বিলকুল ঝুট হ্যায়'। এদেশের অনেক কাজকর্মে আমারও তা-ই ভাবতে ইচ্ছে হয়।

পত্রিকায় পড়লাম, এবার স্কুল ও কলেজের সিলেবাসে এদেশের স্বাধীনতায় যাদের যে অবদান, ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে রচিত হবে। শুনে বেশ ভালো লাগলো। আমার ভাবনা অন্য জায়গায়। ইতিহাস যত সুন্দর করেই বিদ্যাবুদ্ধি খাটিয়ে ভারসাম্যপূর্ণভাবে রচিত হোক না কেন, তাতে শিক্ষার মান আদৌ বাড়ে কী? যার শিক্ষা নেওয়ার কথা, সে যদি শিক্ষা না নিয়ে নোটবই মুখস্ত করার তালিম নেয়? শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি করে মুখস্ত করতে সহযোগিতা করে। পরীক্ষাও শেষ, মুখস্ত-করা মন্ত্রও স্মৃতির অতলান্তে হারিয়ে যাওয়া শেষ, লাভ কী? অধিকাংশ স্কুল-কলেজে শিক্ষার নামে ফাঁকিবাজি। শিক্ষা মানে তো শুধু লেখা আর পড়া না– ছাত্রছাত্রীদের বাকি জীবনটা কিভাবে পরিচালিত হবে তার একটা সাধারণ প্রস্তুতি। তারপর বিশেষায়িত জ্ঞানার্জন। প্রত্যেক শ্রেণিতে কি কি বিষয় শিখতে হবে তা আগে সাজাতে হয়। তারপর পঠিত বিষয়গুলো বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বণ্টন করতে হয়। এই পঠিত বিষয়গুলোর মধ্যে কতটুকু নমনীয়তা থাকলো, তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। অথচ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তত মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত কোনো নমনীয়তা নেই। অন্য কোনো-না-কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কপি ও পেষ্ট করে বাংলাদেশিদের জন্য পাঠ্যসূচি তৈরি। শিক্ষার্থী বাংলা-ইংরেজি কোনোটাই ভালো

জানে না। শিক্ষা শুধু চাকরি পাওয়ার জন্য নয়; শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত জাতি ও জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠে। বিদ্যাশক্তি জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। এভাবে কপি-পেস্ট সিলেবাস তৈরি করলে আত্মমর্যাদাশীল, স্বকীয় সত্তাবিশিষ্ট কোনো জাতি কোনো দিনই গড়ে উঠবে না, যদিও আমরা তা চাই।

আমার বাসায় ইলেকট্রিক স্যুইচ টিপি দেয়ালের এক কোনে, বাতি জ্বলে ও ফ্যান ঘোরে দশ হাত দূরে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সে দর্শন কই? শিক্ষার মধ্যে বাংলাদেশিদের সংস্কৃতি, দেশপ্রেম, সামাজিক বুনন, দেশীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে এবং প্রতিটা শ্রেণিতেই সামগ্রীক শিক্ষার মধ্যে জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা শেখাতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনায় আনা হচ্ছে কিনা? পাঠ্যক্রম তৈরির সময় এদেশের বাস্তব অবস্থাকে বিবেচনায় না আনলে আবার পিছিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি আমাদের জনগোষ্ঠীকে অন্য কোনো সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠীর নিগড়ে বাঁধার স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে, তবে বাংলাদেশিরা কোনোদিনই নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না, বিশ্বসভায় নিজেদের অস্তিত্বকে জানান দিতে পারবে না। অন্য জাতির গোলামি করে খাবে। পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিন্নধর্মী গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে মিশেও যেতে পারে।

নৈতিক মূল্যবোধ আমাদের সমাজের মানুষের মধ্যে কতটুকু আছে, তা মোটামুটি সবারই জানা। সে বিষয়ের কোনো উন্নতি না করতে পারলে দেশের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাবে। শুধু দেশ সংস্কারে কোনো কাজ হবে না। এই তেপ্পান্ন বছরে দুর্নীতির ‘জোয়ার’ বয়ে যেতে দেখলাম, পরবর্তীতে যে দুর্নীতির ‘সুনামি’ বয়ে যাবে না এবং ভিনদেশি শোষণ আরো বাড়বে না– এর নিশ্চয়তা কোথায়? এ থেকে বেরিয়ে আসার একটাই উপায়, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। আমার গবেষণা মতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন ও মান সামাজিক শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব সামাজিক শিক্ষার ওপর পড়ে। দুটো চলকের মধ্যে পারস্পরিক ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। আমাদের দেশে দুটো চলকের মানই নিম্নমুখী। তাই একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার উন্নতি আশা করা বৃথা। পারস্পরিক এ দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসা অতটা সহজ নয়। সেজন্য পাঠ্যক্রম প্রণেতারা এসব বিষয়ে সতর্ক না থাকলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ না করলে অতীতের ফলের মতোই কর্ম বৃথা হবে।

এদেশে মাদ্রাসা ও স্কুল নির্বিশেষে ‘ইন্টিগ্রেরেড এজুকেশন পদ্ধতি’ চালু করা প্রয়োজন। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও বিজ্ঞান ও ব্যবসায় বিষয় পড়তে বাধ্য হবে।

যে কোনো সরকার ইচ্ছে করলে আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসায় কোরআন-হাদিসের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দিতে পারে। আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসায় অনেক প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী আমি দেখেছি। তাদের সীমাহীন প্রতিভা অকালেই ঝরে যাচ্ছে। আমি ৫২টি মুসলিম দেশের খবর রাখি, আমাদের দেশের মাদ্রাসার লেখাপড়ার মতো একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা সেখানে নেই। সেখানে মাদ্রাসায় পড়েই বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজবিজ্ঞানী, হিসাববিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, কৃষিবিদ হচ্ছে। জনশক্তির একটা অংশকে উৎপাদনমুখী না করা আমাদের সামগ্রীক ব্যর্থতা। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে একথা বেশি প্রযোজ্য। প্রযুক্তির এই যুগে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় বিষয় না পড়ে বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় জাতি হিসেবে টিকে থাকা কঠিন। এ বোধটুকু আমাদের জন্মাতে হবে। শুধু বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষায় গেলেই যে সব কিছু অর্জন হয়ে যাবে তা নয়। কারণ সাধারণ স্কুল-কলেজের সামগ্রিক শিক্ষার মানও তো নীচু। 'ইন্টিগ্রেরেড এজুকেশন পদ্ধতি' চালুর সাথে সাথে শিক্ষার মান বাড়ানোর কৌশল বের করতে হবে। নোট মুখস্ত করিয়ে সার্টিফিকেট হাতে ধরিয়ে দিলেই শিক্ষা হয় না। আমি তো ছাত্রছাত্রীদের কৃতকর্ম নিয়েই জীবন কাটাচ্ছি। বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা না জানে পড়তে, না জানে লিখতে, না জানে চিন্তা করতে। অথচ এ দুর্বল ভিত নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। নোট মুখস্ত করতে দিলে ভালো করে, কিন্তু মেধার বিকাশ ঘটাতে দিলেই যত সমস্যা। না আছে ভাষাজ্ঞান, না আছে এ্যানালাইটিক্যাল এ্যাবিলিটি, প্রবলেম সলভিং ক্যাপাসিটি। সেজন্য প্রথম শ্রেণি থেকেই যত লেখাপড়াই করুক, নোট-গাইড মুখস্ত করুক, পাঠ্য বিষয়ে মেধা খাটানোর ব্যবস্থা, পঠিত বিষয় নিয়ে মেধা বিকাশের চর্চা না করা পর্যন্ত শিক্ষার মান বাড়বে না। পাঠ্য প্রসঙ্গ নিয়ে যত ভাববে, মেধার বিকাশ তত হবে। এসব করতে মানসম্মত শিক্ষকও প্রয়োজন। ভালো শিক্ষক পেতে গেলে ভালো বেতন দিতে হবে। অযোগ্য শিক্ষকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাটাই করতে হবে। প্রতিটা সরকার প্রতিটা পর্যায়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নিয়ে দলবাজি করবে; আর শুধু পাঠ্যসূচি তৈরি করলেই শিক্ষার মান শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে যাবে, এটা কীভাবে সম্ভব? শিক্ষাপদ্ধতি বাস্তবায়ন সমস্যা এদেশে প্রকট। যতবারই শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করতে দেখেছি, বাস্তবায়ন সমস্যার কারণে ব্যর্থ হতেও দেখেছি। অথচ বিষয়টা নিয়ে কোনো শিক্ষাবিদকে ভাবনা-চিন্তা করতে দেখিনে।

শিক্ষায় অনগ্রসরতার আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘুমন্ত ফ্যাক্টর: এদেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ৯৯.৫০ শতাংশ লোক ধার্মিক, বাকিরা কেউ সন্দিগ্ধমনা, কেউবা নাস্তিক– কেউ প্রকাশ্য, কেউ মনে মনে। এদেশে শিক্ষার্থীকেও পশ্চিমা সমাজের

মতো ভোগবাদী ও সেক্যিউলার বানানোর যে অপচেষ্টা, এতে বাংলাদেশিদের লেখাপড়ায় একটা দারুণ প্রভাব ফেলছে। ধর্ম কোপাও, বিশেষ করে মুসলমান ধার্মিকদের বিরুদ্ধচারণ করা এবং তাদেরকে বিনা প্রমাণে রাজনৈতিক কারণে জঙ্গি তকমা দেওয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে কলুষিত করে ফেলেছে। ইসলামি শিক্ষা শিখলেই, টুপি-দাড়িওয়ালা ও নামাজি লোক দেখলেই তাকে বিকৃত কোনো অভিধায় ভূষিত করা কিংবা তার প্রতি প্রতিহিংসার রং ছড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। আমরা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারছি। বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল বৈষম্য চলছে, এটা যে কেউ খোলা চোখেই দেখতে পারেন। এর ঢেউ এদেশে এসেও আছড়ে পড়েছে। এদেশে নামমাত্র মুসলমান, অথচ প্রগতিশীলতার নামে সেক্যিউলারিস্টরা সুকৌশলে এক মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্য মুসলমানকে ব্যবহার করছে। নিজের মতবাদ পুরো সমাজে বিস্তার করতে চায়। নিজেদের মধ্যে বিভেদ, প্রতিহিংসা তৈরি করে আমাদের যারা অমঙ্গল চায়, তাদের হাতকে শক্তিশালী করছে এবং আমাদের পশ্চাদপদতার কারণ হচ্ছে। বিষয়টা গভীর চিন্তার উদ্রেক করে। শুধু ধর্মশিক্ষার নামে যারা অর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অংশ, আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ শিক্ষা যারা শিখতে ও ভাবতে অপারগ, তাদেরকে শত্রু না ভেবে বুঝিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা দিয়ে সাধারণ সমাজে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারলে জাতি লাভবান হতো। তারাও তো আমাদের ভাই। এ জন্যই ‘ইন্টিগ্রেরেড এজুকেশন পদ্ধতি’-র কথা বলছিলাম। এতে কওমি শিক্ষা ছেড়ে অনেকেই সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় চলে আসতো। অথবা কওমি শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষার্থীদের কোরআন-হাদিস শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতো। এক্ষেত্রে সরকারেরও অনেক দায়িত্ব। অন্য ৫২টি মুসলিম দেশে আমরা তাই-ই দেখছি। এতে এমনকি বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হতো।

দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তৈরির দায়িত্ব বারবারই ভোগবাদী ও সেক্যিউলারপন্থীদের হাতে চলে যাচ্ছে। এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও ঘুরেফিরে তারাই সর্বেসর্বা কিংবা তাদের পৃষ্ঠপোষক কোনো কোনো পত্রিকা সুকৌশলে ভোগবাদী ও সেক্যিউলারপন্থীদের সাহায্য-সহযোগিতা করছে এবং ভিতরে থেকে কলকাঠি নাড়ছে; অর্থাৎ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের শত্রু হয়ে বসে আছে। এজন্য এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে নিজস্ব স্বকীয়তা সৃষ্টি করে উন্নত জাতিতে পরিণত করার কাজ বারবার বিঘ্নিত হচ্ছে। বুঝতে হবে সেক্যিউলারপন্থী বানানোই উন্নত জাতি গড়া না। আমি সবাইকে সেক্যিউলারিস্ট

না হয়ে ধর্মঅহিংস হতে বলি। ষষ্ঠ শতাব্দি থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দি পর্যন্ত মুসলমানরা বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও দর্শনের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করে ও বাস্তবে তা কাজে লাগিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মুসলমানরাও শ্রেষ্ঠ জাতি হতে পারে (এবং তা হওয়াও উচিৎ)। বর্তমানে আমরা সে মনোভাব হারিয়ে ফেলেছি। মানুষ ভোগবাদ ও সেক্যিউলারপন্থী হলে শিক্ষায় মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষা প্রদান করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তখন প্রকৃত শিক্ষা আংশিক শিক্ষায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। মনুষ্যত্বহীন মানুষ আদৌ মানুষ নয়, মানুষ নামের কলঙ্ক। মানুষের মনে মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষা থাকলে সে ব্যক্তিকে পরিচালনার জন্য পুলিশ পাহারা আর লাগে না; মনের মধ্যে মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাকে ভালো পথে চলতে শেখায়। ধর্মচর্চা অতি পুরাতন-আদিম একটা শিক্ষা সংগঠন। বিনা দ্বিধায় প্রত্যেক ধার্মিক এ শিক্ষা মনে ধারণ করে। ফলে অপকর্ম দূরে পালাই, সমাজ ও দেশ উন্নত হতে বাধ্য হয়। ধর্মচর্চা ও ধর্মীয় নিয়মাবলি পালন অর্থ মানুষ সরল ও সঠিক পথে চলা, কুসংস্কারমুক্ত হওয়া। তা সে যে ধর্মই পালন করুক। বাস্তবে আমি দেখেছি, একজন চোর-ডাকাতও স্রষ্টার নাম স্মরণ করতে করতে তার অপকর্মে শরিক হয়, উপাসনার ঘরে চাঁদা দেয়, উপাসনাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, আবার রিপুর তাড়নায় খারাপ কাজ করে। এখনো প্রতিটা স্কুলে ১০০ নম্বরের ধর্ম শিক্ষা আছে। সেখানে জীবনে ধর্মের প্রায়োগিকতা না শিখিয়ে মুখস্ত করিয়ে বেশি নম্বর পাওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের বুঝতে হবে নিজেদের আত্মমর্যাদা নিজেরা তৈরি করতে ব্যর্থ হলে অন্য কেউ তৈরি করে দেবে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজ কবি হতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ভুল বুঝে নিজ দেশে ফিরে এসে মাতৃভাষার সাহিত্যে মনোনিবেশ করেছিলেন।

(প্রকাশ: ১৮ নভেম্বর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

অন্তর্বর্তী সরকার: দেশোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা অন্তত গড়ুন

(প্রকাশিত শিরোনাম: দেশোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়তে হবে)

সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত'। সে অর্থে মাস্টারসাহেবের দৌড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত হবার কথা। আমার মতো বেশ কিছু মাস্টার ও নন-মাস্টারের দৌড় বড়জোর দৈনিক যুগান্তর পর্যন্ত। এ লেখায় যুগান্তর পেরিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার পর্যন্ত যেতে চাই। একটা কারণ হচ্ছে: এদেশে তদবিরে সব হয়; আমাদের পক্ষে তদবির করার কেউ নেই। অন্যটা হচ্ছে: সেই প্রথম থেকে দৈনিক যুগান্তর 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের' পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষা-সেবা আত্মপ্রকাশের মূলনীতি দেশব্যাপী জনসমক্ষে প্রকাশ করে আসছে। এটাও পত্রিকার একটা জনসেবামূলক কার্যক্রম। তারাও চায় এদেশের মানুষ সুশিক্ষিত ও দেশপ্রেমী হোক। এজন্যই এ আবেদন-নিবেদনটুকুও যুগান্তরের মাধ্যমেই করতে চাই। 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' এদেশের মানসম্মত শিক্ষা ও সেবার উন্নয়নে নিয়োজিত একটা অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষাকে একসাথে নিয়ে কাজ করে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার শত শত সুশিক্ষিত ব্যক্তি, শিক্ষা-গবেষক, অসংখ্য শিক্ষাবিদ সামাজিক এ আন্দোলনের সাথে জড়িত। দেশের কল্যাণে নিজেদের পকেট থেকে অর্থ খরচ করে আমরা 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' টিকিয়ে রেখেছি ও সাধ্যমতো সেবা দিয়ে যাচ্ছি, জনসচেতনতা বাড়াচ্ছি। এদেশে শিক্ষাও অবহেলিত, তাই শিক্ষকরাও অবহেলিত। আমরা যত শিক্ষাব্যবস্থাই তৈরি করছি, তা সময়োপযোগী এবং দেশোপযোগী হচ্ছে না বলে দেখছি। এ দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করাও কঠিন বলে আমাদের মনে হয়। এদেশের রাজনীতিকরা রাজনীতি নিয়ে সদা ব্যস্ত। তাদের এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাবার সময় কোথায়! এছাড়াও যারা ভাবেন, তাদেরও ক্ষীণদৃষ্টি আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এর আগেও আমরা পতিত সরকারের বড়কর্তাদের সামনে একাধিক সেমিনার করেছি; তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, শিক্ষা ও সেবার এ পদ্ধতি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আমাদের দেশের উপযোগী ও বাস্তবায়নযোগ্য, তারা শান্ত্বনা দিয়েছেন বটে, কিন্তু বাস্তবে তাদের বদ্ধমূল আদর্শের বাইরে কিছুই করেননি। মূলত তারা ধর্মবিদ্বেষী একটা গোষ্ঠীর হাতে বরাবরই শিক্ষাব্যবস্থা তৈরির ভার ছেড়ে দিতেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীকে অন্য কোনো আধিপত্যবাদী জনগোষ্ঠীর নিগড়ে বেঁধে ফেলা। পরিণতি আমরা সবাই দেখছি।

আমরা সেই শিক্ষাব্যবস্থাকেই আদর্শ ব্যবস্থা বলবো, যেখান থেকে জনগোষ্ঠী মানসম্মত শিক্ষা পাবে। দেশে দেশপ্রেমী মানুষ তৈরি হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা-সেবার প্রক্রিয়া একসাথেই চলতে থাকবে। দুর্ভাগ্য, রাজনৈতিক সরকার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অতটা সময় ব্যয় করতে চায় না। কাজ করার সময় বেছে বেছে দলীয় লোকজন ছাড়া তাদের আসরে অন্য কেউ কল্কে পায় না। এবারও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তথৈবচ কিছু হচ্ছে, দেশোপযোগী ও স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী তেমন কিছু হচ্ছে না; একথা আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। বড়োজোর বিতর্কিত কিছু টেক্সট পরিবর্তন করে দেওয়া, মূল্যায়ন পদ্ধতির একটু হেরফের করে দেওয়া। এটুকু পরিবর্তন একটা স্বাধীন দেশোপযোগী স্বকীয় সত্তায় উদ্ভাসিত মানবিকতাবোধ-সঞ্চারক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা হতে পারে না। তেপ্পান্ন বছরের ভোগবাদী-অন্তঃসারশূন্য শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বর্তমান এ পরিণতির জন্য দায়ী।

আমাদের চিন্তিত এ পদ্ধতি ও মডেলে সামাজিক শিক্ষা, সমাজ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন একীভূত করে দেখা হয়। এছাড়া স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা নির্বিশেষে 'ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষাপদ্ধতি' প্রয়োজন। সেজন্য এ টেকনিক এবং শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা এদেশে নিশ্চিতভাবেই অধিকতর প্রয়োগযোগ্য। এই তেপ্পান্ন বছর ধরে তো দেখছি, এদেশের রাজনীতিকদের কাছে দেশের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষক ও পেশাদারদের তুলনায় লাঠিয়াল বাহিনীর নেতা ও যারা রাজনীতি করতে গিয়ে জেল-জুলুম ভোগ করেছেন, তাদের গুরুত্ব বেশি। দেশের উন্নয়নমূলক কোনো কাজের মেধা ও যোগ্যতা আছে, কি নেই– এটা কোনো বিবেচ্য বিষয় হয় না। নির্বাচনে জেতার সাথে সাথে পদ ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েই যেখানে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়, সেখানে বিভিন্ন পেশাদার ও গবেষকদের মূল্যায়ন কতখানি? এসব বিবেচনায় নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকার একটা ভরসার জায়গা হতে পারতো, অন্তত সেখানে সংস্কার আছে, রাজনীতি নেই; তবে সম-ঘরাণার দৌরাত্ম্য ও তদবিরের মর্যাদা আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ অনুমান সত্য নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা উপেক্ষিত ও অসহায়। সব শিক্ষকের টাকার নেশা না থাকলেও দেশের শিক্ষা ও সেবার বিষয়ে গলদটা কোথায় এবং কিভাবে অতি সহজে এগুলো দূর করে এ জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত ও মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা সহজ হয়; কোন পদ্ধতি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় একসাথে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সার্থকভাবে বাস্তবায়ন সহজসাধ্য হয়; এগুলো গবেষণার বিষয় হলেও এ পদ্ধতি ও টেকনিকগুলো আমাদের নখদর্পণে।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান আমাদের পেশা ও ব্রত। এখন প্রশ্ন, শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ দান কি হচ্ছে? নিজেদের ঢোল নিজে না পেটাতে পারলে অন্যের কর্ণকুহরে শব্দ প্রবেশ করানো এ যুগে কঠিন। আমরা সার্ভিস দিতে প্রস্তুত, লাভটা কিন্তু পুরোটাই এই জনগোষ্ঠীর।

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যদি বাংলাদেশি জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্য জাতি-গোষ্ঠী থেকে আলাদা স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রবোধ তৈরি করা না যায়, তবে বাংলাদেশিরা দেশপ্রেম, জাতীয় উন্নয়ন ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হবে; যে একটি কারণে আমরা তেপ্পান্ন বছর ধরে ভুগছি। আমরা বাঘের ভয়ে উঠেছি গাছে, ভূত বলছে পেয়েছি কাছে'। এই দোদুল্যমানতা নিয়েই তো আমরা বাংলাদেশে বাস করছি। আমি নিশ্চিত, এই ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পরও শিক্ষার নামমাত্র ও আংশিক পরিবর্তন ছাড়া আশানুরূপ কিছু হবে না, যা নিয়ে আমরা আবারো অনির্দিষ্টকাল ভুগতে চলেছি। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে অন্তত স্বাধীন দেশের উপযোগী একটা ভালো শিক্ষাব্যবস্থার শুরু করা যেত। সে সময় এখনো হাতে আছে। এদেশের সামাজিক শিক্ষা খুব উন্নত, নাকি ক্রমাবনতিশীল, প্রত্যেক সচেতন মানুষ অবহিত। আমাদের গবেষণায় বলে, অবনতিশীল সামাজিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মানকেও ঠেলে নীচে নামায়, আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবনতিশীল মানও সামাজিক শিক্ষাকে নিম্নমুখী করে। এটাকে আমরা 'ভিশাস সার্কেল'ও বলতে পারি। একটি চলক অন্য চলকের ওপর সহ-নির্ভরশীল পজিটিভ প্রভাব বিদ্যমান। এসবই প্রমাণ করে আমরা কোথায় চলেছি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থার কার্যক্রম একসাথে হওয়া দরকার।

এদেশ আমাদের, একথা সংবিধান বললেও বাস্তবে আমরা আমাদের দেশ বলে দাবি করতে পারি না। দুচোখে যা দেখি: এদেশ লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধানদের এবং চাটুকারদের। যাদের যোগ্যতা আছে, দেশকে দেবার অনেক কিছু আছে, তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নেই। যাদের লাঠির জোর আছে, তোষামোদকারি আছে, তারাই ক্ষমতাধর, সর্বেসর্বা; সব অধিকার ও কর্তৃত্ব তাদের, আমরা তাদের প্রজা; অলক্ষ্যে চিরবিদায় নিতে হবে। এত শক্ত কথা লিখতে আমি বাধ্য হচ্ছি; লজ্জাও পাচ্ছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো: না লিখে গত্যান্তর নেই। ঢাকঢাক-গুড়গুড় না করে সত্য কথা বলে ফেলাই ভালো। কারণ জীবনসূর্য অস্তগামীপ্রায়, অথবা যে কোনো সময় মেঘে ঢেকে যাবে। এর মধ্যে 'প্রতিবেশী বন্ধু' আমাদের অস্তিত্ব ধরে টান দিচ্ছে। এদেশে তাদের পোষা গোলাম বাদে সবাইকে বিশ্বের কাছে 'জঙ্গি' ও 'সংখ্যালঘু নির্যাতনের দেশ' বলে চালিয়ে দিচ্ছে। নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে

করে, ‘আমি তো কারো কেনা গোলাম নই, আমি কি জঙ্গি? ‘বন্ধু’ আয়না দিয়ে নিজের চেহারাটা আদৌ দেখতে ইচ্ছুক নয়। নিত্য যেখানে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও পিটিয়ে সংখ্যালঘু মারা হয়। এখানেই ‘তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে’ কথাটার স্বার্থকতা। একথা মাঝেমধ্যেই লিখি যে, বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল নিষ্পেষণ চলছে, দুর্বল রাষ্ট্রের প্রতি সবলের অত্যাচার ও মিথ্যাচার চলছে। অন্য শক্তিধর দেশের গোলামি করেও কেউ কেউ জোর-গলায় কথা বলে। সেজন্য মূলত বর্তমানে দেশরক্ষা ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি গড়ার জন্যও দেশোপযোগী সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা অধিক প্রয়োজন। আমাদের কাছে সামাজিক শিক্ষার আশু উন্নয়নের নির্ভরযোগ্য মডেল আছে, যা একাধিকবার এ কলামে প্রকাশিত হয়েছে।

এদেশে যতবার নতুন করে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে, বিষয়টাকে তারা এভাবে ভাবেননি, অন্তত দেশরক্ষার জন্য হলেও স্বদেশপ্রিয় সুশিক্ষিত মানুষ প্রশিক্ষণ দিয়ে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তৈরি করা দরকার, যাদেরকে প্রকৃতপক্ষে দেশ-সম্পদ বলা যাবে। আমরা লেখা ও পড়ার নাম করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেশে মানব-আপদ, দুর্নীতিবাজ, দেশ-বিক্রেতা ও গোলাম শ্রেণি তৈরি করছি। সামাজিক শিক্ষার উন্নতি ছাড়া দেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতি সম্ভব নয়, এটাও তারা ভাবেননি। আবার সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়াও জীবনমুখী শিক্ষা এবং মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষা, দেশপ্রেম শিক্ষা অবশ্যম্ভাবী। নিজতন্ত্র অথবা কতিপয়তন্ত্র পুরো জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এজন্য শিক্ষাব্যবস্থার এ দীনহীন অবস্থা। আবার যে শিক্ষাব্যবস্থা নতুন করে তৈরি করা হয়, বাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে ভাবা হয় না। তাই বাস্তবায়ন সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। সেজন্য বাস্তবায়ন সমস্যার সমাধান আগে করা প্রয়োজন। নইলে বাজেটের টাকা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু শিক্ষার মান বাড়বে না। যত নীতিকথাই খাতা-কলমে সুপারিশ করা হোক না কেন, বাস্তবে লবডঙ্কা হবে। যত অপাঙ্‌ক্তেয় কথাই বলি না কেন, সবকিছুকে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়। কিন্তু না বুঝতে চাইলে তাদের কাছে এই নিশ্চয়তার কী মূল্য আছে! আমরা মূলত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও সেবার উপায় ও অবলম্বন নিয়ে দাদীর কবর থেকে অনেক দূরে বসে কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ করছি। তাই নিজেদেরকে তুলে ধরতে বাধ্য হচ্ছি। এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলছে এবং আবারো যা হতে চলেছে। আমরা কোনোভাবেই এগুলোকে মেনে নিতে পারছি না। এতে আমাদের মতো স্বাধীনচেতা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটবে না। আমাদের দেশে ‘পার্শ্ববর্তী বন্ধু রাষ্ট্রের স্বার্থ’ রক্ষা করা গাদ্দারের অভাব নেই; এরা লেন্দুপ দর্জির বংশধর। এরাই

এদেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরীর দাবিদার। মীর জাফর আলী খানের মতো পরাধীনপ্রেমীর রক্ত যাদের শরীরে মিশে গেছে তাদের প্রত্যাবর্তনের আশা শেষ। এরা পরশাসিত-আনুগত্যশীল শিক্ষাব্যবস্থার দিশারি।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক শিক্ষা, যেমন– নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া; প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও দেশসেবার মনোভাব জাগ্রত করা; ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি জাগিয়ে তোলা; জনগোষ্ঠীর পজিটিভ মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী শিক্ষা, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সফট স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ একসাথে দেওয়া। সন্ধ্যাবেলা স্কুল ও মাদ্রাসার অব্যবহৃত কক্ষ ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের নানামুখী জীবনভিত্তিক উন্নয়নমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যায়। প্রয়োজন শুধু উদ্যোগ সৃষ্টির ও স্থানীয় প্রশাসনের সদিচ্ছা। এসব কাজ সমন্বিতভাবে করতে হলে সমাজের অভ্যন্তরভাগ থেকে কিছু সুশিক্ষিত, সমাজহিতৈষী ও ধার্মীক লোককে বেছে নিতে হবে। এরা এখনো সমাজেই বসবাস করেন। ধার্মীক বলছি এই কারণে, মানবসেবা ও সৃষ্টিসেবা একটা বড় ইবাদত বা উপাসনা, এটা মানবসেবীকে বোঝাতে হবে। গ্রামীণ সমাজে দিনশেষে সাধারণ মানুষ চা-র দোকানে গল্পগুজব করে সময় কাটান। কেউবা রাজনৈতিক কুটকৌশল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অবসর সময়কে জীবন উন্নয়নমুখী কাজে ব্যবহার করা যায়। প্রতিটা ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নেওয়া প্রয়োজন। তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নামটা একটু টেনে লম্বা করা বাঞ্চনীয় হবে। মূলত মানুষের অসাধ্য বলতে কিছু নেই। আমরা রাজনীতিকরা এদেশের মানুষগুলোকে অমানুষ ও স্বার্থবাদী বানিয়েই উন্নয়নের সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। এখান থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ কাজ। ইচ্ছা থাকলে উপায়ের অভাব নেই। লালন গেয়েছিলেন, 'এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন'।

(প্রকাশ: ২ ডিসেম্বর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

১৯. 'কেমন যুগান্তর চাই'

তেইশ বছর ধরে পড়ছি দৈনিক যুগান্তর। প্রকাশের প্রথম দিন থেকেই একটানা পড়ছি। আবার বেশ কয়েকদিন থেকেই পড়ছি, 'কেমন যুগান্তর চাই'। এ প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া আমার পক্ষে মোটামুটি অসম্ভব। তাই অযথা ঢাকঢাক-গুড়গুড় না করে কিছুটা হলেও মনের চাওয়া-পাওয়া খোলামেলা প্রকাশ করতে চাই। এ বিষয়ে সংবাদপত্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, কেমন হওয়া উচিত, সে ভাবগম্ভীর আলোচনা অনেক লম্বা– সে-দিকে যেতে চাচ্ছিনে। কোনো না কোনোভাবে যুগান্তরকে ভালো লাগে বলেই এতটা বছর ধরে যুগান্তর পড়ে আসছি। আবার যুগান্তরের কাছে আমার অনেক চাওয়া-পাওয়া আছে, এটাও সত্য। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যুগান্তর চব্বিশ বছরে পা দেবে। ভাবতে অবাক লাগে, দেখতে দেখতে দু-যুগে চলে এসেছে। কিভাবে সময় উড়ে চলেছে! দু-যুগ সময়টা একেবারে কমও নয়। বলা যায়, যুগান্তর সময় ও চাওয়া-পাওয়ার ধোপে উতরে গেছে। পাঠকের মনের গভীরে স্থান করে নিয়েছে।

পত্রিকা একটা বহতা নদীর মতো। নদী তার বুকে-ধরা প্রাঞ্জল-জঞ্জালে ভরা অসীম জলরাশি ভাসিয়ে নিয়ে নিঃসীম সাগরে মিশে নিজেকে উজাড় করে দেয়। পত্রিকা প্রতিদিনের সমাজ ও জীবনের ভালো-মন্দ, দুঃখ-আনন্দভরা ঘটনাসম্ভার বুকে নিয়ে কালের নিরস্ত ক্রোড়ে পুঞ্জিভূত করে। তবে তাকে অনাগত ভবিষ্যতের কাছে অতীত কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। সমাজ ও জাতির বিবেক হিসেবে যুগান্তর উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করুক– এটা আমরা চাই। যুগান্তর সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের বিপরীতে করা সব মতলব ও ভাঁওতাবাজির ঘোমটা উম্মুক্ত করে দিক– তাও আমরা চাই।

আমি একজন শিক্ষক। সচেতন জনগোষ্ঠীর একজন। আমার লেখা যুগান্তরে নিয়মিত ছাপা হয়। লেখায় আমাকে শিক্ষকতা পেশার প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। সেজন্য রাজনৈতিক পঙ্কিল নোংরামিতে, চাটুকারিতার তেলবাজিতে কোনোক্রমেই নিজেকে ডোবানো উচিত নয়। তাতে পেশার কলঙ্ক বাড়ে। উচিত নয় কোনো বাতিল মতবাদে নিজেকে সিক্ত করা। উচিত নয় নিজের পেশার অস্তিত্ব ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে চলতি সমাজের কর্দমাক্ত স্রোতে ভেসে যাওয়া। তেমনি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক হিসেবে উচিত নয় যুগান্তরের গায়ে কোনো রঙিন কাদা লাগা; অন্যায়ের স্রোতে নির্বিবাদে যুগান্তরের ভেসে যাওয়া। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার মতবাদই 'যুগান্তর'-এর 'ভিতর-বাহির' মতবাদ হওয়া উচিত। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ কিন্তু মুসলমান। যুগান্তরের উচিত না প্রকাশ্যে কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে তথাকথিত

প্রগতিশীলতার দোহায় পেড়ে ধর্মের পিছনে আদা-জল খেয়ে লাগা। অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলছি। গোঁড়ামি ও কুসংস্কার পদদলিত করে যুগান্তর হয়ে উঠুক ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সত্যের প্রতীক। যুগান্তর মিশে যাক জনারণ্যে। দেশ একসময় পাকিস্তানের শাসনাধীন ছিল। তখন পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো পত্রিকার ভূমিকা একরকম ছিল। তখন এ দেশের কয়েকটা পত্রিকা দেশ-মাতৃকার মুক্তির জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, যা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। তখন যুগান্তরের জন্ম হয়নি। একটা পত্রিকার ভূমিকা সব সময় এক হয় না। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন-সার্বভৌম একটা দেশ। এখন কোনো জাতীয় পত্রিকার ভূমিকা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আর ভাষার জন্য যুদ্ধ করা লাগবে না, তবে ভাষা রক্ষা ও উন্নতির জন্য যুদ্ধ করা লাগতে পারে। যুগান্তরের দায়িত্ব হবে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, স্বদেশমাতৃকা পাহারায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করা। অন্য কোনো দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, মতবাদকে এ দেশের মানষের মাথায় চাপিয়ে না দিয়ে দলমত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই সার্বভৌম ভুখণ্ডের জনগোষ্ঠী, সমাজ, স্বদেশ-সংস্কৃতি, ভাষা, দেশীয় মূল্যবোধ, মানুষের মানবিকতাকে বড় করে দেখা। এ দেশের মানুষ, মনুষ্যত্ব ও সমাজের কথা বলা। কোনো জটিল-কুটিল রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি না করা। তোষামোদবাদ পরিহার করা। দলবাজ, তোষামোদকারী লেখকদের এড়িয়ে চলা। গণমানুষের মনের কথা বলা। শিক্ষা ও দেশসেবার মানসিকতা নিয়ে দেশসেবকদের খুঁজে বের করা। তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। পত্রিকার পৃষ্ঠাতে তাঁদের ঠাঁই করে দেওয়া। এ দেশের জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপ দেয়ার সামাজিক আন্দোলনে শরীক হওয়া। এ দেশের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও মানসিক কূপমণ্ডূকতাকে পিছনে ঠেলে দেশ ও জাতির উন্নতি ও উৎকর্ষের মনোজাগতিক রূপরেখা ভাষায় এঁকে তা জনসমক্ষে প্রচার করা, দূরদর্শীতার পরিচয় দেওয়া।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অনেকগুলো ‘বাদ’ এসে এ দেশে একযোগে জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল। কেউ ‘বামবাদ’, ‘রাশিয়াবাদ’, ‘চৈনিকবাদ’, ‘পুঁজিবাদ’; আরো কত যে ফন্দি-ফিকির! আমাদের দেশে সে-সব ‘বাদের’ কিছু কিছু ঠাঁই দেওয়াতে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে লোকসানের অনুরণন দেশ এখনো টেনে চলেছে। তাতে অনেক জনক্ষয় হয়েছিল, পারস্পরিক বিভেদ বেড়েছিল। অনেক পত্রিকা সে-সবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। অনেকে মনে করে পত্রিকা মানেই কোনো না কোনো ‘বাদ’-এর পাইরবি করা। আপাতত এসব বিদেশী ‘বাদ’-এর ভূত পত্রিকার পাতা থেকে দূর হয়েছে ভাবলেও দেশীয় অনেক পুরোধার মাথা থেকে এখনো তা দূর হয়নি। তবে সময় পরিক্রমায় দেশ একটা ‘বাদ’মুক্ত স্থিতিশীলতায় এসেছে বলা যায়। অর্থনৈতিক

উন্নতিতেও দেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে। এ দেশের মানুষ আর এইসব 'বাদের' মধ্যে যেতে চায় না। চায় দলমত-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-অহিংস একটা সমাজ। চায় মানসিকতার উন্নয়ন। তবে এদেশের গতরখাটা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানসম্মত শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির (জীবনমান) জন্য জাতীয়-আয়ের সুসম বণ্টন বেশি প্রয়োজন। প্রয়োজন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য যথাসম্ভব কমিয়ে নিয়ে আসা। এজন্য কোনো 'বাদের' দরকার নেই। স্বদেশী 'বাদ' দিয়েই যা সম্ভব। দরকার দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টননীতি ও ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেম-লসমুক্ত বণ্টনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, 'চাটামুক্ত' প্রশাসন, নৈতিকতা ও সততার সাথে দেশ পরিচালনা, যা এ দেশের কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব। যুগান্তরের মতো একটি মধ্যপন্থী জাতীয় পত্রিকা এসব দায়িত্বের মুখপত্র হিসেবে ভালোভাবেই অবদান রাখতে পারে। সে স্থিতিশীলতা ও সক্ষমতা দীর্ঘ তেইশ বছরে যুগান্তরের এসেছে। আমরাও যুগান্তরের ওপর আস্থাশীল।

বিশ্বে এমন কোনো দেশ আছে বলে আমার জানা নেই, যেখানে একাধিক ধর্মের লোক বাস করে না। এক ধর্মাবলম্বীদের এক দেশ– এমনটি আশা করা বাতুলতা। এ দেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ। কোনো ধর্মীয় উন্মাদনা, ধর্ম-উচ্ছেদের মানসিকতা মনে পোষণ করে কেউ যত লম্ফঝম্প করুক না কেন, পরিণামে সবাইকেই শান্তির সাথে এ দেশে বাস করতে হবে। বুঝতে হবে, মানুষের ধর্ম না থাকলে অধর্ম সেখানে এসে বাসা বাঁধে। শান্তির সাথে বসবাস করতে হলে যার যে ধর্ম সে সেই ধর্ম শান্তির সাথে সম্প্রদায়-অহিংসভাবে পালন করুক– এমন মন-মানসিকতা আমাদের হওয়া উচিত। এ বিষয়টা যুগান্তরের মাথায় আছে জানি। ভবিষ্যতেও থাকতে হবে।

আমি শিক্ষক। শিক্ষার কথা আমার বলা উচিত। যুগান্তর চাইলে এ দেশে গুণগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, মানবসেবার মনোভাব সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে। এ কাজে যারা জড়িত তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। এতে দেশের উন্নতি ও উৎকর্ষ বাড়ে। যুগান্তরেরও সামাজিক দায়িত্ব পালিত হয়।

'যুগান্তর' চলুক যুগযুগান্তর। এক অন্তর থেকে অন্য-জনান্তর। যুগান্তরকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

(প্রকাশ: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর; দৈনিক যুগান্তরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ— পরিচিতি

ড. হাসনান আহমেদের জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। তিনি একজন সুপরিচিত অ্যাকাডেমিশিয়ান। তাঁর অ্যাকাউন্টিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে বৈচিত্র্যময় অবদান ও ভূমিকা দেশ-বিদেশের অ্যাকাডেমিশিয়ানস ও পেশাজীবী সমাজে স্বীকৃত। তিনি দেশ-বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ, চার দশকের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাবিদ্যা এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি স্ট্যাটিজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

তিনি একজন প্রাবন্ধিক, লেখক ও গল্পকার। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত স্কুল থেকে। তিনি সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ সমাজব্যবস্থা ও বেপথুমান জীবনাচারের নিখুঁত ছবি অঙ্কনের একজন বলিষ্ঠ ভাষাশিল্পী। তাঁর লেখনীতে বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা, জনসমাজের দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, শিক্ষামানের অবনতি প্রভৃতির বাস্তব ও মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এছাড়া তিনি তাঁর লেখনীতে মানবসম্পদ উন্নয়নের বাস্তব প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনার ছবি একজন উদারচেতা শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে এঁকেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও নিখাদ উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের বইয়ে। তাঁর লেখনী সমকালীন সমাজ-সংগঠনের গতিপ্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনবৈচিত্র্য, পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার এক ধরনের ইমপ্রেশনিস্টিক বা আত্মমগ্ন উপাখ্যান।

ড. আহমেদ তেতাল্লিশ বছর ধরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রকল্পে গবেষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু এবং আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে অসংখ্য গবেষণায় এখনোও জড়িত। তিনি আইসিএমএবি-র শিক্ষা ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি এএসিএসবি স্বীকৃত মালয়েশিয়ার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি উতারা মালয়েশিয়া'র ভিজিটিং স্কলার হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর হিসেবে

দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এছাড়া স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক্স-এর ডিন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও সমাজসেবার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস-এর ট্রাস্টি-বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আইসিএমএবি-এর অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজরি কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

তিনি কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা-সেবা কার্যক্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। এতে তিনি অনন্য এক ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের প্রয়োগ করেন। সমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুস্থ মানসিক বিকাশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন; দুঃস্থদের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি এদেশের সমাজ, দেশ ও শিক্ষার উন্নয়নে নতুন মডেল প্রতিষ্ঠা করেন, নতুন শিক্ষানীতি ও দেশ পরিচালনার নীতি ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ে শতাধিক প্রবন্ধের রচয়িতা।

আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতির জন্য সামাজিক শিক্ষা ও সামাজিক সেবার মানকেও উন্নত করতে হবে। সুশিক্ষিত পরিবেশ গড়তে গেলে সমাজের অভ্যন্তর থেকে সুস্থ-চিন্তাশীল, কর্মোদ্যোগী লোককে একত্র করে কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। এ লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদদের সাথে নিয়ে ড. আহমেদ 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' গঠন করেন। এ পরিষদ এলাকাভিত্তিক 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' তৈরি করবে। এক্ষেত্রে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' ও 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে। এ প্ল্যাটফর্ম সরকারের শিক্ষা ও সমাজসেবা নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে। জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবসম্পদরূপে গড়ে তুলতে গেলে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা প্রয়োজন। এই ত্রিমাত্রিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োগ করবে। এছাড়া সমাজের

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ, সফ্‌টস্কিলস ট্রেইনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও আর্থিক সহায়তা করবে। বণ্টনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করতে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' এবং 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে ড. আহমেদ 'শিক্ষা-সেবা (আর্থ-সামাজিক) উন্নয়ন মডেল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

বিভিন্নমুখী শিক্ষার সন্নিবেশ ও অভিজ্ঞতা ড. আহমেদকে অনন্য করেছে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস '৮৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেন।

ড. আহমেদ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– 'জীবনক্ষুধা', 'প্রতিদান চাইনি', 'কিছু কথা কিছু গান', 'অপেক্ষা', 'শেষবিকেলের পথরেখা', 'সত্যের গল্প গল্পের সত্য', 'সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম', 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা', 'এইসব দিনকাল', 'এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' অলখ মহাশক্তির খেলাঘর প্রভৃতি। তার শতাধিক প্রবন্ধ দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসরে গেছেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সমাজে কাজ করে যাচ্ছেন; অভিজ্ঞতাসিঞ্চিত উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়ে বইপুস্তক ও নিউজপেপার-কলাম লিখে চলেছেন।

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ